শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াততাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থাবলি

- ইসলাহী খুতুবাত [১-৪]
- আধুনিক যুগে ইসলাম
- সাম্রাজ্যবাদীর আগ্রাসন : প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম
- হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- মওদুদী সাহেব ও ইসলাম
- প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- স্বপ্নের তারকা [সিরিজ ১, ২, ৩]
- আর্তনাদ [সিরিজ ১, ২]
- সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- অনন্য নামের সমাহার [সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ সহস্রাধিক নামের একটি সংকলন]

সূচিপত্র

বিনয় : সফলতার সোপান

হিংসা একটি সামাজিক রক্তক্ষরণ

স্বপ্নের তাৎপর্য

অলসতার মোকাবেলায় হিম্মত

চোখের হেফাযত করুন

খাওয়ার আদব

পান করার ইসলামী শিষ্টাচার

দাওয়াতের আদব

পোশাক : ইসলাম কী বলে

বিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়শূন্যতা মানুষকে ফেরাউন ও নমরূদের স্তরে নিয়ে যায়। অন্তর বিনয়ী না হলে অহংকারী হবে। সেই অন্তর অপরকে তুচ্ছ ভাববে, বড়াই করবে। আর অহংকার ও বড়াই হলো সকল আত্মিক ব্যাধির মূল।

বিনয় : সফলতার সোপান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ" (ترمذى، كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى التواضع

হাম্‌দ ও সালাতের পর

রাসূল (সা.) বলেছেন–

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ (كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى التواضع)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন।"

উক্ত হাদীসের আলোকে বিনয়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং বিনয় অর্জন করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে সঠিক কথা বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনয়ের গুরুত্ব

বিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়শূন্যতা মানুষকে ফেরাউন ও নমরূদের স্তরে নিয়ে যায়। অন্তর বিনয়ী না হলে অহংকারী হবে। সেই অন্তর অপরকে তুচ্ছ ভাববে, বড়াই করবে। আর অহংকার ও বড়াই হলো সকল আত্মিক ব্যাধির মূল।

অকৃতজ্ঞতার সর্বপ্রথম বুনিয়াদ

এ পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ইবলীস। সে-ই প্রথম বপন করেছে নাফরমানীর বীজ। তার পূর্বে কেউ নাফরমানীর কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ

দিলেন, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করলো। তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য ছিলো–

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (سورة ص ٧٦)

"আমি আদমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু আমি আগুন দ্বারা সৃষ্ট। আর আদম সৃষ্ট মাটি দ্বারা। আগুন মাটির তুলনায় উত্তম। সুতরাং আদম আমার থেকে অধম। উত্তম কেন অধমকে সিজদা করবে? পৃথিবীর বুকে এ ছিলো সর্বপ্রথম কৃতঘ্নতা। এর মূলে ছিলো অহংকার। এ অহংকার ইবলিসকে করে দিলো একেবারে ছারখার। বোঝা গেলো, নাফরমানী হয় অহংকারের কারণে। অহংকারী হৃদয়ে যাবতীয় গুনাহ বাসা বাঁধে।

আল্লাহর নির্দেশের সামনে যুক্তি অচল

ইবলিসের অহংকার ছিলো তার বুদ্ধি নিয়ে। সে ভেবেছে, আমার যুক্তি মজবুত। এই মজবুত যুক্তি আমার নিজের। সুতরাং এটা মানতেই হবে। আল্লাহর নির্দেশের সম্মুখে সে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ালো। ফলে সে আল্লাহর দরবার থেকে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। মকবুলপ্রাণ হয়ে গেলো মরদূদ শয়তান। আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত চমৎকারভাবে একথা তুলে ধরলেন এভাবে–

صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے
جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

অনাদির ভোরে উঠে জিবরাঈল আমাকে শুধালো,
যেই দিল আকলের গোলাম, সেই দিল কবুল করো না কভু।

যেহেতু যে বুদ্ধির গোলাম হলো, সে-ই আল্লাহর উপাসনাকে অস্বীকার করলো। শয়তান এ বিষয়টি ভাবলো না, যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ আদমকেও সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টাও তিনিই। আদমকে সিজদা করার নির্দেশও তারই। সুতরাং আমার কাজ তো কেবল তার নির্দেশ মেনে নেয়া, তার নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেয়া। শয়তান তা করলো না, তাই আল্লাহর দরবারেও থাকতে পারলো না।

অহংকার সকল গুনাহের মূল

অহংকার সকল গুনাহের মূল। অহংকার হাজার গুনাহকে টেনে আনে। অন্তরে হিংসা সৃষ্টি করে। অপরকে কষ্ট দেয়া, অপরের গীবত করাসহ নানা রকম

গুনাহর উৎস এই অহংকার। অন্তরে বিনয় না থাকলে এসব পাপকাজ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। তাই একজন মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করা।

বিনয়ের তাৎপর্য

تَوَاضُعٌ শব্দটি আরবী। অর্থ নিজেকে ছোট মনে করা। এক হলো, নিজেকে ছোট মনে করা। অপরটি হলো, নিজেকে ছোট দাবি করা। নিজেকে ছোট দাবি করার নাম تَوَاضُعٌ বা বিনয় নয়। যেমন কেউ নিজের নামের সঙ্গে আহ্কার, নাচিজ, গুনাহগার প্রভৃতি শব্দ জুড়ে দিলো। আর মনে করলো, আমার বিনয় প্রকাশ হয়ে গেলো, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটাও অহংকার। বিনয় হবে তখন, যখন অন্তর থেকে নিজেকে ছোট মনে করবে। হৃদয়ের ভাষায় বলবে যে, আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, অতএব কর্তৃত্বও নেই। টুকটাক নেককাজ যে করছি, তা আল্লাহর তাওফীকের বদৌলতেই করছি। এটা আমার জন্য মেহেরবান আল্লাহর একান্ত দান। আন্তরিকতার সাথে নিজেকে এভাবে ভাবতে পারলে, তখনই অর্জন করতে পারবে বিনয়ের হাকীকত। বিনয়ের হাকীকত এক মহান দৌলত। এ দৌলত লাভ করতে পারলে তখন মুখে তোমাকে বলতে হবে না যে, তুমি নাচিজ। বিনয়ের এই দৌলত যার ভাগ্যে জোটে, সেই পায় আল্লাহপ্রদত্ত সুউচ্চ মাকাম।

বুযুর্গানে দ্বীনের বিনয়

যে সকল মহান বুযুর্গদের কথা আমরা শুনি, যে মহামনীষীদের থেকে আমরা দ্বীন শিখি, তাঁদের জীবনী পড়ে দেখুন। বুঝতে পারবেন, তাঁরা কতটা বিনয়ী ছিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর একটি বাণী আমি বহুবার আমাদের বুযুর্গদের মুখে শুনেছি। তিনি বলতেন :

'আমার অবস্থা হলো, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল আমার চেয়ে ভালো জানি, আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতকাল হিসাবে উত্তম জানি। মুসলমান সে তো মুসলমান, তার হৃদয়ে আছে ঈমান, তাই সে আমার চেয়ে উত্তম। কাফের হতে পারে সে ভবিষ্যতের ঈমানদার, আল্লাহর তাওফীক সাথী হলে ঈমান তার নসীব হবে, তাই সে সম্ভাবনার উপর ভর করে বলতে পারি, সে আমার চেয়ে উত্তম, আমি তার চেয়ে অধম।'

হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব (রহ.) একবার বলেন : আমি যখন থানভী (রহ.)-এর মজলিসে বসি, মনে হয়– মজলিসের সকল লোক আমার চেয়ে ভালো। আর আমি সকলের চেয়ে ছোট।

মুফতী হাসান (রহ.) একথা শুনে বললেন : আমার অবস্থাও তো একই। চলো, উভয়ে আমরা থানভী (রহ.)-এর দরবারে যাই। আমাদের এ অবস্থা! জানা নেই, বুযুর্গদের দরবারে এর কি ব্যবস্থা......! কাজেই হযরত থানভী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন। উভয়ে হযরত থানভী (রহ.)-এর দরবারে গেলেন এবং বললেন : হযরত আমরা যখন আপনার দরবারে বসি, তখন আমাদের দিলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। হযরত থানভী (রহ.) উত্তর দিলেন : পেরেশান হয়ো না, এটা তেমন কিছু না। তোমাদের অবস্থা তো তোমরা বলেছো, এবার আমার অবস্থাটাও শোনো, সত্য কথা হলো– আমারও একই অবস্থা। আমার কাছে মনে হয়, উপস্থিত মজলিসে আমিই সবচে' নগণ্য। মূলতঃ একেই বলে বিনয়। যার অন্তরে এ বিনয়ের বীজ সৃষ্টি হয়, সে নিজেকে ছোট মনে করে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে পশুর চেয়েও ছোট ভাবে।

নবীজী (সা.)-এর বিনয়

সাহাবী হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। নবীজী (সা.)-এর স্বভাব ছিলো, যখন তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করা হতো, তিনি নিজ থেকে হাত পৃথক করতেন না। মুসাফাহাকারীর হাত পৃথক হলে তাঁর হাত পৃথক হতো। এর আগে তিনি স্বেচ্ছায় হাত সরাতেন না। অনুরূপভাবে সাক্ষাতকারী সাক্ষাত করলে তিনি মুখ ফিরাতেন না। সাক্ষাতকারীর মুখ ফিরলে, তারপর তাঁর মুখ ফিরতো। যখন তিনি মজলিসে বসতেন, পা বাড়িয়ে বসতেন না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আর দশজনের মতই তিনি বসতেন। (তিরমিযী, কিতাবুল কিয়ামাহ অধ্যায় ৪৬)

কতক বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রথম প্রথম নবীজী (সা.) মজলিসে এমনভাবে বসতেন, যেভাবে সাধারণ লোকেরা বসে। তাঁর বসার জন্য আলাদা কোনো আসন ছিলো না, চলাফেরাও স্বতন্ত্রভাব ছিলো না। তবে পরবর্তী সময়ে যখন অপরিচিত লোকজনও আসা শুরু করলো, তখন আগন্তুকের জন্য নবীজী (সা.)কে চেনা কঠিন হয়ে যেতো, তাদের চিনতে কষ্ট হতো যে, কে আল্লাহর রাসূল (সা.)। অনেক মজলিসে লোকজন অনেক হতো, তখন যারা পেছনে বসতো, তাদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দুষ্কর হয়ে পড়তো। অথচ নবীজীকে দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ প্রতিটি আগন্তুকের অন্তরে থাকতো। তাই সাহাবায়ে কেরাম আবেদন জানালেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে দেখার বাসনা সবারই হৃদয়ে থাকে। সকলেই আপনাকে দেখতে চায়। সকলেই আপনাকে পেতে চায়। আপনি যদি একটু উঁচু আসনে বসেন, তাহলে সবাই আপনাকে দেখতে পাবে, সকলেই আপনার কথা শুনতে পাবে। এতে আপনার

কথা শোনা এবং বোঝা সহজ হবে। তখন নবীজী (সা.) অনুমতি দিলে সাহাবায়ে কেরাম চৌকির মতো বিশেষ একটি আসন বানিয়ে দিলেন। তার উপর বসে তিনি দ্বীনের আলোচনা করতেন।

নবীজী (সা.)-এর চলাফেরা

প্রতীয়মান হলো, আলাদা শান কিংবা বিশেষ আসন মানুষের জন্য বেমানান। সাধারণ মানুষ যেভাবে চলে এবং যেভাবে বসে সেভাবেই উঠাবসা করা মানুষের স্বাভাবিক রীতি হওয়া উচিত। অবশ্য প্রয়োজন সৃষ্টি হলে আলাদা কিছু করার বিধিও শরীয়তে রয়েছে। যেমন এক হাদীসে নবীজী (সা.)-এর চলন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে যে–

مَا رُؤِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقَبَهُ رَجُلَانِ (ابو داود، كتاب الاطعمة)

অর্থাৎ 'হেলান দিয়ে খেয়েছেন কিংবা দু' একজন লোক পেছনে নিয়ে চলেছেন, নবীজীর জীবনে কখনও এমনটি দেখা যায়নি।' সুতরাং আপনি আগে আগে চলবেন, আপনার ভক্ত-অনুরক্তরা পেছনে পেছনে চলবে– এটা শিষ্টাচার নয়। এতে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার পথ পায়, নফস অহংকার করার সুযোগ পায়। শয়তান আর নফস আপনাকে বুঝাবে যে, দেখো তুমি জ্ঞানী, তুমি গুণী। এত মানুষ তোমার পেছনে চলে, তুমি তো তাদের নেতা বনে গেছো। ইবলিস আর নফস তোমার সঙ্গে তখন ইতিউতি করবে। তাই তোমাকে তাদের এ ধোঁকাবাজি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রয়োজনে একা হাঁটবে। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের মতই জামাতের ভেতর থাকবে। আলাদা শান প্রদর্শনের জন্য ভক্তের দলকে পেছনে নিয়ে চলা-ফেরা করা থেকে বেঁচে থাকবে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘোষণা

হযরত থানভী (রহ.)-এর সাধারণ একটি ঘোষণা তাঁর মামুলাতে পাওয়া যায়। তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন যে, আমার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটবে না। কোথাও আমি একা যেতে চাইলে একাই যেতে দিবে। তিনি বলতেন : নেতাদের স্বভাব হলো, দু' চারজন ডানে-বামে নিয়ে চলা। এটা আমি মোটেও পছন্দ করি না। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে চলে সেভাবেই চলা উচিত। আরেকবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, চলার সময় আমার হাতে যদি কোনো জিনিসপত্র থাকে, তখন আমার হাত থেকে সেটা নেয়ার ইচ্ছা করবে না। আমি যেভাবে চলতে চাই, সেভাবেই চলতে দিবে। এমনভাবে চলতে দিবে, যেন

আমার বিশেষ কোনো অবস্থান না থাকে। একজন সাধারণ মানুষের মতই আমাকে থাকতে দিবে।

নিজেকে ছোট মনে কর, নিজেকে মিটিয়ে দাও

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : বন্দেগী, গোলামী আর নিজেকে খাকছার মনে করার যিন্দেগী– এটাই তো কাম্য। সুতরাং নিজেকে যত বেশি মেটাতে পারবে এবং বন্দেগী যত বেশি পেশ করবে, আল্লাহর দরবারে ইনশাআল্লাহ তত বেশি মকবুল হবে। কথাটি বলার পর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করতেন–

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ – جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

অর্থাৎ– আল্লাহকে পাওয়ার পথ এটা নয় যে, নিজেকে বুদ্ধিমান এবং চালাক মনে করবে। আল্লাহর দয়া-মায়া তো তারা পাবে, যারা চালাকি নয়– গোলাম করবে এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবে।

কিসের এত আমিত্ব, কিসের এত বড়ত্ব? সুখের সন্ধান কিংবা বড়ত্বের ফরমান নিজের নসীবে তো তখন জুটবে, রূহ বের হওয়ার সময় যখন আল্লাহ বলবেন–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

'হে প্রশান্ত মন! সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও। তারপর আমার গোলামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' (সূরা ফাজর : ২৭–২৯)

প্রমাণিত হলো, মানুষের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা আল্লাহর গোলাম হওয়া।

যেমন ছিলো নবীজী (সা.)-এর বিনয়

ইবাদত-বন্দেগী, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার যিন্দেগী এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশের পথ ও পন্থা নবীজীর প্রতিটি কাজে ফুটে উঠতো। যথা নবীজী (সা.)কে যখন অধিকার দেয়া হলো, আপনি চাইলে উহুদ পাহাড় সোনার পাহাড় হবে। আপনার জীবিকার কষ্ট দূর হবে। আপনি চাইলে তা আপনাকে দেয়া হবে। নবীজী (সা.) উত্তর দিলেন : না, এটা আমার চাওয়া-পাওয়া নয়। আমি চাই–

أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا

'একদিন ক্ষুধার্ত থাকবো, একদিন খাবার খাবো।'

যেদিন খেতে পারবো, সেদিন আপনার শুকরিয়া আদায় করবো। আর যেদিন ক্ষুধায় ভুগবো, সেদিন সবর করবো আর আপনার নিকট ফরিয়াদ করবো, তারপর পেলে খাবো। অপর হাদীসে এসেছে–

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا (صحيح البخاري، كتاب الادب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا)

'দু'টি পথ, যখন নবীজী (সা.)কে ইখতিয়ার দেয়া হতো, তন্মধ্য থেকে একটি গ্রহণ করার, তিনি সহজ পথ যেটি সেটি গ্রহণ করতেন।' কঠিন পথ থেকে সরে দাঁড়াতেন। কারণ কঠিন পথ গ্রহণ করা মানে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করা। অর্থাৎ আমি বীর, আমি উন্নত শির, সব দুর্গম আমার জন্য সুগম– এরূপ মনোভাব প্রকাশ করা। বস্তুত এপথ কখনো আলোকিত হয় না। পক্ষান্তরে সহজ পথ হলো আলোকিত পথ। এতে নিজের অক্ষমতা, আল্লাহর সক্ষমতা এবং নিজের দুর্বলতা, আল্লাহর সবলতা প্রকাশ পায়। এপথে 'আল্লাহকে' পাওয়া যায়। এ নশ্বর পৃথিবীতে যে ক'জন মানুষ আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন, তারা যা সহজ তা অবলম্বন করার উসিলাতেই পেরেছেন। নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর মর্জির মোকাবেলায় নিজের কামনাকে কুরবান করা। এরূপ করতে পারলে সফলতা পাবে। দেখবে, বিনয় মানে শান্তি, বিনয় মানে প্রাপ্তি। শান্তির আনন্দ, প্রাপ্তির স্বাচ্ছন্দ বিনয়ের মাঝেই নিহিত।

চাল এখনও কাঁচা

আমাদের ডা. আবদুল হাই চমৎকার মারেফাতি কথা শোনাতেন। একদিন তিনি বললেন : যখন পোলাও রান্না হয়, প্রথমে চালে জোশ উঠে, ভেতরে থেকে আওয়াজ বের হতে থাকে। চালের এ জোশ মারা, ভেতর থেকে এ আওয়াজ আসা, সবকিছু এ কথারই প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, চাল এখনও কাঁচা। রান্না শেষ হয়নি, খাবারের উপযোগী হয়নি। পোলাওর স্বাদ ও সুগন্ধি এখনও পরিপূর্ণভাবে আসেনি। কিন্তু চাল যখন সিদ্ধ হয়, তখন প্রচুর ধোঁয়া বের হয়। সে সময় চাল আওয়াজ করে না; বরং নীরব থাকে এবং নিথর হয়ে যায়। তখনই শুরু হয় সুগন্ধির আমেজ। চালে তখন পোলাওর স্বাদ আসে। এবার তাকে খাওয়া যাবে।

صبا جو ملنا تو کہنا میرے یوسف سے
پھوٹ نکلی تیرے پیراہن سے بو تیری

'হে ভোরের বাতাস! তুমি যখন ইউসুফের সাথে মিলিত হবে, তখন বলবে, তোমার জামা থেকে তোমার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে।'

মানুষ যখন দাবি করতে থাকবে যে, আমি এমন, আমি তেমন, আমি মুত্তাকী, আমি নামাযী, আমি আল্লামা– এ দাবি মুখেরও হতে পারে কিংবা হৃদয়েও থাকতে পারে– ততক্ষণ মানুষ এক বিস্বাদ প্রাণী। সুগন্ধি ছড়াতে, ফুল ফোটাতে সে অক্ষম হবে। কাঁচা চালের মত সেও কাঁচা থেকে যাবে। আর যেদিন সে এই আমিত্ব ছাড়বে, আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করবে, সেদিন সজীব হবে। আমার যোগ্যতা নেই, আমার মধ্যে কিছু নেই, আমি নগণ্য, সকলেই আমার চেয়ে গণ্যমান্য– এ জাতীয় মনোভাব মানুষকে সতেজ করে তোলে। ফুলের সৌরভের মত তখন নিজের গৌরবও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। আল্লাহ তাআলা তাকে তখন বড় করবেন। তার ফয়েজ ও বরকত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। এই জন্যই ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন–

میں عارفیؔ آوارہ صحراء فناہوں
ایک عالم بےنام نشاں میرے لئے ہے

অর্থাৎ– 'আমি আরেফীকে নিজেকে মিটানোর ময়দানে ব্যাকুল হওয়ার, নাম-গন্ধহীন জগতে পথ মাড়ানোর তাওফীক আল্লাহ আমাকে দান করুন।' তাঁর মত আমাদেরকেও আল্লাহ এ তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর বিনয়-প্রতিভা

হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.), যাঁর ইলম, কামালিয়াত ও বুযুর্গীর ছিলো সুনাম-সুখ্যাতি। সকলের অন্তরে তাঁর প্রতি একটা ভক্তি ছিলো। অসংখ্য মানুষ তাঁর ভাবশিষ্য ছিলো। তিনি আত্মকাহিনী শোনাচ্ছেন যে, 'সীরাতুন্নবী' কিতাবটির ছয় খণ্ড যখন লিখে শেষ করেছি, তখন ভেবেছি, যাঁর পবিত্র জীবনী লিখলাম, তাঁর আলোকিত জীবনের আলো আমি কতটুকু পেলাম? তাঁর আলো কি আমার মাঝে আছে? যদি না থাকে, তাহলে কিভাবে আহরণ করা যাবে এর জন্য তো প্রয়োজন কোনো বুযুর্গের নিকট আত্মসমর্পণ। অনেক আগ থেকেঃ শুনে আসছি, হযরত থানভী (রহ.) থানাভবনের খানকায় অবস্থান করছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়েজ ছড়াচ্ছেন। তাই স্থির করলাম, একবার থানাভবনে যাবো। থানভী (রহ.)-এর হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দিবো। অবশেষে একদিন থানাভবনে গিয়ে উঠলাম, থানভী (রহ.)-এর হাতে হাত রাখলাম। বেশ কয়েক দিন সেখানে কাটালাম। বিদায় বেলা হযরতের নিকট দরখাস্ত পেশ করলাম,

হযরত একটু নসীহত করুন! অন্যত্র হযরত থানভী (রহ.) এ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : আমার তখন মনে হলো, এত বড় আল্লামাকে আমি কি নসীহত করবো? ইলম ও জ্ঞান-গরিমায় সারা বিশ্বে যিনি প্রসিদ্ধ, তাকে আমি কি উপদেশ দেবো? তাই আমি মনে মনে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এমন কিছু কথা ঢেলে দিন, যা তাঁর উপকার হয় এবং আমারও উপকার হয়। যাক, হযরত থানভী (রহ.) অতঃপর হযরত সুলাইমান নদভী (রহ.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'ভাই! শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে মিটিয়ে দেয়া, আমাদের তরীকা তো এই একটাই।'

হযরত সুলাইমান নদভী (রহ.) বলেন : হযরত থানভী (রহ.) এ শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় নিজের হাত আমার বুকের দিকে নিয়ে নিচের দিকে এমনভাবে একটি টান দিলেন, মনে হলো– আমার হৃদয়ে একটা ধাক্কা লেগেছে।

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : এ ঘটনার পর হযরত সুলাইমান নদভী নিজেকে নজীরবিহীনভাবে মিটিয়ে দিলেন। একদিন দেখা গেলো, হযরত নদভী (রহ.) খানকার বাইরে দাঁড়িয়ে আগন্তুক লোকজনের জুতো সোজা করে দিচ্ছেন। পরিণতিতে তিনি সুবাসিত হলেন, বিশ্বময় সুগন্ধি ছড়ালেন। আল্লাহ তাঁকে উচ্চমর্যাদায় পৌছিয়ে দিলেন।

আমিত্বের মূর্তি থেকে অন্তরকে মুক্তি দাও

সারকথা, যত দিন আমিত্বের মূর্তি হৃদয়ে বাস করবে, ততদিন পর্যন্ত চাল কাঁচা থাকবে। এখন জোশ মারছে, উতালা হচ্ছে, আমিত্বকে যখন বিলীন করবে, তখন সুবাস ছড়াবে। মিটানোর ভেতর রয়েছে গড়ে তোলার রহস্য। এ গুণ প্রতিভাত হলে তুমিও প্রস্ফুটিত হবে। নিজেকে মেটানোর অর্থ হলো, চলনে-বলনে, প্রতিদিনের আচার-আচরণে অহংকারমুক্ত থাকবে এবং বিনয় অবলম্বন করবে। বিনয় ইনশাআল্লাহ আলোকিত পথের সন্ধান দিবে। কারণ, অহংকার সত্যের পথে প্রধান অন্তরায়। অহংকারী নিজেকে হয়ত অনেক কিছু মনে করে, অপরকে অনেক তুচ্ছ মনে করে; কিন্তু বিজয় ও সফলতার পথ সে পায় না। বিজয় এবং সফলতা তো আল্লাহ ওই ব্যক্তির ভাগ্যে রেখেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আল্লাহ বিনয়ীকে সম্মানিত করেন, আর অহংকারীকে অপমানিত করেন। এটাই আল্লাহর রীতি।

অহংকারীর উপমা

অহংকারীর দৃষ্টান্ত হলো, সে যেন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে পাহাড়ের উপর থেকে দেখছে যে, নিচের সব মানুষ ছোট ছোট। যদিও

প্রকৃতপক্ষে তারা ছোট নয়, বড়। যারা নিচ থেকে তার দিকে তাকায়, তারাও তাকে ছোট হিসাবেই দেখে। অনুরূপভাবে মানুষ অহংকারীকে ছোট মনে করে, আর অহংকারী মানুষকে ছোট মনে করে। কিন্তু যারা বিনয়ী, আল্লাহর সামনে যারা নিজেকে নিঃস্ব করেছে, নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে, আল্লাহ তাঁদেরকে মর্যাদাবান করেন। 'আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে বিনয়ের দৌলত দান করুন। আমীন।'

ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর বিনয়

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন : মাঝে মধ্যে বাড়িতে আমি খালি পায়ে চলাফেরা করি। যেহেতু এক বর্ণনায় পড়েছি, নবীজী (সা.) মাঝে-মধ্যে খালিপায়ে হাটতেন। তাই তাঁর সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে আমিও মাঝে-মধ্যে এভাবে হাঁটি। তিনি আরো বলতেন : আমি যখন খালি পায়ে চলি, নিজেকে সম্বোধণ করে বলি, দেখো– এটাই তোমার আসল পরিচয়। পায়ে জুতো নেই, মাথায় টুপি নেই, শরীরে কাপড় নেই, একদিন তুমিও 'নাই' হয়ে যাবে।

মুফতী শফী (রহ.)-এর বিনয়

ঘটনাটি ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেছিলেন যে, একবার আমি রাবসন রোডের চেম্বারে বসা ছিলাম। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন একাকী। হাতে একটি পুটুলি। ডানে-বামে কোনো ভক্ত- অনুরক্ত নেই। ডাক্তার বলেন : আমার আশে-পাশে তখন লোকজন ছিলো। তাদেরকে বললাম : লোকটিকে কি আপনারা চিনেন? তারপর আমি নিজেই উত্তর দিলাম : আপনারা কল্পনা করতে পারবেন কি যে, ইনি গোটা পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম। পাকিস্তানের এই প্রধান মুফতীর হাতে পুটুলি! তার সরলতা, বেশভুষা, চলাফেরা এতই সাধারণ যে, কারো কল্পনায়ও আসবে না, ইনি পাকিস্তানের মুফতীদের প্রধান। এত বড় আলেম; অথচ চাল-চলন কত সাধারণ!

হযরত মুফতী আযীযুর রহমান (রহ.)-এর বিনয়

হযরত মুফতী আযীযুর রহমান (রহ.)। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এরও উস্তাদ ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দ-এর প্রধান মুফতী ছিলেন। তার অনুপম চরিত্র সম্পর্কে একটি ঘটনা আব্বাজানের মুখে শুনেছিলাম যে, তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলো, তিনি যখন দেওবন্দ মাদরাসার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হতেন, প্রথমে বিধবা মহিলাদের বাড়িতে যেতেন, জিজ্ঞেস করতেন : তোমাদের বাজার-সদাই করা লাগবে কি? প্রয়োজন হলে বলো, আমি আসার সময় নিয়ে

আসবো। বিধবারাও তখন তাদের প্রয়োজন তাঁর নিকট বলতো। পেয়াজ, রসুন, ধনিয়া, আলু ইত্যাদির প্রয়োজন তাদের হতো। আর তিনিও এগুলো এনে দিতেন। অনেক সময় এমনও হতো, কেউ হয়ত বলে উঠতো যে, কি মিয়া ভাই! বাজার তো ভুল এনে ফেলেছেন। অমুক জিনিস, এই পরিমাণ আনতে বলেছিলাম আর আপনি কি নিয়ে আসলেন? মুফতী সাহেবও উত্তর দিতেন : সমস্যা নেই, আবার সঠিকটা এনে দিচ্ছি। এভাবে একবারের জায়গায় দু'বারও যেতেন। তারপর মাদরাসার দিকে রওনা হতেন। মাদরাসায় গিয়ে ফতওয়ার কাজে বসে যেতেন। আমার আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন : এই যে যিনি বিধবাদের সদাই নিয়ে বাজারে ঘুরতেন, তিনিই তো ভারতবর্ষের প্রধান মুফতী। অথচ হঠাৎ কেউ দেখে বলতে পারবে না, তিনি যে একজন ইলমের পাহাড়। এ ছিলো তাঁর বিনয়। এ বিনয়ের ফলে তার ফতওয়া বার খণ্ডে ছাপানো হয়েছে। ছাপার কাজ আরো চলছে। সারা বিশ্ব তাঁর ফতওয়া থেকে উপকৃত হচ্ছে। একেই বলে–

چھوٹ نکلی تیرے پیراہن سے بو تیری

'তোমার জামা থেকে সুগন্ধি উতলে উঠছে।' এমন সৌরভ আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের ঘটনাও কত সৌভাগ্যময়। ওই সময় তাঁর হাতে একটি ফতওয়া ছিলো, ফতওয়া লিখতে লিখতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর বিনয়

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সব সময় সাদামাটা একটি লুঙ্গি পরতেন আর সাধারণ একটি পাঞ্জাবী পরতেন। নতুন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, তিনি এত বড় আল্লামা। যখন বিতর্ক হতো, তখন উপস্থিত আলেমরা থ বনে যেতো। অথচ সরলতা তাঁর এ পর্যায়ের ছিলো যে, তিনি লুঙ্গি পরে মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন।

এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করেছিলো। তাঁর অপরাধ ছিলো, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এক সিপাহী তাঁকে গ্রেফতার করতে এলো। হয়ত কারো ইঙ্গিতে সে সরাসরি 'ছাত্তাহ' মসজিদে এসে উপস্থিত হলো। এসে দেখতে পেলো, লুঙ্গিপরা ফতুয়া গায়ে দেয়া এক ব্যক্তি মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছে। যেহেতু ওয়ারেন্টনামাতে লেখা ছিলো, 'মাওলানা কাসেম নানুতবীকে গ্রেফতার করা হোক।' তাই হয়ত তার ধারণা ছিলো, এত বড় আন্দোলনের নেতৃত্ব যিনি দিয়েছেন, না জানি তিনি কত বড় আলেম হবেন। সে ভেবেছিলো, পরনে জুব্বা, মাথায় বিশাল পাগড়ী আরো

কত কী থাকবে। সে কল্পনাও করেনি, যিনি মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন, তিনিই হযরত নানুতবী। তাই সে হযরতকে জিজ্ঞেস করলো : মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী কোথায়? হযরতের জানা ছিলো, তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। তাই তিনি বুদ্ধি করলেন, নিজেকে প্রকাশ করা যাবে না এবং মিথ্যাও বলা যাবে না। এজন্য তিনি যেখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে এক কদম পেছনে সরে গেলেন। তারপর উত্তর দিলেন : একটু পূর্বে তো মাওলানা কাসেম এখানে ছিলেন। উত্তর শুনে সে ভেবেছে, একটু পূর্বে হয়ত মসজিদেই ছিলো, এখন মসজিদে নেই। তাই সে খুঁজতে খুঁজতে ফিরে চলে গেলো।

দু' অক্ষর ইলম

মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) বলতেন : যদি দু' কলম ইলমের 'অপবাদ' মুহাম্মদ কাসেমের উপর না থাকতো, তাহলে দুনিয়া এ কথার পাত্তাই পেতো না যে, মুহাম্মদ কাসেমের জন্ম কোথায় এবং মারা গেছে কোথায়? এমনই বিনয়ী ছিলেন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর বিনয়

ঘটনাটি আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) শুনেছিলেন মাওলানা মুগীছ (রহ.) থেকে। শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)। ইংরেজদের যমদূত, ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। যে আন্দোলন হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তানকে কাঁপিয়ে তুলেছিলো। গোটা ভারতবর্ষে তাঁর সুখ্যাতি ছিলো। আজমীরে মুঈনুদ্দীন আজমিরী নামক একজন আলেম থাকতেন। ভাবলেন, দেওবন্দ যাওয়া দরকার, শায়খুল হিন্দের সঙ্গে সাক্ষাত না করলেই নয়। সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি রেলপথে দেওবন্দ আসলেন। এক টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন : আমাকে শায়খুল হিন্দের বাড়িতে নিয়ে চল। বিশ্বময় 'শায়খুল হিন্দ' নামে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিলো কিন্তু দেওবন্দে 'বড় মৌলভী সাহেব' নামে তাঁর পরিচয় ছিলো। তাই টাঙ্গাওয়ালা বললো : আপনি মনে হয়, বড় মৌলভী সাহেবের নিকট যেতে চান। তিনি বললেন : হ্যাঁ, বড় মৌলভী সাহেবের কাছেই যেতে চাই। টাঙ্গাওয়ালা মাওলানা আজমিরীকে শায়খুল হিন্দের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলো। তখন গরমের মৌসুম ছিলো। মাওলানা আজমিরী দরজায় আওয়াজ দিলেন, তখন শায়খুল হিন্দ বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আজমিরী শায়খুল হিন্দকে চিনেননি। তাঁর গায়ে ছিলো একটি গেঞ্জি আর পরনে ছিলো একটি সাধারণ লুঙ্গি। তাই মাওলানা আজমিরী বললেন : আমি আজমীর থেকে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এসেছি। আমার

নাম মুঈনুদ্দীন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন : তাশরীফ রাখুন। ভেতরে এসে বসুন। মাওলানা আজমিরী ভেতরে এসে বসলেন, পুনরায় তাগিদ দিলেন, আপনি হযরতকে জানিয়ে দেন যে, মুঈনুদ্দীন আজমিরী এসেছেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) উত্তর দিলেন : আপনি খুব গরম সহ্য করে এসেছেন। বসুন, বিশ্রাম নিন। এ বলে তিনি মেহমানকে বাতাস করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা আজমিরী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন : আমি তোমাকে বললাম কী, আর তুমি কর কী। হযরতকে গিয়ে বল, আজমীর থেকে এক লোক আপনার সাক্ষাতে এসেছে। 'আচ্ছা, এখনই যাচ্ছি' বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন এবং খাবার নিয়ে এলেন। মাওলানা বললেন : ভাই! আমি তো খাবার খেতে আসিনি। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি। আমাকে তার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দাও। তিনি বললেন : হযরত! খাবার খান। এক্ষুণি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। খাবার খেলেন। পানি পান করলেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) মাওলানাকে মেহমানদারী করে খাওয়ালেন। এবার মাওলানা অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে বললেন : আমি বারবার তোমাকে একটি কথা বলছি অথচ তুমি তার মূল্য দিচ্ছো না।

এবার হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন এভাবে যে, ভাই! এখানে শায়খুল হিন্দ বলে কেউ নেই। তবে 'মাহমুদ' আমি অধমের নাম। এতক্ষণে মাওলানা আজমিরীর খবর হলো যে, আমি যার সঙ্গে এ ব্যবহার করেছি, ইনিই হলো পৃথিবীখ্যাত সেই শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী। এই ছিলো আমাদের বুযুর্গদের আচরণ। সাদাসিধা ও সহজ-সরল জীবন তাঁরা অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের গুণের কিছুটা ঝলক আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

মাওলানা মুজাফফর (রহ.)-এর বিনয়

একবারের ঘটনা। মাওলানা মুজাফফর (রহ.) কান্দালা আসছিলেন। রেলপথে কান্দালা স্টেশনে পৌঁছলেন। দেখলেন, এক বৃদ্ধ লোক মাথায় বিশাল বোঝা নিয়ে চলছেন। বোঝার ভারে বৃদ্ধ একেবারে আরো নুয়ে পড়েছেন। মাওলানা ভাবলেন, এত বড় বোঝা নিয়ে বৃদ্ধের চলতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। তাই তিনি বৃদ্ধের নিকট এসে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন : আপনি যদি বলেন, তাহলে আপনার বোঝা বহন করে সহযোগিতা করতে পারি। বৃদ্ধ উত্তর দিলেন : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা হলে তো ভালোই হয়। মাওলানা বৃদ্ধের বোঝা মাথায় তুলে নিলেন। শহরের পথ ধরে এগিয়ে চললেন। এরই ফাঁকে দু'জনে আলাপ জুড়ে দিলেন। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় যাচ্ছেন? বৃদ্ধ উত্তর দিলো : কান্দালা যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করলেন : কেন যাচ্ছেন?

উত্তর দিলো : শুনেছি সেখানে বড় একজন মাওলানা থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মাওলানা বললেন : বড় ওই মাওলানা সাহেবের নাম কি? বৃদ্ধ বললো : মাওলানা মুজাফফর হোসাইন সাহেব কান্দলবী। শুনেছি তিনি অনেক বড় আলেম। বড় মাওলানা। মাওলানা বললেন : তিনি আরবী পড়তে পারেন। এভাবে আলাপচারিতা চলতে চলতে উভয়ে কান্দালার কাছাকাছি চলে আসলেন। কান্দালার সকলেই মাওলানা মুজাফফর সাহেবকে চিনেন। তারা যখন দেখলো, মাওলানা মুজাফফর বোঝা মাথায় করে পথ চলেছেন, তখন অনেকেই বোঝা নেয়ার জন্য দৌড়ে আসলো। সকলেই মাওলানা সমীহ প্রদর্শন করতে লাগলো। এঁ দৃশ্য দেখে বেচারা বৃদ্ধের তো অবস্থা ভীষণ শোচনীয় এত বড় বোঝা এত বড় মাওলানার মাথায় উঠিয়ে দিলাম- এ পেরেশানীতে তটস্থ। মাওলানা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন : পেরেশানীর কী আছে? আমি আপনাকে কষ্ট করতে দেখে নিজেই তো বোঝা উঠিয়ে নিয়েছি। আল্লাহর শোকর, আপনি আমাকে এতটুকু খেদমতের তাওফীক দিয়েছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর আরেকটি ঘটনা

হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব (রহ.)। রমযানে তাঁর ওখানে নিয়ম ছিলো, ইশার নামায বাদ তারাবীহ শুরু হতো, ফজরে গিয়ে শেষ হতো। সারারাত তারাবীহ চলতো। প্রতি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে এক খতম দেয়া হতো। তিনি নিজে হাফেজ ছিলেন না। তাই এক হাফেজ সাহেব তারাবীহ পড়াতেন। হযরত পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতেন। তারাবীহ শেষে এখানেই হযরতের কাছে হাফেজ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে যেতেন। হাফেজ সাহেব বলেন : একদিনের ঘটনা। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখ খুলে গেলো। অনুভব করলাম, কে যেন আমার পা টিপছে। ভাবলাম, কোনো শাগরিদ কিংবা তালিবুল ইলম হবে। এ মনে করে আর ভালো করে দেখলাম না যে, কে আমার পা টিপছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললো। আমার পাশ ফেরানোর প্রয়োজন হলো। যেই পাশ ফিরাতে গেলাম, দেখলাম হযরত শায়খুল হিন্দ আমার পা টিপছেন। আমি একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম : হযরত! আপনি এ কী করছেন? হযরত বললেন : এটা কি খুব দৃষ্টিকটু হলো! সারারাত তুমি তারাবীহতে দাঁড়িয়ে থাক। ভাবলাম, টিপলে তোমার পা কিছুটা আরাম পাবে, তাই পা টিপে দিলাম।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের বিনয়

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। খুব বড় মাপের আলেম ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি তাকে

খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। লোকটির বাড়ি বেশ দূরে ছিলো। তার পক্ষ থেকে গাড়ীরও কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। যখন সময় হলো, তিনি পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন। একটুও অস্বস্তিবোধ করেননি যে, লোকটি গাড়ীর ব্যবস্থা কেন করেনি? যাহোক, তিনি তার বাড়িতে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। খাবার খেলেন। আম খেলেন। ফিরে আসার সময়ও গাড়ি ছিলো না। বরং উল্টো লোকটি এক পুটলি আম হযরতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো : হযরত এখানে অল্প কয়েকটি আম আপনার বাড়ির জন্য দিলাম। আল্লাহর বান্দার মাথায় এতটুকু চিন্তা এলো না, এত দূরের পথ, গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়নি, কিভাবে তিনি আমার এ থলে নিয়ে যাবেন? সে থলেটি হযরতের হাতে দিলো, হযরতও তা নিলেন এবং পথ চলা শুরু করলেন। থলেটি বেশ বড় ছিলো। রাজপুত্রের মত তাঁর জীবন ছিলো। সারা জীবনেও তিনি এত বড় বোঝা বহন করেননি। থলেটি একবার ডান হাতে নেন, আবার বাম হাতে নেন। এভাবে দেওবন্দের কাছাকাছি চলে এলেন। ভীষণ কষ্ট হয়েছে, দু'হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। হাত প্রায় অবশ হয়ে গেছে। আর সহ্য করতে পারলেন না, আমের থলে মাথায় উঠিয়ে নিলেন। হাতকে কিছুটা স্বস্তি দিলেন। মাথায় আমের থলে নিয়ে তিনি দেওবন্দ প্রবেশ করলেন। পথে কত লোকের সাথে দেখা হয়েছে। সালাম হয়েছে। মোসাফাহা হয়েছে। এক হাতে নিয়ে তিনি সবই করলেন। একটুও ভাবলেন না, এ কাজ আমার জন্য সাজে না। একেই বলে বিনয়। বিনয়ের আলামত হচ্ছে নিজেকে ছোট মনে করা। নিজের কাজকে মর্যাদাহানীর মনে না করা।

একটি বিরল ঘটনা

হযরত সাইয়েদ আহমদ রেফায়ীর নাম হয়ত আপনারা শুনেছেন। তিনি আল্লাহর এক ওলী ছিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়কর এক ঘটনা তাঁর থেকেও ঘটেছে। তিনি নবীজী (সা.)-এর রওজায় উপস্থিত হওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। অনেক আশা, অনেক ভরসা হজ্জ করার, রওজায় হাজিরা দেয়ার। আল্লাহ তার আশা পূরণ করলেন, হজ্জ সম্পাদন করার তাওফীক দিলেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। হজ্জ শেষে মদীনা শরীফ তাশরীফ নিলেন। যিয়ারতের জন্য নবীজীর রওজায় হাজির হলেন। আবেগমাখা কণ্ঠে হৃদয়ের ভক্তি ঝরালেন, দু'টি আরবী কবিতা আবৃত্তি করলেন-

فِىْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِىْ كُنْتُ اُرْسِلُهَا + تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّىْ وَهِىَ نَائِبَتِىْ

وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ + فَامْدُدْ بِيَمِيْنِكَ كَىْ تَحْظِىْ بِهَا شَفَتِىْ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন দূরে ছিলাম, হৃদয় আমার আপনার রওজায় পাঠিয়ে দিতাম। হৃদয় আসতো, আমার প্রতিনিধি পবিত্র যমীনকে চুমো খেয়ে যেতো। আল্লাহর মেহেরবানী আজ আমি সৌভাগ্যবান, সশরীরে আপনার দরবারে দণ্ডায়মান। দয়া করে আপনার একখানা পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন, যেন আপনার হাতে চুমো খেয়ে আমার দু'ঠোট হতে পারে ভাগ্যবান। আমি ধন্য হবো, যখন আপনার দস্ত মুবারকে চুমো খাবো।

আবেগমাখা কবিতা আবৃত্তি শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে রওজা শরীফ থেকে পবিত্র হাত ঝলক দিয়ে উঠলো। উপস্থিত সব মানুষ নবীজী (সা.)-এর পবিত্র হাত দেখে ধন্য হলো। সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী হাত মুবারকে চুমো খেলেন। তারপর নিজ গন্তব্যে চলে গেলেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন। তবে ইতিহাসে আমরা আরেকটি চিত্র দেখতে পাই। তাহলো–

অহংকারের চিকিৎসা

উক্ত ঘটনা ঘটে গেলো। হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর রেফায়ী'র হৃদয়ও আন্দোলিত হলো। তিনি ভাবলেন, এটা একান্ত আমার সৌভাগ্য, অন্যরা এ থেকে বঞ্চিত। এ সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দান করেছেন, এটা তাঁরই অনুগ্রহ। এর কারণে আমার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই চিন্তা করে তিনি মসজিদে নববীর দরজায় শুয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলকে বললেন : দোহাই লাগে, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, সকলেই আমার শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে বের হবেন। কেননা, অহংকারের পরিণতি বড় নির্মম। আমি সেই অহংকারের আশঙ্কা করছি। এভাবেই তিনি অহংকারের চিকিৎসা করলেন।

সৃষ্টির সেবার এক আলোকিত দৃষ্টান্ত

একবার হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর বাজারে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন, খুজলি-আক্রান্ত একটি কুকুর পথে পড়ে আছে। কুকুরটি হাটতে পারছে না। আল্লাহর নেক বান্দা যাঁরা, তাঁদের হৃদয় হয় আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা। তাই তারা আল্লাহর মাখলুককে ভালোবাসেন, তাদের প্রতি দয়া করেন। এ ভালোবাসা ও দয়া এ কথার নিদর্শন যে, আল্লাহর সাথে তিনি বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। এটাকেই মাওলানা রূমী বলেন–

تسبیح وسجادہ ودلق نیست
طریقت بجز خدمت خلق نیست

'তাসবীহ, জায়নামায আর জুব্বার নাম তরীকত নয়; বরং খেদমতে খালক তথা সৃষ্টির সেবার নাম তরীকত।

ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন : কোনো বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহও তখন তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সৃষ্টির মহব্বত ঢেলে দেন। ফলে মুত্তাকীদের প্রতি, মানবজাতির প্রতি এমনকি জীব-জন্তুর প্রতিও তার অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

যাহোক হযরত সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী যখন কুকুরটির এই দুরাবস্থা দেখলেন, তাঁর অন্তরে মায়া এসে গেলো। কুকুরটিকে তিনি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করালেন। আল্লাহ তাআলা কুকুরটিকে সুস্থ করে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর সাথীকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যদি কেউ কুকুরটির নিত্য খাবারের দায়িত্ব নিতে পার, তাহলে একে নিয়ে যাও। নতুবা আমি নিজেই একে পুষবো, এর খাবার-দাবার দিবো। অবশেষে কুকুরটি তাঁর কাছেই লালিত- পালিত হলো।

এক কুকুরের সাথে কথোপকথন

উক্ত ঘটনার পর সাইয়েদ আহমদ রেফায়ী এক দিন কোথাও যাচ্ছিলেন। বর্ষাকাল ছিলো, তিনি ক্ষেতের আইল দিয়ে চলছেন। দু'দিকই পানি ও কাদায় পূর্ণ ছিলো। কিছু দূর যেতেই একটি কুকুর সামনে পড়লো। আইল খুবই চিকন ছিলো, এক সঙ্গে দু'জন অতিক্রম করা সম্ভব নয়। হয়ত কুকুর নিচে নেমে যাবে আর তিনি উপর দিয়ে যাবেন অথবা তিনি নিচে যাবেন আর কুকুর উপর দিয়ে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন, কে নিচে নেমে যাবে? আমি নিচে নামবো, নাকি কুকুর নিচে নেমে যাবে? তিনি কুকুরকে বললেন : 'তুমি নিচে নেমে যাও, যেন আমি উপর দিয়ে যেতে পারি।' আল্লাহ কুকুরের যবান খুলে দিলেন। কুকুর উত্তর দিলো : আমি কেন নিচে নামবো? তুমি বড় দরবেশ, আল্লাহর ওলী। আল্লাহর ওলীদের স্বভাব হলো, তারা ত্যাগ স্বীকার করেন, অপরের জন্য স্বার্থ বিসর্জন দেন। তুমি কেমন ওলী হলে, আমাকে নিচে নামার আদেশ করছো? তোমার কি হলো, তুমি কেন নিচে নামছো না?

হযরত রেফায়ী উত্তর দিলেন : আসলে তোমার আর আমার মাঝে পার্থক্য আছে। আমি মুকাল্লাফ বিধায় আমার উপর শরীয়তের অনেক হুকুম আছে, আমাকে নামায পড়তে হবে। তোমার উপর শরীয়তের কোনো বিধান নেই, তুমি গায়রে মুকাল্লাফ বিধায় তোমাকে নামায পড়তে হয় না। নিচে নামার কারণে যদি তোমার শরীর অপবিত্র হয়, তাহলে তোমার জন্য কোনো পবিত্রতা নেই,

তোমাকে গোসল করতে হবে না। আমি যদি কাদা-পানিতে নেমে পড়ি, আমার কাপড়-চোপড় যদি নাপাক হয়ে যায়, তাহলে আমার নামায পূর্ণ হবে না। তাই তোমাকে বলছি, তুমি নিচে নেমে যাও।

অন্যথায় অন্তর অপবিত্র হয়ে যাবে

কুকুর উত্তর দিলো : বাহ! আপনি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। কাপড় নাপাক হলে তো তা পাক করা যাবে, ধুয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু আমি নিচে নামলে আপনার অন্তর নাপাক হবে। ভাববেন, আমি মানুষ আর এ কুকুর। আমি উত্তম, এ অধম। এ ধারণার কারণে আপনার অন্তর কলুষিত হবে, যা পাক করার কোনো উপায় নেই। তাই বলছি, অন্তর নাপাক হওয়ার চেয়ে কাপড় নাপাক হওয়া অনেক ভালো। সুতরাং আপনিই নেমে পড়ুন।

কুকুরের এ উত্তর শুনে হযরত রেফায়ী থ হয়ে গেলেন। বললেন : ঠিক-ই তো বলেছো। কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু অন্তর ধোয়া যায় না। এই বলে তিনি কাদায় নেমে গেলেন, কুকুরকে পথ ছেড়ে দিলেন।

উক্ত ঘটনার পর সাইয়েদ আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেলেন যে, হে আহমদ কবীর! আজ আমি তোমাকে ইলমের এক মহান দৌলত দান করেছি, সব ইলম একদিকে আর আজকের ইলম এক দিকে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তোমার সেই আমলের পুরস্কার, যা একটি অসুস্থ কুকুরের সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে করেছিলে। সেই কুকুরটিকে দয়া দেখিয়েছিলে, চিকিৎসা করিয়েছিলে এবং লালন করেছিলে। এ আমলের বদৌলতে আমি তোমাকে একটি কুকুরের মাধ্যমে এক মহান ইলম দান করলাম, যার তুলনায় তোমার অবশিষ্ট ইলম অতি নগণ্য। সেই ইলম হলো, মানুষ নিজেকে কুকুর থেকেও উত্তম মনে করবে না এবং নিজের তুলনায় কুকুরকে অধম মনে করবে না।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী ছিলেন পৃথিবীখ্যাত একজন বুযুর্গ। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছেন : হযরত! আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : আল্লাহ তাআলা আমার সঙ্গে এক বিস্ময়কর ব্যবহার করেছেন। যখন এখানে এলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : কী আমল নিয়ে এলে? আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, কী জবাব দিবো? আমার কোন আমল পেশ করবো? কেননা, উল্লেখযোগ্য কোনো আমল নেই, যা পেশ করা যাবে। তাই উত্তর দিলাম : হে আল্লাহ! কিছুই আনিনি। রিক্তহস্ত আমি। আছে শুধু আপনারই

মেহেরবানী। আল্লাহ আমাকে বললেন : তুমি অনেক আমল করেছো। তবে তোমার একটি আমল আমার নিকট বেশি ভালো লেগেছে। আজ তারই বদৌলতে তোমাকে মাফ করে দিলাম। সেই আমলটি কী জানো? সেই আমলটি হলো, এক রাতে তুমি জাগ্রত হয়ে দেখলে, একটি বিড়াল ছানা শীতে কাঁপছে। তুমি তাকে মায়া করে লেপের নিচে এনে রেখেছিলে, তার শীত দূর করেছিলে। বিড়াল ছানাটি আরামে রাত কাটালো। তোমার আমলটি খুব ইখলাসপূর্ণ ছিলো। একমাত্র আমার সন্তুষ্টিই তোমার কাম্য ছিলো। এই আমলটি আমার নিকট দারুণ ভালো লেগেছে। তাই তোমাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী বলেন : দুনিয়াতে আমি কত বড় বড় ইলম ও মারেফাত অর্জন করেছিলাম, সবগুলো আপন স্থানে রয়ে গেলো। আল্লাহর দরবারে যে আমলটি কবুল হলো, তাহলো তার মাখলুকের সঙ্গে কোমল ব্যবহার।

সারকথা

হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর (রহ.)কে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো, সকল ইলম একদিকে আর নিজেকে কিছু না ভাবার ইলম অপর দিকে। এটা সকল ইলমের মূল। আজ তা তোমাকে দেয়া হলো। এটাই হলো, বিনয়। এভাবে বিখ্যাত সকল ওলী অহংকার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন, এ থেকে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকতেন।

বিনয় এবং হীনম্মন্যতার মাঝে পার্থক্য

আজকাল মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হয়। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'দুর্বল মানসিকতা' খুব প্রসিদ্ধ। মনে করা হয়, এটা এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা প্রয়োজন। এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন : জনাব! আপনারা যে বলেন, 'নিজেকে মিটিয়ে দাও' এটা তো আপনাদের উচিত হচ্ছে না। কেননা, এর কারণে মানুষের মাঝে 'দুর্বল মানসিকতা' সৃষ্টি হয়। সর্বক্ষেত্রে তখন নিজেকে অযোগ্য ও ছোট মনে হয়। একজন মানুষের স্পিরিটকে দিয়ে তাকে মানসিক সংঘাতের প্রতি ঠেলে দেয়া কি উচিত?

প্রকৃতপক্ষে বিনয় ও মানসিক দুর্বলতা এক জিনিস নয়। প্রথম কথা হলো, মনোবিজ্ঞানের জনক যারা, তাদের মাঝে দ্বীনী ইলম কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) ইলম সম্পর্কে অজ্ঞতা ছিলো। 'মানসিক দুর্বলতা' শব্দটি তাদের আবিষ্কার। অথচ বিনয় ও মানসিক সংকটের মাঝে পার্থক্য একেবারে পরিষ্কার। কিন্তু তারা পার্থক্য করতে না পারার কারণে ভ্রান্তির শিকার হয়। উভয়টিকে তারা একাকার করে ফেলে।

মানসিক দুর্বলতায় নেতিবাচক দিক

বিনয় এবং মানসিক দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য হলো, মানসিক দুর্বলতা মানে মানসিক সংকট। মানুষ এক প্রকার সংকটে ভোগে বিধায় সৃষ্টিশৈলী সম্পর্কেও নেতিবাচক মন্তব্য করে। যেমন মনে করে, সৃষ্টিগতভাবে আমি দুর্বল কিংবা বঞ্চিত। আমি আরো পাওনা ছিলাম; কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে কম পেয়েছি। আমার চেহারা আরো সুন্দর হতে পারতো, অথচ এ ব্যাপারে আমাকে ঠকানো হয়েছে। আমাকে কুৎসিত কিংবা অসুস্থ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাকে সম্পদ কম দেয়া হয়েছে, আমার মর্যাদা হ্রাস করা হয়েছে। এসব কিছুই আমি জন্মগতভাবে পেয়েছি- এ ধরনের একটা মানসিক সংকটে ভুগতে থাকার নাম মানসিক দুর্বলতা। এর একটা নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই আছে। যেমন এর ফলে তার মেজাজ সুস্থ থাকে না, সব সময় খিটখিটে মেজাজে থাকে। অন্যকে হিংসা করে। জীবন সম্পর্কে হতাশায় ভোগে। মনে করে, আমি অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছুই হবে না। মোটকথা 'মানসিক দুর্বলতা'র বুনিয়াদ গড়ে উঠে আল্লাহর তাকদীর সম্পর্কে অভিযোগ ও অনুযোগের ভিত্তিতে।

বিনয় শোকরের ফল

পক্ষান্তরে বিনয় এমন কোনো বিষয় নয় যে, এর কারণে তাকদীর সম্পর্কে অভিযোগ সৃষ্টি হয়। বরং বিনয় হলো, আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায়ের সুন্দর ফলাফল। একজন বিনয়ীর সার্বক্ষণিক ভাবনা থাকে, আমি অমুক নেয়ামতের যোগ্য নয়, অথচ আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এটা আমার উপর আল্লাহর দয়া, তাঁর দান। অথচ এ নেয়ামতের যোগ্য আমি নই।

উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেলো, মানসিক দুর্বলতা ও বিনয় কখনও এক বিষয় নয়। বিনয় সকলের নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। অপর দিকে মানসিক সংকট হলো সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর অহংকারীকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন। সুতরাং বিনয়ী অবশ্যই সম্মানিত হয়, অহংকারী অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়।

বিনয় প্রদর্শনী

অনেক সময় আমরা বিনয়ের প্রদর্শনী দেখিয়ে বলি : 'আরে ভাই! আমার হাকীকতই বা কী? নাচিজ, অপদার্থ ও অকর্মা আমি।' মূলত এর নাম বিনয় নয়। এ হলো, বিনয় প্রদর্শনী। বিনয়ের তাৎপর্য এখানে নেই। হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন : যে ব্যক্তি বিনয়ের প্রদর্শনী দেখায়, তার

বিনয় পরীক্ষা করার একটা পদ্ধতি আছে। যখন সে বলবে : আমি গুনাহগার, নাচিজ, বড়ই নাচার ইত্যাদি, তখন তার মুখের উপর যদি বলে দেয়া হয়, হাঁ, আসলেই তোমার কথা সঠিক। তুমি যা বলছো, তা একেবারে ঠিক। তারপর লক্ষ্য করে দেখবে, এই উত্তরের প্রতিক্রিয়া কী। এতে যদি তার মাঝে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে, আসলেই সে বিনয়ী। আর যদি তার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, চেহারায় অমাবশ্যা আসে, তাহলে বুঝে নিবে যে, সে আসলে বিনয়ী নয়, বরং বিনয় প্রদর্শনকারী। তার বিনয় ছিলো বানোয়াট বিনয়। উদ্দেশ্য ছিলো এর মাধ্যমে সে প্রশংসা কুড়াবে। শ্রোতা তাকে বলবে : না, হযরত, আপনি এ কী বলছেন! আমরা তো জানি আপনি মুত্তাকী, আপনি এমন, আপনি তেমন ইত্যাদি।

না-শোকরীও যেন না হয়

প্রশ্ন হয়, সকলেরই মাঝে কিছু না কিছু ভালো গুণ থাকে। আল্লাহ কাউকে সুস্থতা দান করেছেন, কাউকে হয়ত ইলম দান করেছেন কিংবা সম্পদশালী করেছেন অথবা কোনো মর্যাদা কিংবা পদ দান করেছেন। এ সকল নেয়ামত প্রাপ্তির পর একজন মানুষ তা কিভাবে অস্বীকার করবে? অস্বীকার করলে তো নাশোকরী হবে। প্রকাশ করলে বিনয়ে ত্রুটি আসবে। সুতরাং এ দু'য়ের মাঝে সমন্বয় কিভাবে করা হবে? এর জবাবে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন : বিনয়েরও একটা মাপকাঠি আছে। অতিরিক্ত বিনয়ও কাম্য নয়, যা নাশোকরীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিনয়ও থাকবে, শোকরও থাকবে, তাহলেই প্রকৃত বিনয় হবে।

এর নাম বিনয় নয়

হযরত থানভী (রহ.) তার মাওয়ায়েজে লিখেছেন : একবার আমি ট্রেনে সফর করছিলাম। আমার নিকট কিছু লোক উপবিষ্ট ছিলো। তারা পরস্পর আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলো। আমি ঘুমোতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তাদের কথাবার্তার কারণে ঘুমও আসছিলো না। যখন খাওয়ার সময় হলো, তারা আমাকেও সাধলো। বললো : হযরত! তাশরীফ রাখুন। আমাদের সঙ্গে কিছু ঘু-মুত আপনিও খেয়ে নিন। তারা এ সুস্বাদু খাবারকে 'ঘু-মুত' তথা পেশাব-পায়খানা শব্দে বর্ণনা দিলো। বললাম : ভাই! এটা তো খাদ্যদ্রব্য। তোমরা ঘু-মুত বললে কেন? তারা উত্তর দিলো : বিনয়বশত বলছি। আমরা নিজেদের খাবারকে যদি অভিজাত সাব্যস্ত করি, তাহলে অহংকারী হয়ে যেতে পারি। বললাম : এটা খাবার, আল্লাহর নেয়ামত, তাঁর রিযিক। এমন অশোভনীয় শব্দ এর জন্য কিভাবে শোভনীয় হতে পারে? আসলে প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই ভাবতে হবে, এটা

আল্লাহর দান। তাঁর দানের শোকর আদায় করতে হবে। নেয়ামতের না-শোকরী করা যাবে না।

অহংকার ও নাশোকরী থেকে সতর্ক থাকতে হবে

নাশোকরী থেকে বাঁচতে হবে, তেমনিভাবে অহংকার থেকেও। এর মাঝে বিনয়ী হতে হবে। যেমন কেউ নামায পড়লো, রোযা রাখলো। আর মনে মনে ভাবলো, আমি তো মস্ত বড় আমল করেছি, তাহলে এটা অহংকার হবে। অন্যদিকে এ আমলকে যদি একেবারে তুচ্ছ মনে করে যেমনটি আজকাল অনেকেই করে এবং ববলে : কোনো রকম কপাল রেখেছি, দু' একটা ঢু' দিয়েছি, এমনটি বলার নাম বিনয় নয়। এটা হবে ইবাদতের অবমূল্যায়ন কিংবা অকৃতজ্ঞতা। নাকদরী অথবা নাশোকরী।

শোকর ও বিনয় একত্র হয় কিভাবে?

প্রশ্ন হলো, উভয়টি কিভাবে একত্র করা হবে? নাশোকরী ও অহংকার হতে পারবে না। শোকর ও বিনয় থাকতে হবে। একই সাথে এ দু'টির মিলন কিভাবে সম্ভব হবে? প্রকৃতপক্ষে এটা কঠিন কোনো কাজ নয়। একেবারে সহজ বিষয়। তা এভাবে যে, এ ভাবনা সৃষ্টি করবে, 'কাজটি অথবা আমলটি করার মত যোগ্যতা আমার মাঝে মোটেও নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমের কারণে করতে পেরেছি।' এরূপ ভাব সৃষ্টি করতে পারলে, শোকর ও বিনয় একত্র হয়ে যাবে। নিজেকে ছোট মনে করার মাধ্যমে 'বিনয়' হয়ে গেলো, আর আল্লাহর দয়ার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে 'শোকর'ও হয়ে গেলো। দু'টি সুন্দর বস্তুর সম্মিলন ঘটে গেলো। এইজন্যই শোকর থাকলে অহংকার ঘেষতে পারবে না। কেননা, শোকরের অর্থই হলো, নিজের যোগ্যতার উপর তৃপ্ত না হয়ে বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি দেয়া। লক্ষ্য করুন, নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণীতে বিনয় ও শোকর কিভাবে ফুটে উঠেছে–

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ (ترمذى، كتاب المناقب، حديث نمبر ٢٦٣٢)

তিনি বলেন : 'আমি বনী আদমের সরদার।' কেউ হয়ত ভাবতে পারে, এটা তো অহংকারপূর্ণ কথা। তাই তিনি সাথে সাথে বলে দিলেন : ولا فخر অহংকারবশত: এটা বলছি না; বরং এতো আমার আল্লাহর দান। তিনি আমাকে সকল মানুষের সেরা বানিয়েছেন, সকলের নেতা বানিয়েছেন। আমার কোনো নিজস্ব কৃতিত্ব নেই, এটা সম্পূর্ণ তাঁর দয়া ও দান।

একটি উপমা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : এর উপমা হলো, মনে কর– আগেকার দিনে গোলামের প্রচলন ছিলো। রীতিমত বাজারে মানুষ বেচাকেনা হতো। মনিব গোলামের প্রতিটি জিনিসের মালিক হতো। মালিকের প্রতিটি নির্দেশ সে পালন করতে বাধ্য হতো। মনিব যদি বলতো, আমি দীর্ঘ সফরে যাচ্ছি; আজ থেকে আমার রাজত্বের দেখাশুনা তুমি করবে, তাহলে গোলামকে তা-ই করতে হতো। তাকে রাজত্ব চালাতে হতো। প্রয়োজনে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করতে হতো। নিজে গোলামের গোলাম অথচ রাজত্বের মূল নায়ক হয়ে রাজ্য চালাতে হতো। এ অবস্থায় গোলামের এ কল্পনাও আসে না যে, সে এ পর্যায়ে এসেছে নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে। বরং সে তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে জানে। তার জানা আছে, মনিব যখন আসবেন, তখন তাকে যদি বলেন : যাও, বাথরুম পরিষ্কার কর, তখন তাকে সেটাই করতে হবে। মনিবের হুকুমের সামনে আমাকে মাথা পেতে দিতে হবে। মনিবের হুকুমের সামনে গোলামের রাজত্বের কোনো মূল্য নেই। কারণ, এটা মনিবের রাজত্ব, গোলামের নয়। গোলামের অন্তরের এই যে অনুভূতি এটা এক বাস্তব অনুভূতি।

বান্দার মর্যাদা গোলামের চেয়ে বেশি নয়

এটা তো হলো এক গোলামের বিবরণ। বান্দা তো গোলামের চেয়েও নিম্ন স্তরের। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কাউকে যদি কোনো 'পদ' দান করেন, তাহলে ভাবতে হবে– 'পদ' আল্লাহর দান। তিনি দিয়েছেন, তাই আমি চালাচ্ছি। কিন্তু আমার প্রকৃত পরিচয় তো আমি তার বান্দা। আমার হাকীকত উক্ত গোলামের চেয়ে বেশি কিছু নয়। যে গোলামকে তার মনিব রাজত্ব দিয়েছিলো। এভাবে পৃথিবীর মঞ্চে কত গোলাম আসলো, গেলো আর রাজত্ব করে বিদায় হয়ে গেলো।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক গোলাম তার মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। সে মনিবের রাজত্ব দখল করে নিলো। দীর্ঘদিন রাজত্ব চালালো। ছেলেমেয়েরও পিতা হলো। ছেলেমেয়েকেও মানুষ 'রাজপুত' বলে ডাকে। একবার এই গোলাম– যে এখন বাদশাহ– শেখ ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস সালামকে নিজ দরবারে ডেকে আনলেন। ইযযুদ্দীন আল্লাহর একজন ওলী ছিলেন। সমকালীন মুজাদ্দিদ ছিলেন। গোলাম

বাদশাহ তাঁকে ডেকে বললেন : আমি আপনাকে কাজী (বিচারক) বানাতে চাই। শেখ উত্তর দিলেন : বিচারক নিয়োগদানের ক্ষমতা তাঁরই আছে, যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহ হবেন। আপনি ন্যায়সঙ্গত বাদশাহ নন। কেননা, আপনি একজন গোলাম, মনিবকে হত্যা করে নিজে বাদশাহ সেজেছেন। নিজের মালিকানায় অনেক জমি-জিরাত রেখেছেন; অথচ আপনি কিছুতেই মালিক হতে পারেন না। কেননা, গোলামের মাঝে মালিক হওয়ার যোগ্যতা নেই। অতএব আপনি যতক্ষণ না আপনার এ অবস্থার সংশোধন হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার দেয়া কোনো পদবী আমি গ্রহণ করবো না।

সেই যুগের মানুষ সহজ-সরল ছিলো। যদিও সে নিজ মনিবকে হত্যা করার মত অপরাধ করেছিলো, তবুও অন্তরে আল্লাহর ভয়ও ছিলো। আল্লাহওয়ালার উপদেশ তার অন্তরে রেখাপাত করলো। তাই সে বললো : আপনি তো ঠিকই বলছেন। আসলেই তো আমি গোলাম। এখন আমাকে এমন কোনো পথ বলে দিন, যাতে আমি স্বাধীন হতে পারি।

শেখ বললেন : পথ একটাই। আপনি ও আপনার সব সন্তান বিক্রি হওয়ার জন্য বাজারে দাঁড়াবেন। যে মূল্যে আপনারা বিক্রি হবেন, তা আপনার মরহুম মনিবের ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আপনাকে কিনে নিবে, পরবর্তীতে সে আপনাকে মুক্ত করে দিবে, তাহলে আপনি স্বাধীন হতে পারেন।

দেখুন, বাদশাহকে বলা হচ্ছে, আপনাকে ও আপনার সন্তানদেরকে বাজারে বিক্রি করা হবে, মূল্য ধরা হবে, নিলাম হবে, তারপর আপনার রাজত্ব বৈধতা পাবে।

যেহেতু তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে জাগরুক ছিলো এবং আখেরাতের ভাবনা সতেজ ছিলো, তাই সে শেখের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো।

বিশ্ব ইতিহাসের এ এক নজীরবিহীন ঘটনা। বাদশাহ ও তার সন্তানদের বাজারে বিক্রি করা হলো। এক ব্যক্তি ক্রয় করে পরবর্তীতে মূল্য নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলো। তারপর বাদশাহর রাজত্ব বৈধ হলো। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এমন কিছু দৃষ্টান্তও আছে, যা অন্য জাতির ইতিহাসে কল্পনাও করা যায় না।

যাহোক, যেমনিভাবে একজন গোলাম সিংহাসনে বসেও একথা স্মরণে রেখেছে যে, সে একজন গোলাম, অনুরূপভাবে যখন তুমি উঁচু পদের মালিক হবে, ভাববে, তুমিও আল্লাহ তাআলার বান্দা। এই বাস্তব কথা মনে রাখলে তোমার পক্ষ থেকে কখনও জুলুমের হাত উত্তোলিত হবে না।

ইবাদতে বিনয়

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে নামায আদায়ের তাওফীক দান করেন, তাহলে নামাযের বিষয়টি অন্যের নিকট প্রকাশ করবেন না। প্রচারমুখী হওয়া কখনও উচিত নয়। নামায পড়ে বুযুর্গ হয়ে যাওয়ার দাবি করাও কখনও কাম্য নয়। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে–

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْىَ

'এক তাঁতীর একবার দু' রাকাআত নামায পড়ার সুযোগ হলো। তারপরেই সে অহীর অপেক্ষায় বসে গেলো।' সে ভাবলো, আমার আমলটি বিশাল, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী তো আসবেই। মূলত নিজের আমলকে বড় মনে করা বোকামী বৈ কিছু নয়। আবার ছোট মনে করাও নাশোকরির পরিচয়। এর মাঝামাঝি থাকা-ই হলো ইসলামের শিক্ষা। অনেকে বলে থাকে, আমার আবার কিসের নামায, এই কোনো রকম ওঠাবসা করি, আর কী। এ ধরনের কথায় মূলত নামাযের মূল্যহানী ঘটে। বরং বলতে হবে, আসলে নামায পড়ার মত যোগ্যতা আমার নেই। আল্লাহর দয়া ও করুণা আমার উপর অসীম, তাই তিনি আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিলেন।

দুটি কাজ করে নাও

এভাবে আল্লাহ তাআলা যদি কোনো ইবাদতের তাওফীক দান করেন, তখন দুটি কাজ অবশ্যই করবে।

১. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। কেননা, অনেক লোক আছে, যাদের ভাগ্যে নামায পড়ার তাওফীক হয় না। এতো তাঁরই দয়া, তিনি তোমাকে তাওফীক দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

২. ইসতেগফার করবে। ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আমলটি করতে গিয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন।

উদ্দেশ্যহীন চাওয়া-পাওয়া

অনেক সময় আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ি। ভাবি, দীর্ঘদিন হলো নামায পড়ছি, তাসবীহ পড়ছি, যিকির করছি, নির্দিষ্ট ওজীফা আদায় করছি, তাহাজ্জুদ, ইশরাকও নিয়মিত পড়ছি। অথচ অন্তরের কোনো পরিবর্তন দেখছি না। বিশেষ কোনো অবস্থা অন্তরে সৃষ্টি হয় না। মনে রাখবেন, এ ধরনের চাওয়া-পাওয়ার কোনো

মানে হয় না। এর কোনো তাৎপর্য নেই। বিশেষ কোনো অবস্থা অনুভূত হতে হবে এমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আল্লাহ যতটুকু আমলের তাওফীক দেন, ততটুকুই তাঁর দান। হাঁ, অন্তরে শঙ্কা থাকা অবশ্যই ভালো। আমল কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না– এ ধরনের ফিকির থাকা অবশ্যই কাম্য। তবে অন্তরে আশার প্রদীপও জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আল্লাহর নিকট আশা করতে হবে যে, তিনি আমল করার তাওফীক দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কবুলও করে নিবেন।

ইবাদত কবুল হওয়ার আলামত

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো, হযরত! দীর্ঘদিন থেকে নামায পড়ছি। কিন্তু আমি শঙ্কিত যে, আল্লাহর দরবারে কবুল হলো কিনা? হযরত উত্তর দিলেন, ভাই! এসব নামায যদি কবুল না হতো, দ্বিতীয়বার নামায পড়ার তাওফীক হতো না। এক আমল দ্বিতীয়বার করার তাওফীক হওয়া মানে আল্লাহ তাআলা আমলটি কবুল করেছেন। 'আল্লাহ চাহেন তো' এটাই কবুল হওয়ার নিদর্শন। কিন্তু এটা এজন্য নয় যে, আমলের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিলো; বরং এটা এজন্য যে, আল্লাহর তাওফীক ভাগ্যে জুটলো। যে আল্লাহ এতটুকু দয়া করেছেন, সেই আল্লাহ কবুলও করতে পারেন। সুতরাং নামায বরং যে-কোনো ইবাদতকে কখনও ছোট মনে করবে না।

এক বুযুর্গের ঘটনা

মাওলানা রূমী (রহ.) মসনবী শরীফে ঘটনাটি লিখেছেন। এক বুযুর্গ অনেক দিন যাবৎ নামায আদায় করছেন, যিকির-আযকার করছেন। একদিন তার অন্তরে একটি কথা জাগলো যে, অনেক দিন থেকে অনেক কিছু করেছি। এ পর্যন্ত অসংখ্য আমল করেছি; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর তো পেলাম না। জানি না, তিনি এসব আমল কবুল করেছেন কিনা, তাঁর নিকট এগুলো পছন্দ হয়েছে কিনা।

এ ভাবনা উদয় হওয়ায় বুযুর্গ চিন্তায় পড়ে গেলেন। চলে গেলেন নিজ শায়খের দরবারে। আরজ করলেন, হযরত! দীর্ঘদিন থেকে নেক আমল করছি; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক উত্তর আজও পেলাম না।

শায়খ জবাব দিলেন, আরে বোকা! তুমি যে প্রতিমুহূর্তে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার তাওফীক লাভ করছো, এটাই আল্লাহর ইতিবাচক জবাব। কেননা, তোমার আমল যদি কবুল না হতো, 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলার তাওফীক তোমার

হতো না। যাও, অন্য কোনো জবাবের প্রয়োজনই কিসের? মাওলানা রূমী (রহ.)-এর ভাষায়–

کہ گفت آن اللہ تو لبیک ماست
زیں نیاز و درد و سوزک ماست

অর্থাৎ– 'তুমি যে 'আল্লাহ-আল্লাহ' করছো, এটাই আমার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে চমৎকার উত্তর। একবারের পর দ্বিতীয়বার তাওফীক লাভ করার অর্থই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব পাওয়া।

চমৎকার একটি উপমা

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, একদিন কোনো লোকের কাছে গিয়ে প্রশংসা কর, তার গুণগানের কথা বল। পরের দিন গিয়ে আবার তার প্রশংসা কর। তৃতীয় দিনেও অনুরূপ তার প্রশংসা কর। যদি তোমার এ কাজটি তার কাছে ভালো লাগে, তাহলে সে প্রতিবারই পুলকিত হবে এবং তোমার কথা শুনবে। তোমাকে বাধা দিবে না। পক্ষান্তরে এ বারবার প্রশংসা যদি তার কাছে ভালো না লাগে, তাহলে হয়ত একবার কিংবা দু'বার তাকে প্রশংসাবাণী শোনাতে পারবে। তৃতীয়বারে সে বিরক্তি প্রকাশ করবে। হয়ত তোমাকে বেরও করে দিবে। তোমাকে আর প্রশংসা করার সুযোগ দিবে না।

অনুরূপভাবে তুমি আল্লাহর যিকির করছো, আল্লাহ তাআলা প্রতিবারই তোমার যিকির শুনছেন। তিনি তোমাকে বাধা দেননি। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এভাবে বারবার যিকির করার তাওফীক তোমাকে দিচ্ছেন। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তিনি প্রতিবারই কাজটি পছন্দ করেছেন। 'ইনশাআল্লাহ' তোমার এ সামান্য আমল আল্লাহ কবুল করেছেন। তাই তাঁর শুকরিয়া আদায় কর।

সকল কথার সারকথা

হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, সোজা-সাপটা কথা হলো, নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করতে থাক এবং প্রতিটি আমলের জন্য আল্লাহর শোকর নিবেদন কর। বলো যে, হে আল্লাহ! এটা আপনারই মেহেরবানী যে, আমাকে সুযোগ দান করেছেন। তাই আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মাঝে কোনো সামর্থ নেই। আপনার তাওফীকই আমার চলার পথের পাথেয়। এভাবে দু'আ করবে। গুনাহর কথা মনে পড়লে

ইস্তেগফার করবে। এরূপ করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' বিনয়ের দাবি পূরণ হয়ে যাবে। শুকরিয়ার হকও আদায় হয়ে যাবে। অহংকার মন থেকে দূরীভূত হবে।

বিনয় অর্জনের তরীকা

বিনয় অর্জন তখন হবে, সর্বদা যখন নিজেকে আল্লাহর গোলাম মনে করবে। স্বতস্ফূর্তভাবে আন্তরিকভাবে বলবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাকে যে কাজের নির্দেশ দেন, আমি নির্দ্বিধায় তা পালন করবো। যদি তিনি আমাকে সিংহাসনের দায়িত্ব দেন, তাহলে আমি সে কাজ-ই করবো। কেননা, আমি তাঁর গোলাম, আমি তাঁর বান্দা। তিনি আমাকে যা দান করেন, এটা তাঁরই অনুগ্রহ। এভাবে অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শোকর ও বিনয় উভয়টাই অর্জিত হবে।

এইজন্য সুফীগণ বলেন, আল্লাহর আরিফ তথা যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে, সে ব্যক্তি বিপরীতমুখী দু'টি বস্তুর মাঝে সম্মিলন ঘটিয়েছে। যেমন, একদিকে সে নিজের আমলকে ছোট মনে করে না, অপরদিকে আমলকে বড়ও মনে করে না। একদিকে মনে করে, তার আমল কিছুই না, অপর দিকে মনে করে, তার আমল অনেক কিছু। অর্থাৎ- নিজের অযোগ্যতার দৃষ্টিকোণে আমলটি সত্যিই ছোট কিন্তু আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন- এ দৃষ্টিকোণে আমলটি অনেক বড়। এভাবে বিপরীতমুখী দুই মোহনার মিলন ঘটে এবং আল্লাহপ্রেমে সে সতেজ হয়ে ওঠে।

শোকর যত পার আদায় কর

ডা. আবদুল হাই (রহ.) প্রায়ই বলতেন, আমি তোমাদেরকে আজ একটি কথা শোনাবো। কথাটি তোমাদের নিকট এখন মূল্যহীন মনে হতে পারে। আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝবার শক্তি দান করলে বুঝবে কথাটির মূল্য কত! কথাটি হলো, যত পার আল্লাহর শোকর আদায় কর, তাহলে বিনয়ের দৌলত নসীব হবে। আল্লাহর রহমতে তখন অহংকারসহ সকল আত্মিক রোগ দূরে চলে যাবে। বাস্তবিকই ডাক্তার সাহেবের কথাটির প্রকৃত মূল্য তখন আমরা বুঝতে পারিনি। অবশ্য এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি। হযরত আরো বলতেন, আগের যুগের রিয়াযত-মুজাহাদা তোমরা কোত্থেকে করবে। মানুষ তখন শায়খের দরবারে যেতো, আত্মশুদ্ধির জন্য কত কষ্ট করতে হতো। বছরের পর বছর শায়খের দরবারে পড়ে থাকতো। ক্ষুধা আর সমূহ অনুশীলন তাকে ঘিরে রাখতো। আজ তোমাদের নিকট এত সময় কোথায়? তাই শুধু একটি কাজ কর, বেশি বেশি শোকর আদায় কর। শোকর যত করবে, বিনয় তত বাড়বে। আল্লাহর রহমত তখন সাথী হবে। অহংকার দূর হবে। আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে।

শোকরের অর্থ

শোকরের অর্থ বুঝে নাও। বুঝে-শুনে শোকর আদায় কর। শোকরের অর্থ হলো, নিজেকে ছোট মনে করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ- কাজটি করার যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন, তাই করতে পেরেছি। এজন্য তাঁর শোকর আদায় করছি। এর নাম বিনয়। নিজেকে যোগ্য মনে করলে, বিনয় হয় না, শোকরও হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার অধিকার দিয়ে দেয়া- এটা তো শোকরের ক্ষেত্র হয় না। যেমন- এক ব্যক্তি ঋণ নিলো, ঋণদাতাকে যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিয়ে দিলো। তখন ঋণদাতার উপর ওয়াজিব নয় যে, তার শোকর আদায় করবে। কেননা, ঋণদাতা তো তার ঋণ পেয়েছে, মানে তার অধিকার বুঝে পেয়েছে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করে ঋণদাতার উপর দয়া করেনি; বরং নিজকর্তব্য পালন করেছে। তাই এটা শোকরের ক্ষেত্র নয়। শোকর তো তখন আসবে, যখন মনে করবে যে, আমি এটার উপযুক্ত ছিলাম না। আমাকে আশার তুলনায় আরো অধিক দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহর শোকর আদায় করার সময় অবশ্যই ভাববে, আমি আশার চেয়ে বেশি পেয়েছি। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নেয়ামতটি পেয়েছি। আল্লাহ মহান। কেননা, এটা তো তাঁরই দান। আমার কি যোগ্যতাই বা আছে, কি কোয়ালিটিই বা আছে, অথচ আল্লাহ আমার উপর কত রহম করেছেন। এটা তাঁরই দয়া, তাঁরই মহিমা। এভাবে বিনয়ের অমূল্য দৌলত অর্জন করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন-

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিনয় অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।'

উপসংহার

আরেকটি কথা না বললেই নয়। তাহলো বিনয় যদিও অন্তরের আমল। মানুষ নিজেকে আন্তরিকভাবে অপর থেকে অধম মনে করবে। তবে অন্তরের বিনয় জাগ্রত রাখতে হলে সব সময় কাজের ভেতরে থাকতে হবে। বিনয়ের কারণে যেন কোনো কাজে বাধা সৃষ্টি না হয়- এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অহেতুক লজ্জা করা উচিত নয় এবং ছোট থেকে ছোট কাজও নিজের জন্য মর্যাদাহানীকর ভাবা উচিত নয়। বরং ছোট-বড় যে-কোনো কাজ নির্দ্বিধায় করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। দ্বিতীয়ত চলনে-বলনে অহংকার যেন প্রকাশ না পায়, এ

দিকেও লক্ষ্য রাখবে। কথাবার্তায় ও উঠাবসায় বিনয় ও কোমলতার বিকাশ ঘটাবে। অন্তরে বিনয় থাকার পাশাপাশি বাহ্যিক চাল-চলনেও নম্রতা-ভদ্রতা বজায় রাখবে। প্রকৃত বিনয় অর্জনের এও একটি পদ্ধতি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদেরকে বিনয় অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"হিংসার উপমা আগুনের মত। আগুনের কাজ হলো জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া। যেমন আগুন শুকনো কাঠকে পুড়ে খেয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে কাঠের অস্তিত্বই থাকে না, কাঠ ছাঁই হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে আগুনের তপ্ত জিহ্বা জ্বালানোর লোভে যখন অন্য কিছু খুঁজে পায় না, তখন সে নিজেকেই নিজে খাওয়া শুরু করে। জ্বলতে জ্বলতে নিজের অস্তিত্বকেও শেষ করে দেয়। অনুরূপভাবে হিংসুকের বিষাক্ত কামনা অপরকে দংশন করার কামনায় মত্ত থাকে। কিন্তু যখন ব্যর্থ হয়, তখন নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে এবং ক্রমে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।"

হিংসা একটি সামাজিক রক্তক্ষরণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ. فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اَوْ قَالَ : الْعُشْبَ (ابو داؤد، كتاب الادب، باب فى الحسد، حديث نمبر ٤٩٠٣)

হিংসা একটি আত্মিক ব্যাধি

যেমনিভাবে বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে কিছু আমল আছে ফরজ আর কিছু আছে ওয়াজিব এবং কিছু আছে মাকরূহ কিংবা হারাম। অনুরূপভাবে আত্মিক আমলসমূহের কতক আমল আছে ফরজ কিংবা ওয়াজিব অথবা হারাম ও গুনাহ। বাহ্যিক কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা যেমনিভাবে জরুরী, অনুরূপভাবে আত্মিক নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক। আত্মিক গুনাহসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে করে এসেছি। এ পর্যায়ে আরেকটি আত্মিক গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করার আশা রাখি। এ গুনাহটি হলো হিংসা। যে হাদীসটি আমি পাঠ করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ গুনাহটির বিবরণ দিয়েছেন। হাদীসটির অর্থ হলো, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমনিভাবে আগুন শুকনো লাকড়ি অথবা শুকনো খড়-কুটোকে গিলে ফেলে।

হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে

প্রকাণ্ড অগ্নি কুণ্ডলী মিনিটের মধ্যে সবকিছু ছাঁই করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে নিভু নিভু আগুন ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে। এ আগুনও খড়-কুটোকে ছাই করে দেয়। তবে একসাথে নয়; বরং ধীরে ধীরে। তেমনিভাবে হিংসার আগুনও ধীরে ধীরে জ্বলে। শনৈ: শনৈ: মানুষের নেক আমলসমূহ ভস্ম করে দেয়। মানুষ বুঝতেই পারে না, তার আমলের খাতা শূন্য হয়ে গেছে। এজন্য রাসূল (সা.) হিংসা থেকে বাঁচার জন্য সবিশেষ তাগিদ দিয়েছেন।

হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

হিংসা থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। অথচ আমাদের হালচালে মনে হয়, এ বেঁচে থাকার কোনো গরজ নেই। আমাদের সমাজ আজ হিংসাপূর্ণ সমাজে পরিণত হয়েছে। অক্টোপাশের মত হিংসা আমাদের সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে। হিংসা থেকে নিরাপদ জীবন আজ কল্পনাই করা যায় না। অথচ এটি একটি মারাত্মক জীবাণু। যে জীবাণু নষ্ট করে ফেলা সকলেরই কর্তব্য।

সর্বপ্রথম বোঝা দরকার হিংসার হাকীকত কি? হিংসা কত প্রকার ও কি কি? কেন মানুষের মাঝে হিংসা সৃষ্টি হয়? হিংসা থেকে বেঁচে থাকার পন্থাই বা কি? এ চারটি বিষয় সকলের জানা প্রয়োজন। আজ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। আল্লাহ তাআলা আজকের আলোচনা ফলপ্রসূ করুন। এ ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিংসা কাকে বলে?

অপরের পার্থিব কিংবা পরকালীন নেয়ামত দেখে অন্তর জ্বলে ওঠা এবং নেয়ামতটি তার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কামনা করার নাম হিংসা। এটাই হিংসার নিগূঢ় বার্তা।

যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো বান্দাকে সম্পদশালী করেছেন অথবা সুঠাম ও সুস্থ দেহ দান করেছেন, কিংবা প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা দান করেছেন, ইলমের মর্যাদা অথবা অন্য কোনো মর্যাদায় আল্লাহ তাঁকে ধন্য করেছেন– এই দেখে আরেকজনের অন্তর জ্বলে উঠলো, ভাবলো– এই নেয়ামত সে কেন পেলো? যদি নেয়ামতটি তার জীবন থেকে সম্পূর্ণ মিটে যেতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! এভাবে অপরের উন্নতি দেখে সহ্য করতে না পারা এবং এর জন্য অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হওয়ার নামই হিংসা।

এই হিংসা নিয়ে যদি তাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা করা হয়, তাহলে সহজেই অনুভূত হবে যে, হিংসা মানে আল্লাহর তাওফীকের উপর প্রশ্ন উত্থাপন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাকে কেন এ নেয়ামত দান করলেন? তিনি আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন? সুতরাং আরেকটু ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, হিংসা মানে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে এক নীরব আপত্তি। ইহসানদাতা ও নেয়ামতদাতার বিরুদ্ধে এক সুক্ষ্ম কটুক্তি এবং অপরের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার এক অহেতুক বিপত্তি। এজন্যই হিংসা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

ঈর্ষা করা যাবে

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বুঝে নিতে হবে, অনেক সময় এমন হয় যে, আরেকজনের কোন গুণ বা নেয়ামত দেখে নিজের অন্তরেও সেটি পাওয়ার কামনা সৃষ্টি হয়। তাহলে এটা হিংসা নয়, এটা ঈর্ষা। এটা নিষেধ নয়; বরং জায়েয। আরবী ভাষায় হিংসা ও ঈর্ষা উভয়ের ক্ষেত্রেই 'হাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মাঝে ব্যবধান আছে। যেমন কারো ভালো বাড়ি, চাকরি কিংবা ইলম দেখে নিজেও অনুরূপ আশা করা এবং আল্লাহর নিকট কামনা করা– এটা হিংসা নয়, বরং ঈর্ষা। ঈর্ষা হারাম নয়, জায়েয। তবে এ-ঈর্ষার সঙ্গে যদি অন্তর্জ্বালা যুক্ত হয় এবং অপরের সেই নেয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার অহেতুক আশা মিলিত হয়, তাহলে সেটা আর ঈর্ষা থাকে না। ঈর্ষা তখন হিংসায় পরিণত হয় বিধায় জায়েয কাজ তখন হারাম আমলে রূপান্তরিত হয়।

হিংসার তিনটি স্তর

হিংসার তিনটি স্তর আছে।

১. অন্তরে এ আশা সৃষ্টি হওয়া যে, অনুরূপ নেয়ামত যেন আমিও পেয়ে যাই। তার নিকট থাকাবস্থায় যদি পাই, তাহলে ভালো। তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যদি পাই, সেটাতেও আপত্তি নেই। এটা হিংসার প্রথম স্তর।

২. অমুক যে নেয়ামত পেয়েছে, সেটা আমাকেও পেতেই হবে। আর তার পদ্ধতি হবে, সেই নেয়ামতটা তার হাত থেকে খোয়াতে হবে এবং আমার মালিকানায় আনতে হবে। এটা হিংসার দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরের হিংসায় দু'টি চাওয়া-পাওয়া থাকে। প্রথমত তার হাত থেকে নেয়ামতটি চলে যাওয়া। দ্বিতীয়ত নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার দুরভিসন্ধি করা।

৩. হিংসার তৃতীয় স্তর হলো, অন্তরের এক অপবিত্র চাওয়া। অর্থাৎ, আমি চাই, নেয়ামতটি তার হাত থেকে চলে যাক। নেয়ামতের কারণে সে যে আনন্দ

লাভ করেছে, তার সেই আনন্দ মিটে যাক। তারপর সেই নেয়ামত আমার কাছে আসুক কিংবা না আসুক– এতে আমার আপত্তি নেই। এটা হিংসার সর্বনিম্ন স্তর। এ স্তরের হিংসায় থাকে নিতান্ত হীন মানসিকতা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন। আমীন।

সর্বপ্রথম হিংসা করে কে?

সর্বপ্রথম হিংসা করেছে ইবলিস। আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন, তখন এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, এ পৃথিবীর বুকে আমি আমার খলীফা বানাবো। আমার খেলাফতের দায়িত্ব আদম (আ.)কে দান করবো। হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা আদম (আ.)কে সিজদা কর। আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ শুনে ইবলিস হিংসার আগুনে জ্বলে উঠলো। সে ভাবলো, এ গুরুদায়িত্ব আমি পেলাম না, অথচ আদম (আ.) পেয়েছে। সুতরাং আমি তাকে সিজদা করবো না। এই বলে ইবলিস বেঁকে বসলো এবং এভাবে সে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম হিংসার সূচনা করলো। অহংকার ও হিংসার উদ্ভাবক এ ইবলিস। উভয় আমলই একেবারে খবিশ।

হিংসার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া

হিংসার একটি অনিবার্য ফল হলো, যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, সে যদি কোনো দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশায় ক্লিষ্ট হয়, হিংসুক তখন এতে খুব সন্তুষ্ট হয়। যদি সে উন্নতি লাভ করে অথবা আল্লাহর কোনো নেয়ামতের প্রাচুর্য তাকে স্পর্শ করে, হিংসুক তখন দুঃখে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আর অপরের দুঃখ দেখে আনন্দিত হওয়াকে আরবী ভাষায় شماتت বলে। এটাও হিংসার একটি প্রকার। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে রয়েছে–

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"তারা কি মানুষকে হিংসা করে, যা কিছু আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে সে বিষয়ের জন্য?" (সূরা নিসা : ৫৪)

হিংসা কেন সৃষ্টি হয়?

হিংসা নামক ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী? এ ব্যাধি অন্তরে সৃষ্টি হয় কেন? তার দু'টি কারণ আছে।

১. অর্থ-সম্পদ ও পদ-মর্যাদার লোভ। এক কথায় দুনিয়ার লোভে মানুষ একে অপরকে হিংসা করে। যেহেতু মানুষ চায় বড় হতে, তাই অন্যকে বড় হতে দেখলে অন্তর জ্বলে উঠে। তাকে ভুলুণ্ঠিত করার ফন্দি আঁটে।

২. ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে হিংসা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিদ্বেষ থেকে জন্ম নেয় হিংসা। কেননা, বিদ্বেষ মানে যার সঙ্গে বিদ্বেষ আছে, তার দুঃখ-বেদনা দেখে পুলকিত হওয়া এবং তার সুখ ও আনন্দ দেখে মন জ্বলে উঠা। অন্তরে বিদ্বেষ থাকলে হিংসাও অবশ্যই থাকবে। যখন উল্লিখিত দুটি হিংসা জন্ম নেয় মানুষ তখন হিংসুক হয়ে উঠে।

হিংসা দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দেয়

হিংসা এত খতরনাক পাপ যে, এটি কেবল আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং দুনিয়াতেও এটি আত্মঘাতী। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই এর অকল্যাণকর প্রভাব আছে। হিংসা মানে এক অশুভ প্রতিক্রিয়া। অন্তর্জ্বালা, রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়া এবং এর ফলে শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া এসবই হিংসার অনিষ্টকর দিক।

হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে

হিংসার উপমা আগুনের মত। আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো, জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া। যেমন আগুন শুকনো কাঠকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে কাঠের অস্তিত্বই থাকে না, কাঠ ছাঁই হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে আগুনের তপ্ত জিহ্বা জ্বালানোর জন্য অন্য কিছু পায় না, তখন সে নিজেকে নিজেই খাওয়া শুরু করে। জ্বলতে জ্বলতে তার নিজের অস্তিত্বও শেষ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হিংসুকের বিষাক্ত কামনা অপরকে দংশন করার চেষ্টায় মত্ত থাকে। কিন্তু যখন ব্যর্থ হয়, তখন নিজেই জ্বলতে থাকে। জ্বলতে জ্বলতে নিজেকেও ধ্বংসের গহ্বরে টেনে নিয়ে যায়।

হিংসার চিকিৎসা

হিংসার ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজন। এর চিকিৎসা হলো, এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি একথা ভাববে যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোনো হেকমতের কারণে এবং খাছ কোন মাকছাদকে সামনে রেখে আপন নেয়ামতসমূহের বণ্টন বিন্যাস করেছেন। একজনকে এক ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন তো অন্য জনকে অন্য ধারার নেয়ামত দান করেছেন। কাউকে সুস্থ

রেখেছেন, কাউকে বা সম্মানিত করেছেন। একজনকে সম্পদশালী বানিয়েছেন তো অপরজনকে সুখ ও শান্তি দান করেছেন। একজনকে ইলমের মাধ্যমে ধন্য করেছেন এবং আরেকজনকে রূপ ও সৌন্দর্য দ্বারা সজ্জিত করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর নেয়ামতসমূহ সুষম বণ্টন ভাগ করেছেন। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই, যার নিকট আল্লাহর কোনো না কোনো নেয়ামত পৌছেনি। অপর দিকে এমন মানুষের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে সব ধরনের নেয়ামতের অধিকারী।

তিন জগত

এজন্য আল্লাহ তাআলা তিন ধরনের জগত সৃষ্টি করেছেন।

১. সুখ-শান্তির জগত– যে জগতে রয়েছে শুধু সুখ আর শান্তি। দুঃখ ও অশান্তির ক্ষীণতম বাতাসও এ জগতে নেই। এ জগতের নাম জান্নাত। জান্নাত মানে সকল সুখ ও শান্তির এক অনুপম ঠিকানা। এ জগত চমৎকার। আমাদেরও কামনা এ জগত পাওয়ার। আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন। অনুগ্রহ করে জান্নাত নামক সুখের ঠিকানা দান করুন। আমীন।

২. এ জগতের বিপরীতে রয়েছে আরেকটি জগত। যেখানে সুখ ও শান্তির লেশমাত্র নেই। কেবল দুঃখ, শুধুই দুর্দশা আর একমাত্র বেদনা হলো যে জগতের বৈশিষ্ট্য। জাহান্নাম তার নাম। আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ আমাদের দয়া করুন। জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

৩. উপরোক্ত দুটি জগতের মাঝামাঝি রয়েছে আরেকটি জগত। এ জগতে সুখ ও দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলে। আনন্দ ও বেদনা সহাবস্থানে থাকে। শান্তি ও অশান্তি একই ছাদের নিচে বাস করে। এ জগতের নাম দুনিয়া। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না, যে মানুষটি দাবি করতে পারবে যে, আমি শুধু সুখ পেয়েছি, দুঃখ পাইনি; আনন্দ পেয়েছি, বেদনা আমাকে স্পর্শ করেনি। আবার এমন মানুষও পাওয়া যাবে না, যে মানুষটি বলতে পারবে, আমি আজীবন শুধু দুঃখ পেয়েছি, সুখ পাইনি; আনন্দ ভাগ্যে জুটেনি। মোটকথা দুনিয়া হলো, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার এক বৈচিত্র্যময় ঠিকানা। এখানে প্রতিটি দুঃখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সুখ। আবার সুখের মাঝেও ঘাপটি মেরে থাকে দুঃখ। শুধু সুখ-আনন্দ কিংবা শুধু দুঃখ-বেদনা দুনিয়া নামক জগতে পাওয়া যাবে না।

প্রকৃত সুখী কে?

আল্লাহ তাআলা এ পদ্ধতিতে দুনিয়া পরিচালনা করার মাঝে কোনো না কোনো হেকমত লুকায়িত রেখেছেন। তিনি একজনকে এক ধরনের নেয়ামত দান

করেন এবং অপরজনকে সেই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন। যেমন একজনকে দিলেন সম্পদের নেয়ামত, এর বিপরীতে অপরজনকে দিলেন সুস্থতার নেয়ামত। সুস্থতার নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিংসা করছে সম্পদের নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়ে। আর সম্পদের নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিংসায় শেষ হয়ে যাচ্ছে সুস্থতার নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকটিকে দেখে। এভাবেই চলছে আজকের দুনিয়া। অথচ এসব তো মূলত: আল্লাহর তাকদীরের ফায়সালা। এরই মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা পরিচালনা করছেন তাঁর এ দুনিয়াটাকে। এর মাঝে তিনি কল্যাণ ও হেকমত সুপ্ত রেখেছেন। আসলে কোনো মানুষই এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবে না যে, দুনিয়ায় প্রকৃত সুখী কে? অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ অনেক টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি ও কল-কারখানার মালিক। পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব ধরনের উপকরণ তার হাতের নাগালে। অপর দিকে আরেকজন মজদুর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দিনের শেষে সামান্য ভাত-ডালের ব্যবস্থা হয়। নুন আনতে তার পান্তা ফুরায়। এ পরিশ্রমী শ্রমিক হয়ত মনে করছে, যার বাড়ি-গাড়ি, চাকর-নওকর, টাকা-পয়সা ও কল-কারখানা আছে, না জানি সে কত সুখী! কিন্তু আসলেই সে কি সুখী? শ্রমিক লোকটি যদি একটু চোখ-কান খোলা রেখে ধনী লোকটির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়, তখনই বেরিয়ে আসবে এক অন্য রকম জীবন, যে জীবনে সুখ ও শান্তি বলতে কিছুই নেই। দেখতে পাবে, যে লোকটির জন্য সুখের সব দরজা খোলা, সে লোকটির জীবনে ঘুম নেই, খানা নেই। ঘুমোতে হলে তাকে ট্যাবলেট খেতে হয়, তবুও ঘুম তার কাছে আসে না। খাবারের টেবিলে রকমারী খাবার সাজানো থাকে; কিন্তু তার জন্য সেগুলো নিষিদ্ধ। এ এক অন্যরকম জীবন। তার জীবনে সবকিছুই আছে, অথচ মূলত কিছুই নেই। নরম বিছানাপত্র আছে; অথচ তার ঘুম নেই। সব ধরনের খাবার আছে, অথচ তার পেট সুস্থ নেই। হাইপ্রেসার, ডায়াবেটিস, আলসারসহ নানা রোগের জালে সে বন্দী। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের নিকট সে এক অসহায় প্রাণী।

অপর দিকে যে শ্রমিকের দিন কাটে ঘামঝরা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, দিনের শেষে যার ভাগ্যে জোটে কোনো রকম চলার মত কয়েকটি টাকা, তার কাছে হয়ত ওই ধনী লোকটির মত এত কিছু নেই। কিন্তু তার আছে নিয়মিত ঘুম ও ক্ষুধার্ত পেটে দেয়ার মত সামান্য খাদ্য। ক্ষুধার্ত পেটে তার কাছে শাক-রুটিও মনে হয় কোরমা-পোলাও। বিছানায় গেলে ঘুমের গভীরে সে সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। আট-দশ ঘন্টা সে অনায়াসে ঘুমোতে পারে। একটু চিন্তা করুন এবং দুই ব্যক্তির মাঝে তুলনা করে দেখুন যে, সুখের মাপকাঠিতে আসলে সুখী কে? প্রকৃতপক্ষে সে সুখী নয় যার কাছে সুখের সমস্ত উপকরণ আছে, বরং সেই সুখী

যার কাছে এসব কিছুই নেই। এটাই হলো, আল্লাহ তাআলার হেকমত। তিনি যাকে চান, তাকেই সুখ দান করেন।

দু'টি স্বতন্ত্র নেয়ামত

একদিন আমার আব্বাজান বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তার মাকাম সুউচ্চ করুন- আমীন' খানার পরে যে দু'আটি পড়া হয়, তার বর্ণনা হাদীস শরীফে এভাবে এসেছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন এবং আমার চেষ্টা ও শক্তি ক্ষয় ব্যতীত আমাকে এটি রিযিক হিসাবে দান করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি আহারের পর এ দু'আটি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সকল সগীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন।

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫২৩)

অতঃপর আব্বাজান বলেন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেছেন। ১. رزقنيه ২. اطعمنى। প্রশ্ন হয়, এ দুটি শব্দ তো সমার্থবোধক, সুতরাং একটি শব্দ উল্লেখ করলেই তো চলতো, তারপরেও ভিন্ন ভিন্ন দু'টি শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন? আব্বাজান নিজেই তার উত্তর দেন। মূলত এখানে উভয় শব্দ এক নয়। উভয় শব্দ এখানে ভিন্ন অর্থবোধক। কেননা, রিযিক দান করা আর খানা খাওয়ানো এক জিনিস নয়। অনেক সময় দেখা যায়, রিযিক তো আমার কাছে আছে। মাছ, গোশত, ফল-ফ্রুট সবকিছুই আমার ঘরে আছে, তাহলে এর অর্থ হলো رزقنيه, তথা আল্লাহ আমাকে রিযিক দান করেছেন। কিন্তু রিযিক খাওয়ার মত অবস্থা আমার নেই। কোনো কারণে এসব কিছু না খাওয়ার জন্য ডাক্তার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং اطعمنى তথা আল্লাহ আমাকে রিযিক দান করেছেন বটে, তবে রিযিক খাওয়াননি। খাওয়ার যোগ্যতা ও হজমশক্তি আল্লাহ আমাকে দান করেননি। এইজন্য উক্ত দু'আতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। খানা খেতে পারা- এর অর্থ হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধারে দুটি নেয়ামত প্রাপ্ত হওয়া। এ হলো আল্লাহর হেকমত।

আল্লাহ তাআলার হেকমত

হিংসার চিকিৎসা হলো, একথা ভাববে যে, আমার হিংসার আগুনে দগ্ধ ব্যক্তিটির মাঝে যেসব নেয়ামতের সমাহার ঘটেছে এবং এর কারণে আমার

অন্তরে যে জ্বলন অনুভূত হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা, এমন অনেক নেয়ামত আছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন, তাকে তো দেননি। যেমন হয়তবা দেহ ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে তুমি উন্নত, সে অনুন্নত। কিংবা অন্য কোনো নেয়ামত তোমার হস্তগত, তার ক্ষেত্রে যা রহিত। সুতরাং নেয়ামতের এ সুষম বন্টনে আল্লাহ তাআলা সূক্ষ্ম কোনো হেকমত আড়ালে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর হেকমতের সঙ্গে তোমার বাড়াবাড়ি মোটেও উচিত নয়। এভাবে ভাবতে থাকবে, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' হিংসা দূরে চলে যাবে।

আল্লাহ তাআলা তোমার মাঝে নেয়ামতটি আমানত রেখেছেন, সে নেয়ামতটির কদর কর। আর যে নেয়ামতটি তিনি তোমাকে দেননি, তা তোমার কল্যাণার্থেই দেননি। হয়ত এ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে তুমি ফেতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়তে, ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবের মুখোমুখী হতে। নেয়ামতের অবমূল্যায়নের কারণে না-জানি আরো কত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার গ্যাড়াকলে পড়তে। সুতরাং মনে করো, নেয়ামতটি তুমি পাওনি, তা তোমার কল্যাণের কারণেই পাওনি। এজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়, যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা নিসা : ৩২)

কেন আকাঙ্ক্ষা করবে না? এজন্য যে, তোমার তো জানা নেই, যে নেয়ামতটির আকাঙ্ক্ষা তুমি করছো, সে নেয়ামতটি তোমার জন্য আসলেই কল্যাণকর কিনা? এমনও তো হতে পারে, সে নেয়ামতটি তোমার হস্তগত হলে হিতে বিপরীত হবে। তখন কল্যাণের বদলে অকল্যাণ, সুখের পরিবর্তে দুঃখ তোমাকে তেড়ে বেড়াবে। অতএব অপরের নেয়ামত দেখে হিংসা করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, তোমাকেও তো আল্লাহ কত নেয়ামত দিয়েছেন, যেগুলো তাকে দেননি। তাছাড়া তার যে কোন নেয়ামত নিয়ে হিংসা করা মানে তো আল্লাহর তাকদীর ও হেকমতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলা। আল্লাহর কোনো কাজ হেকমত শূন্য নয়। সুতরাং তোমার বঞ্চিত হওয়াটাও হেকমতমুক্ত নয়। কাজেই হিংসায় না জ্বলে তোমার বর্তমান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর।

নিজের নেয়ামতসমূহ লক্ষ্য কর

মানুষ নিজের প্রতি লক্ষ্য করার পরিবর্তে অপরের প্রতি চোখ বড় করে তাকায়। নিজের মাঝে কত নেয়ামত লুটোপুটি খাচ্ছে- সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ

না করে অপরের নেয়ামতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয়। নিজের মাঝে যেসব নেয়ামত আছে, সেগুলোর জন্য শুকরিয়া নেই, কৃতজ্ঞতা নেই– অথচ অপরের কোনো গুণ দেখে চোখ রগড়ে লাল করে ফেলে। অনুরূপভাবে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি নেই, অথচ অপরের দোষ দেখলে হররা করে উঠে। অন্যের দোষ কিভাবে পাওয়া যায় এবং তাকে অসহায় করে তোলা যায়– এরূপ চেতনায় আমরা সর্বদা মত্ত। যার অনিবার্য ফল হিসেবে সর্বত্র ফাসাদের ঘনঘটা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। যতসব ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে নিজের প্রতি আঙুল না তুলে অপরের প্রতি আঙ্গুল তোলার কারণেই। এরপরও আল্লাহ তাআলা নেয়ামতের ঝরনাধারায় আমাদেরকে সিক্ত করছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নেয়ামতের প্রশান্তিদায়ক ছোঁয়ায় আমরা দীপ্ত হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে অপরেরটা দেখার পূর্বে যদি নিজেরটা দেখি এবং সাথে আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কথা মাথায় রাখি, তাহলে মনের মধ্যে আর হিংসা বাসা বাঁধতে পারবে না। অপরের নেয়ামত দেখে পিত্ত জ্বলে উঠবে না।

সর্বদা নিচের দিকে তাকাও

সমাজের বর্তমান অবস্থা হলো, অপরের বিষয়-আশয়ের প্রতি সকলের ব্যাপক উৎসাহ। যেমন অমুক এত টাকার মালিক কিভাবে হলো? অমুকের বাড়িটি দেখতে খুবই মনোরম– এটা কিভাবে বানালো? অমুকের এত সুন্দর গাড়ি কোত্থেকে এলো? অমুকের আয়েশী জীবন কিভাবে কাটছে? এ ধরনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা এবং খুটিয়ে খুটিয়ে বের করা বর্তমানে আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ বদ-অভ্যাসের একটা সংক্রামক শক্তি আছে। আর সেটাই হলো হিংসা। কারণ, অন্যের জিনিস নিজের চোখে যখন মনোরম হয়ে দেখা দিবে– তখনই লোভ ও হিংসা সৃষ্টি হবে। এটাই স্বাভাবিক। এজন্যই আমি একটা কথা বারবার বলে থাকি, আজও বলছি। কথাটি হলো– 'দুনিয়াবী বিষয়ে সব সময়ে তোমার চেয়ে নিচু ব্যক্তি ও নিম্ন অবস্থানের প্রতি তাকাবে। আর দ্বীনী বিষয়ে সব সময় তোমার চেয়ে উঁচু ব্যক্তি ও উঁচু অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও প্রশান্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধনীদের সঙ্গে চলাফেরা করেছি। সে সময়ে আমার চেয়ে বেশি চিন্তাগ্রস্থ মানুষ খুব কম লোককেই দেখেছি। কেননা, সে সময় যার প্রতি তাকাতাম, অনুভব করতাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-সওয়ারী আমার চেয়ে উন্নত। ফলে তার মতো হওয়ার একটা তীব্র নেশা আমাকে পেয়ে বসতো এবং হৃদয়ে এক অব্যক্ত বেদনা ছেয়ে যেতো। তারপর আমি জীবনের মোড় পাল্টে ফেললাম। নিজের চেয়ে স্বল্পাধিকারী লোকজনের সঙ্গে উঠাবসা শুরু করলাম। এর ফলে তৃপ্তি বোধে প্রীত হলাম। কেননা, এ ভিন্ন পরিবেশে এসে যাকেই দেখতাম, মনে হতো– আমি তার চেয়ে সুখী। আমি সুবেশধারী, আমার রয়েছে সুন্দর চমৎকার সওয়ারী– এ ভাবনায় পুলক অনুভব করা শুরু করি। এভাবে আমার মাঝে চলে আসে এক আন্তরিক প্রশান্তি।

চাহিদার শেষ নেই

পার্থিব উপকরণ ও তার চাহিদার আখেরী মঞ্জিল বলতে কিছু নেই। কবি চমৎকার বলেছেন–

کار دنیا کسے تمام نہ کرد
دنیا کا معاملہ کبھی پورا نہیں ہوتا

'দুনিয়ার কর্মশালা কাউকে পূর্ণতা দিতে পারেনি, পার্থিব বিষয়-আশয় কখনও পূর্ণতা লাভ করেনি।'

জগতের সর্বোচ্চ ধনী লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করুন, তোমার সকল আশা পূর্ণ হয়েছে কি? উত্তরে সে বলবে, না, পূর্ণ হয়নি। আরো অনেক কিছু বাকি আছে। তাই তো আরবী ভাষার সুপণ্ডিত কবি বড় প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি করেছেন–

وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهٗ + وَلَا انْتَهٰى اَرَبٌ اِلَّا اِلٰى اَرَبِ

অর্থাৎ– এ দুনিয়া দ্বারা আজ পর্যন্ত কেউ তার উদরপূর্তি করতে পারেনি। একটি আশা পূর্ণ হয়েছে তো আরেকটি কামনা জেগে উঠেছে। প্রতিটি আশার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নতুন কামনার বীজ। প্রতিটি প্রয়োজনের নিচে চাপা পড়ে থাকে আরেকটি প্রয়োজনের অনুভব।

এটা আল্লাহ তাআলার বণ্টন

হিংসা কত করবে? অন্যের নেয়ামত দেখে তোমার হৃদয় কোন পর্যন্ত ইতিউতি করবে? হিংসার আগুনে নিজেকে কোন পর্যন্ত জ্বালাবে? কেননা, যেটায় তোমার হিংসা হবে, সেটা যদি অর্জন হয়েও যায়, দেখতে পাবে তোমার সেই অর্জিত সম্পদ ও নেয়ামত থেকে অন্য আরেকজনেরটা আরো বেশি অগ্রসর।

অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হবে এটাই যে, সে ভাববে- এই বন্টন তোমার নয়; বরং আল্লাহর। তিনি এর মধ্যে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর রহস্য উদঘাটনের শক্তি তোমার নেই। তোমার বুদ্ধি সীমিত, জ্ঞান পরিমিত। অপর দিকে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অসীম। তিনি যে ফয়সালা করেন, সেটাই সঠিক। তিনিই অধিক জানেন যে, কার জন্য কোন জিনিস কল্যাণকর হবে। এভাবে এবং এ পন্থায় ভাবতে থাক, তাহলে এ আলোকিত ভাবনা তোমার হিংসাকে ছাঁই করে দিবে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে হিংসা বিদায় নিতে থাকবে।

হিংসার দ্বিতীয় চিকিৎসা

হিংসার আরেকটি চমৎকার চিকিৎসা আছে। তাহলো হিংসুক এ কথা কল্পনা করবে যে, আমি চাই অমুক ব্যক্তি থেকে আল্লাহর নেয়ামত ছিন্ন হয়ে যাক। অথচ আমার এ চাওয়ার কারণে উল্টো আমার ক্ষতি হচ্ছে। যাকে হিংসা করছি, তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, বরং সে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হচ্ছে। আমার খাতায় শুধু লোকসান, অথচ তার খাতায় শুধু লাভ যোগ হচ্ছে। তা এভাবে যে, দুনিয়াতে সে আমার হিংসার শিকার। কাজেই দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম মতে আমি তার দুশমন। আর সকলেই সাধারণত দুশমনের দুঃখ-কষ্ট দেখে পুলকিত হয়। আমি তাকে নিয়ে হিংসার আগুনে জ্বলছি, এতে আমার কষ্ট হচ্ছে, এর অর্থ হলো সে আনন্দ পাচ্ছে। এতে তো তারই ফায়দা হচ্ছে; আমার ক্ষতি হচ্ছে। দুনিয়াতে সে এ ফায়দা পাচ্ছে; আমি এ কষ্ট পাচ্ছি। আর আখিরাতেও তার জন্য ফায়দা অপেক্ষা করছে। কেননা, আমার হিংসা যত বাড়ছে, তত তার নেকি ভারী হচ্ছে। সে আমার পক্ষ থেকে মজলুম বিধায় আখেরাতে তার সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিংসার নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য হলো, গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরিসহ বিভিন্ন অনৈতিক উপসর্গ তৈরি হওয়া। সুতরাং এগুলো আমার মাঝেও তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আমার নেকীগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আমলনামায় যোগ হয়ে যাচ্ছে। অতএব ফল দাড়ালো, আমার হিংসার তীব্রতা যত বাড়ছে, তত নেকীও ক্ষয় হচ্ছে। আমার নেকীগুলো প্যাকেট হয়ে তার আমলনামায় চলে যাচ্ছে। তাহলে আমার কি ফায়দা হচ্ছে? নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ হিংসার পোল দিয়ে তার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। অথচ তাকে শত্রু মনে করছি। কাজেই হিংসা মানে হিংসুকের শুধুই ক্ষতি, আর যে ব্যক্তি হিংসার শিকার হয়, তার ফায়দা আর ফায়দা। প্রত্যেক হিংসুকের জন্য এটা চিন্তার বিষয়। হিংসা করুন, তবে তার পূর্বে এ চিন্তা করুন।

এক বুযুর্গের ঘটনা

একবার এক বুযুর্গকে সংবাদ দেয়া হলো, হযরত! অমুক আপনার সমালোচনা করে। বুযুর্গ এটা শোনার পরও নিরুত্তর রইলেন। তারপর মজলিস শেষে নিজের ঘরে গেলেন এবং সুন্দর করে একটি হাদিয়ার প্যাকেট তৈরি করে সমালোচকের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত! আপনি এ কী করলেন? সে তো আপনার শত্রু, দিন-রাত আপনার মন্দালোচনা করে বেড়ায়। বুযুর্গ উত্তর দিলেন, না; সে আমার শত্রু নয়-পরম বন্ধু। কারণ, সে তো দিন-রাত তার কষ্টার্জিত নেকীগুলো আমার আমলনামায় পাঠায়। এমন উপকারী বন্ধুকে আমি হাদিয়া দিবো না তো কাকে দিবো? জানা নেই, আখিরাতে তার এই উপকারের প্রতিদান দিতে পারবো কি না। তাই দুনিয়াতেই তার প্রতিদান দিয়ে দিলাম।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ঘটনা

এটা সর্বজন প্রসিদ্ধ কথা যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মজলিসে কেউ কোনো গীবত করতে পারতো না। কেননা তিনি নিজে গীবত করতেন না এবং কারো গীবতও শুনতেন না। তাই তার মজলিসে কেউ গীবত করারই সাহস পেতো না। একদিনের ঘটনা, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজের ছাত্রদেরকে গীবত ও হিংসার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে নসীহত করছেন এবং তাদেরকে সহজবোধ্যভাবে বোঝানোর জন্য হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি কথা বললেন। তিনি বলেন, গীবতের অশুভ দিক হলো, গীবত করার কারণে গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকী স্থানান্তরিত ওই ব্যক্তির আমলনামায় চলে যায়, যার গীবত করা হয়। এজন্য আমি গীবত করি না। কখনও যদি আমার ইচ্ছা জাগে যে, গীবত করবো, তাহলে নিজের মাতা-পিতার গীবত করবো। এতে ফায়দা হবে, আমার নেক আমল অন্য কারো আমলনামায় যাবে না; বরং নিজ মাতা-পিতার আমলনামায় যাবে। তখন ঘরের জিনিস ঘরেই থাকবে, অন্যের ঘরে যাবে না।

অর্থাৎ- তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সমালোচক ও হিংসুক অন্যের অনিষ্ট করতে চায়, এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজেরই ক্ষতি হয় এবং যার ক্ষতি করতে চায় তার ফায়দা হয়। অতএব নিজের নাক কেটে অপরের সফর ভণ্ডুল করতে চাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?

আরেকটি ঘটনা

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব। উভয়ের দরবারেই দরস বসতো। একদিন হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে

আপনি কেমন ধারণা পোষণ করেন। তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আবু হানীফা তো বড় কৃপণ লোক। লোকটি বললো, আমরা তো শুনেছি, তিনি খুব দানশীল। সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, তিনি এত বড় বখিল যে, নিজের নেক আমল কাউকে দিতে চান না, অথচ অন্যের নেক আমল নিজে নিয়ে নেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ তার সম্পর্কে সমালোচনা করে, যার ফলে সমালোচকের নেক আমল তাঁর আমলনামায় চলে যায়। অন্য দিকে তিনি সমালোচনা করেন না এবং সমালোচনা শুনেনও না। এজন্যই বলছি, তিনি পার্থিব দৃষ্টিকোণে খুব দানশীল হলেও আখেরাতের দৃষ্টিকোণে নিতান্তই কৃপণ।

প্রকৃত দরিদ্র কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো, দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, যার হাতে টাকা-পয়সা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না। মূলত: দরিদ্র সে নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে অসংখ্য নেক আমলসহ বিদায় নিবে। নামায-রোযা, দান-সদকা, যিকির-তাসবীহ সহ হাজারো নেক আমল তার আমলনামায় মওজুদ থাকবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন হিসাব শুরু হবে, তার আমলনামার পাশে মানুষের ভিড় জমে যাবে। কেউ দাবি করবে, আমি এ ব্যক্তির নিকট হক পাই, যেহেতু সে দুনিয়াতে আমার হক নষ্ট করেছে। কেউ বলবে, এ ব্যক্তি আমার গীবত করেছে। আরেকজন বলে উঠবে, এ ব্যক্তি আমাকে হিংসা করেছে। অপরজন দাবি জানাবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে অনধিকার চর্চা করেছে। এভাবে একেকজন একেকভাবে তার কাছে অধিকার দাবি করবে। আখিরাতের জীবনে তো টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি থাকবে না, যেগুলো দ্বারা হকদারের হক পূর্ণ করা হবে। আখিরাতের টাকা-পয়সার নাম– নেক আমল। সুতরাং প্রত্যেকে নিজস্ব হক বাবদ এ ব্যক্তির নেক আমলগুলো নিয়ে যাবে। একজন নামায নিয়ে যাবে, অপরজন রোযা নিয়ে যাবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে যাবে এবং সে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে। তবুও দাবিদার রয়ে যাবে, তখন বলা হবে, হকদারের আমলনামার গুনাহ নিয়ে এর আমলনামায় দিয়ে দাও। বিভিন্ন হকের পরিবর্তে বিভিন্ন গুনাহ তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে। অবশেষে তার নেকপূর্ণ আমলনামা গুনাহপূর্ণ আমলনামায় পরিণত হবে। নেকের স্তূপ রূপান্তরিত হবে গুনাহর বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই সবচে' বড় দরিদ্র। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৩)

অপর দিকে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আয়নার মত স্বচ্ছ অন্তর দান করেছেন, যে অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, শেকায়েত বলতে কিছু নেই। তাদের আমলনামা নফল নামায, যিকির-আযকার, তাহাজ্জুদ ও বেলায়ত দ্বারা পূর্ণ না হলেও সে 'ইনশাআল্লাহ' কঠিন আযাব থেকে পার পেয়ে যাবে। স্বচ্ছ অন্তর, পবিত্র চিন্তা, হিংসা-বিদ্বেষ ও সমূহ ব্যাধিমুক্ত হৃদয়ের মূল্য আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির মর্যাদা আখিরাতে কমান না; বরং বাড়ান।

জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা.) সুসংবাদ দিলেন, যে ব্যক্তি এখন এদিক থেকে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতী। একথা শুনে আমরা সকলেই চকিত হলাম, পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি সে দিকটা থেকে মসজিদে প্রবেশ করছে, অযুর পানি এখনও মুখমণ্ডল থেকে টপকে পড়ছে এবং তার বাম হাতে রয়েছে এক জোড়া জুতো। আমরা লোকটিকে দেখে খুব ঈর্ষান্বিত হলাম, ভাবলাম– লোকটি জান্নাতে যাবে!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, যখন মজলিস শেষ হলো, আমার ইচ্ছা জাগলো, লোকটির জীবনাচার আমি কাছ থেকে দেখবো– তাঁর মাঝে এমন কি গুণ বা আমল আছে, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ির দিকে চলা শুরু করলাম। পথিমধ্যে তাঁকে বললাম, আমি দু'-তিনটি দিন আপনার বাড়িতে কাটাতে চাই। তিনি অনুমতি দিলে আমিও তাঁর বাড়িতে রয়ে গেলাম।

রাত যখন গভীর হলো, সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। তার রাতের আমল দেখার জন্য সারা রাত চোখ-কান খোলা রাখলাম। এভাবে আমার বিনিদ্র রজনী কেটে গেলো, অথচ তাঁকে সুখের নিদ্রায় কাটাতে দেখলাম। এমনকি তাহাজ্জুদের জন্যও তিনি উঠেননি। ফজরের সময় তিনি উঠলেন এবং মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেন। তারপর দিনের বেলা তার পিছু লেগে থাকলাম। পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, দিনের বেলায় তিনি বিশেষ কোনো আমল যেমন নফল, যিকির-আযকার, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি করেন কিনা। দেখলাম, এসব কিছুই তিনি করলেন না। শুধু আযান দিলে মসজিদে আসেন এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করেন। এভাবে আমার দু'-তিন দিন কেটে গেলো। আমার চোখে তাঁর বিশেষ কোনো আমল নজরে পড়লো না।

১. হিংসার অশুভ দিকগুলো কল্পনা করবে।

২. যার জন্য হিংসা হয়, তার কল্যাণের জন্য দুআ করবে।

৩. নিজের হিংসা যেন দূর হয়, এই দুআও করবে।

এ তিনটি কাজ করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' হিংসা দূর হয়ে যাবে। এরপরেও যদি হিংসা থাকে, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন।

যেসব গুনাহ হুকুকুল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত, সেগুলো সহজে মুক্ত করা যায়। তাওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে সেগুলো ক্ষমাযোগ্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেসব গুনাহ হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। শুধু তাওবা ও ইসতিগফার দ্বারা সেগুলো মাফ হয় না। বরং যার হক নষ্ট করা হয়েছে, তার হক আদায় করতে হয় অথবা তার কাছেও মাফ চাইতে হয়। যদি হক আদায় হয় অথবা সে মাফ করে দেয়, তখন গিয়ে গুনাহটি মাফযোগ্য হয়।

হিংসার বিষয়টি যদি গীবত, অপতৎপরতা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের পর্যায়ে চলে যায়, তখন এটা বান্দার হকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাও মাফ করবেন না। অপর দিকে হিংসা যদি শুধু অন্তরেই থাকে; কাজে-কর্মে ও কথা-বার্তায় যদি তার প্রকাশ ও বিকাশ না ঘটে, তখন এ ধরনের হিংসা আল্লাহর হকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং অন্তরে হিংসা মাথা তুললে ভাববে, বিষয়টি এখনও আমার আয়ত্তে আছে। সহজে এর সমাধান করা যাবে। এর ক্ষমা পাওয়ারও আশা করা যাবে। তবে এর থেকে যদি সামান্যও অগ্রসর হয়, তখনই বুঝে নিতে হবে, বিষয়টি হাতছাড়া হয়ে গেছে। আল্লাহর হক অতিক্রম করে বান্দার হকের মহলে ঢুকে পড়েছে। অতএব ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিক ঈর্ষাও ভালো নয়

অন্যের নেয়ামত দেখে তা নিজের জন্য কামনা করার নাম 'গিবতা'। এটাকে ঈর্ষাও বলা হয়। এটা যদিও গুনাহ নয়, তবে বেশি করাও ভালো নয়। কারণ, অত্যাধিক ঈর্ষা হিংসার আগুনে ঠেলে দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে লোভও সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বীনী বিষয়ে ঈর্ষা করা ভালো

তবে দ্বীনী বিষয়ে ঈর্ষা করা অন্যায় নয়; বরং প্রশংসাযোগ্য। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الاغتباط فى العلم والحكمة، حديث نمبر ٧٣)

অর্থাৎ, মূলত দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষাযোগ্য হতে পারে। প্রথমত. ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদকে আখিরাতের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন, নিজের ইলমকে তিনি মানুষের কল্যাণার্থে কাজে লাগিয়েছেন। ওয়াজ-নসীহত ও লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের কথা মানুষের কর্ণ-কুহরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। অতএব দ্বীনী বিষয়ে ঈর্ষা করা যাবে। এটা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসাযোগ্য।

পার্থিব বিষয়ে ঈর্ষা করা ভালো নয়

পক্ষান্তরে কারো সম্মান-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পত্তি ও খ্যাতি-প্রসিদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া ভালো নয়। কেননা এর মাধ্যমে চোরাপথে লোভ ও হিংসা সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই ঈর্ষার আতিশয্যও মূলত: কাম্য নয়। ঈর্ষা আসলে ভাববে, আল্লাহ তাআলা আমাকেও তো অনেক দিয়েছেন। যে নেয়ামত আমাকে দেননি, সেটা আমার কল্যাণার্থেই দেননি। হয়ত নেয়ামতটি পেলে আমি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে যেতাম কিংবা নাফরমান বান্দায় পরিণত হতাম।

এ পর্যন্ত হিংসা সম্পর্কে আপনাদের নিকট সামান্য কিছু উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ তাআলা এর হাকীকত বুঝবার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

পুনশ্চ আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তাহলো আসলে আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট যেতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে চিকিৎসক যদি জ্বরের কারণ ও উপসর্গসমূহ ভালোভাবে ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেন, তারপর যদি সে জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহলে তাকেও চিকিৎসকের নিকট ধর্ণা দিতে হয়। চিকিৎসকের পূর্ব ব্যাখ্যার আলোকে নিজের চিকিৎসা নিজে করে না। কারণ, সে জানে জ্বরের উপসর্গ সব সময় এক হয় না।

অনুরূপভাবে আত্মার রোগের কারণ, উপসর্গ ও চিকিৎসা সম্পর্কে শুধু ব্যাখ্যা ও ওয়াজ-নসীহত শুনলেই হয় না; বরং আক্রান্ত হলে আত্মার চিকিৎসকের নিকট

যেতে হবে। তাঁর নিকট নিজের ব্যাধির বর্ণনা দিতে হবে। অহংকার, হিংসা, রিয়া না অন্য কিছু– এটা আপনার চেয়ে আত্মার দক্ষ চিকিৎসকই ভালো বলতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিজেকে সুস্থ মনে করে অথবা সুস্থ ব্যক্তি নিজেকে ব্যাধিগ্রস্ত মনে করে কিংবা নিজে নিজে এক রকম চিকিৎসা শুরু করে দেয়, অথচ তার চিকিৎসা এভাবে নয়। তাই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক চিকিৎসার জন্য শায়খের নিকট নিজের অবস্থা জানাতে হবে এবং শায়খের ব্যবস্থাপত্র মতে চিকিৎসা নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

“ভালোভাবে বুঝে নিন, মানুষের স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি স্বপ্ন নয়, কাশফও নয়। বরং প্রকৃত মাপকাঠি হলো, জাগ্রত অবস্থার জীবন সঠিকভাবে যাপন করছে কিনা? গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে কিনা? বাস্তব জীবনে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)–এর আনুগত্য করছে কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ‘না’ হয়, তাহলে সে হাজার বার স্বপ্ন দেখলেও কিংবা হাজারও কাশফ ও কারামত তার থেকে প্রকাশ পেলেও সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না।”

স্বপ্নের তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوْا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ"

(صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب المبشرات، حديث نمبر ٦٩٩٠)

হামদ ও সালাতের পর!

হাদীস শরীফে এসেছে–

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। মুবাশশিরাত ছাড়া নবুওয়াতের কোনো অংশ অবশিষ্ট নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুবাশশিরাত' কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, সত্য স্বপ্ন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম এবং নবুওয়াতের একটি অংশ। অপর হাদীসে এসেছে এটি নবুওয়াতের ৪৬ তম অংশ।

সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের একটি অংশ

এর অর্থ হলো, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রথম ছয় মাস যে ওহী এসেছিল, তা ছিল স্বপ্ন আকারে। সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংবাদ জানতেন। হাদীস শরীফে এসেছে, ওই ছয়

মাস রাসূলুল্লাহ (সা.) যা স্বপ্ন দেখতেন, হুবহু তা-ই সত্যে পরিণত হতো। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে ঘুমের স্বপ্ন জাগরণে বাস্তব হয়ে প্রতিভাত হতো। সত্য স্বপ্নের এ ছয় মাস শেষ হওয়ার পর ওহীর ধারাবাহিকতা শুরু হয়। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর রাসূল (সা.) তেইশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তেইশকে দুই দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় ছেচল্লিশ। তন্মধ্যে প্রথম ছয় মাস তো সত্য স্বপ্নের অধ্যায় ছিলো। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বছর ছয় মাস জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ তম অংশ। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নবুওয়াতের অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ অংশ– যা জিবরাঈল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় আগমন করতো তার ধারাবাহিকতা আমার পর থাকবে না। কেননা, আমি আখেরী নবী আমার পর আর কোনো নবী আসবেন না। তবে মুমিনের সত্য স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যে সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ তম অংশ। এ সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে বিভিন্ন সংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হবে।

অপর এক হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুসলমানদের অধিকাংশ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহান নেয়ামত। এর মাধ্যমে মানুষ সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়। অতএব স্বপ্নের মাধ্যমে প্রীতিকর কোনো সংবাদ পেলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

স্বপ্ন সম্পর্কে দু'টি রায়

স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে দু' ধরনের রায় দেখা যায়। কট্টর কিংবা শিথিল। কেউ কেউ এত কট্টর যে, সত্য স্বপ্নকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তারা বলে, স্বপ্ন বলতে কিছু নেই। স্বপ্নের ব্যাখ্যা, সে তো অনেক দূরের কথা। স্বপ্নই তারা মানে না, স্বপ্নের ব্যাখ্যা মানবে কী করে! কট্টরপন্থীদের এ জাতীয় অভিমত সম্পূর্ণ ভুল। উল্লিখিত হাদীসের আলোকে এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের অস্তিত্ব নিশ্চিত আছে। যারা এর বিপরীত মত পেশ করবে, তাদের মত মোটেই সঠিক নয়।

অপর দিকে কিছু লোক আছে যারা সব সময় স্বপ্নের পেছনে লেগে থাকে। তারা মনে করে, স্বপ্নই মুক্তি। স্বপ্নের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যাবে, ফযীলত পাওয়া যাবে। কেউ কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে তার উপর অন্ধ বিশ্বাস করে বসে। তার ব্যাপারে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে নিজেকে বুযুর্গ মনে করে বসে।

এতো গেলো স্বপ্নের কথা। স্বপ্ন দেখা দেয় ঘুমের মাঝে। অনেক সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্নের মত দেখতে পারে। যাকে বলা হয় কাশফ। কারো যদি 'কাশফ' হয়, তখনই মানুষ ধারণা করে বসে, অমুক তো বহু বড় বুযুর্গ! বাস্তব জীবনে সে সুন্নাতের খেলাফ চললেও মানুষ তাকে মহান ওলী ভেবে বসে।

ভালো করে বুঝে নিন, মানুষের স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি স্বপ্ন নয়, কাশফও নয়। বরং প্রকৃত মাপকাঠি হলো, জাগ্রত অবস্থার জীবন সুন্নাত মোতাবেক যাপন করছে কি না এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে কি না? বাস্তব জীবনে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করছে কি না? যদি এসব প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর আসে, তাহলে সে হাজারবার ভালো স্বপ্ন দেখলেও কিংবা হাজারো কাশফ ও কারামত তার থেকে প্রকাশ পেলেও সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

বর্তমানে এ ব্যাপারে ব্যাপক ভ্রষ্টতা চলছে। পীর-মুরিদীর সঙ্গে কাশফ, কারামত ও স্বপ্নকে অনিবার্য করে নিয়েছে। অথচ এসব কিছুর সঙ্গে পীর-মুরিদীর কোনো সম্পর্ক নেই।

স্বপ্নের তাৎপর্য

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) ছিলেন উঁচু মানের একজন তাবিঈ। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি ইমাম পর্যায়ের। গোটা মুসলিম উম্মাহর এ বিষয়ে এত পারদর্শী ব্যক্তিত্ব সম্ভবত আর কেউ জন্ম নিবে না। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিলো বিস্ময়কর ও বাস্তবসম্মত। স্বপ্ন বিষয়ে তাঁর থেকে সুন্দর ও বিরল ঘটনাবলী প্রসিদ্ধ। তিনি এ বিষয়ে ছোট্ট একটি বাক্য বলেছেন। চমৎকার ও স্মরণ রাখার মত বাক্য। যে বাক্যটি স্বপ্নের তাৎপর্য উদঘাটনে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন–

اَلرُّؤْيَا تَسُرُّ وَلَا تَغُرُّ

অর্থাৎ– স্বপ্ন দ্বারা মানুষ আনন্দ লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু স্বপ্ন যেন ধোঁকা না দিতে পারে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল হয়ে যে আমল থেকে গাফেল হয়ে না যায়।

হযরত থানভী (রহ.) এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট অনেকেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেন। তিনি উত্তর দেয়ার পূর্বে সাধারণত নিম্নের কবিতাটি পড়তেন–

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
من غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

অর্থাৎ– আমি রজনী নই, রজনীপূজারীও নই যে, স্বপ্নের কথা বলবো। আল্লাহ তাআলা সূর্যের সঙ্গে তথা রিসালাতের সূর্যের সঙ্গে নিসবত রাখার তাওফীক দিয়েছেন বিধায় তাঁরই কথা বর্ণনা করি।

উদ্দেশ্য হলো, স্বপ্ন সুন্দর হলে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। যেহেতু স্বপ্ন মানে মুবাশশিরাত, তাই স্বপ্নের বরকত আল্লাহর নিকট কামনা করা উচিত। স্বপ্নের ভিত্তিতে বুযুর্গীর ফায়সালা করা যায় না।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) এবং মুবাশশিরাত

কিছু কিছু লোক আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) সম্পর্কে চমৎকার স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন একজন রাসূলুল্লাহ (সা.)কে আব্বাজানের আকৃতিতে দেখেছেন। এ ধরনের আরো কিছু সুন্দর স্বপ্ন আব্বাজান সম্পর্কে তারা দেখেছেন। যারা এসব স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরা অনেকেই আব্বাজানকে অবহিত করেছেন। তিনি সেগুলো একটি খাতায় সংরক্ষিত করে রেখেছেন। খাতাটির শিরোনাম ছিলো– মুবাশশিরাত তথা সুসংবাদ জাগানিয়া স্বপ্ন। তবে খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় যে কথাগুলো লিখেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দিয়ে লিখেন–

"এই খাতায় ওই সকল স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলো আল্লাহর নেক বান্দাগণ আমার সম্পর্কে দেখেছেন। এগুলো নিছক মুবাশশিরাত ও নেক লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ এসব স্বপ্নের বরকতে আমাকে সংশোধন করে দিন। তবে আমি সকল পাঠককে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, ভালো স্বপ্ন কখনও মর্যাদার মানদণ্ড হতে পারে না। এসব স্বপ্নের ভিত্তিতে আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। জাগ্রত অবস্থায় কাজকর্ম, কথাবার্তাই হলো মূল মাপকাঠি। তাই এসব স্বপ্নের কারণে কেউ আমার ব্যাপারে ধোঁকায় লিপ্ত হবেন না।"

শয়তান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ. لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ (صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দেখলো, সে যেন বাস্তবেই আমাকে দেখলো। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

স্বপ্নে নবীজী (সা.)-এর যিয়ারত নসীব হওয়ার সৌভাগ্য কয়জনের আছে। এটা নিশ্চয় মহা সৌভাগ্যের বিষয়। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে ধরনের গঠন ও আকৃতি বিভিন্ন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি সেই গঠন-আকৃতিতে তাঁকে দেখে, তাহলে বাস্তবেই সে সৌভাগ্যবান। কেননা, রাসূল (সা.)-এর গঠন ও চেহারা শয়তান ধারণ করতে পারে না। সুতরাং সে বাস্তবেই রাসূল (সা.)কে মূল অবয়বেই দেখেছে।

প্রিয়নবী (সা.)-এর যিয়ারত এক মহা সৌভাগ্যের বিষয়

'আলহামদুলিল্লাহ' আল্লাহর রহমতে প্রিয় নবী (সা.)-এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অনেকের নসীব হয়েছে। এটি এমন এক সৌভাগ্যের বিষয়, যার কোনো তুলনায় হয় না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গদের আগ্রহ বৈচিত্রময়। কোনো কোনো বুযুর্গ এ সৌভাগ্য অর্জনের বিভিন্নভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন বিশেষ আমলের কথাও লিখেছেন। যেমন জুমআর রাতে অমুক দরূদ এত বার পড়ে শোবে এবং তারপর এই আমল করবে, তাহলে নবীজী (সা.)-এর যিয়ারত নসীব হবে। এভাবে বিভিন্ন বুযুর্গ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন আমলের কথা লিখেছেন। যেগুলোর উপর আমল করে অনেকে সফলও হয়েছেন। স্বপ্নে তাঁরা নবীজী (সা.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন।

যিয়ারতের যোগ্যতা কোথায়?

পক্ষান্তরে কিছু বুযুর্গ আছেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাত লাভের জন্য খুব ব্যাকুলতা দেখাতেন না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, নবীজী (সা.)-এর যিয়ারত লাভের মত যোগ্যতা আমার কোথায়? তাই তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ চেপে রাখতেন। যেমন মুফতী শফী (রহ.)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করতেন। একদিন তিনি এসেই বললেন, হযরত! আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলুন, যার বরকতে প্রিয় নবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। মুফতী সাহেব বললেন, ভাই! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! নবীজী (সা.)-এর যিয়ারতের তামান্না তুমি করছো! এই কামনা করার মত দুঃসাহস তো আমার নেই। কেননা, নবীজী (সা.)কে দেখার মত যোগ্যতা আমার কোথায়?

কোথায় আমরা আর কোথায় তাঁর যিয়ারত? এত বড় সাহস তো আমি করতে পারিনি, বিধায় এ ধরনের আমল শেখার চিন্তাও আসেনি। যদি যিয়ারত নসীব হয়, তাহলে আমরা তাঁর আদব, হক, মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো কি? হাঁ, আল্লাহ যদি দয়া করেন এবং প্রিয় নবী (সা.) যিয়ারত নসীব করেন– সেটা ভিন্ন কথা। তখন সেটা হবে এক মহান পুরস্কার। পুরস্কার যখন দিবেন, পুরস্কারের যোগ্যতাও তিনি দিবেন। তবে নিজে স্বয়ং এ হিম্মত করতে পারি না। প্রত্যেক মুমিনের একান্ত তামান্না থাকে, প্রিয় নবী (সা.)কে স্বপ্নে হলেও দেখার। সেই তামান্না অবশ্য আমারও আছে। তবে এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করার মত স্পর্ধা আমার নেই।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) এবং পবিত্র রওজার যিয়ারত

মুফতী শফী সাহেব (রহ.) যখন রওজা শরীফের যিয়ারতে যেতেন, তখন কখনও রওজা শরীফের জালি পর্যন্ত যেতে পারতেন না। সব সময় দেখা যেতো, জালির সম্মুখে একটি খাম আছে, সেটার সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সরাসরি জালির সামনে তিনি যেতেন না। কেউ যদি জালির সামনে যেতো, তখন মাঝে মাঝে তিনিও তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি নিজেই বলেন, একবার আমার কাছে মনে হলো, আমি কঠিনহৃদয়ের মানুষ। আল্লাহর বান্দারা আবেগাপ্লুত হয়, জালির একেবারে সামনে চলে যায় এবং যে যত নিকটবর্তী হয়ে রাসূল (সা.)-এর বরকত লাভ করতে তার চেষ্টা করে, অথচ আমার কদম উঠে না। তাই মনে হলো, আমি সত্যি সত্যি শক্ত দিলের মানুষ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, যেন আমি রওজা শরীফের দিক থেকে আওয়াজ পাচ্ছি–

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতসমূহের উপর আমল করবে, হাজার মাইল দূরে তার অবস্থান হলেও সে আমার কাছেই। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতসমূহের ব্যাপারে অবহেলা দেখাবে, আমার রওজার জালিতে সেঁটে থাকলেও সে আমার থেকে দূরে এবং বহু দূরে।"

জাগ্রত অবস্থার আমলই হলো মূল মাপকাঠি

রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ হলো মূল সম্পদ। জাগ্রত অবস্থায় সুন্নাতগুলোর উপর আমল করতে পারাটাই হলো আসল নেয়ামত। এ নেয়ামতের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নৈকট্য লাভ করা যাবে। এ দৌলতের মাধ্যমেই আল্লাহকে রাজি-খুশি করা যাবে। সুন্নাতের উপর আমল না করে রওজা শরীফের জালি আঁকড়ে ধরা এবং নবীজী (সা.)-এর নৈকট্য কামনা আমার দৃষ্টিতে দুঃসাহসিকতা বৈ কিছু নয়।

তাই দিন-রাতের কার্যক্রমে সুন্নাতের অনুসরণই কাম্য। জীবনের প্রতিটি হলে সুন্নাতের অনুসরণ হবে তোমার একমাত্র লক্ষ্য। স্বপ্ন আর কাশফ কাউকে মুক্তি দিতে পারবে না। কেননা, স্বপ্ন দেখলে কিংবা কাশফের প্রকাশ ঘটলে সাওয়াব পাওয়া যায় না। স্বপ্ন ও কাশফ অনৈচ্ছিক ব্যাপার বিধায় এগুলোর উপর ভিত্তি করে কাউকে বুযুর্গ নির্ধারণ করা যায় না।

সুন্দর স্বপ্ন দেখে ধোঁকায় পড়ো না

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, জান্নাতে প্রবেশ করেছে, জান্নাতের বাগানগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সুরম্য অট্টালিকাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে, তাহলে এটা একটা উত্তম আভাস। তাই বলে যে তার আবাসস্থল জান্নাত হয়ে গেছে– এ ধারণা করা বোকামী। এ স্বপ্নের কারণে ইবাদত ও আমল ছেড়ে দেয়া সম্পূর্ণ পাগলামী। বরং সুন্দর স্বপ্ন দেখার জন্য ইবাদতে আরো অধিক মনোযোগী হতে হবে। সুন্নাতের অনুসরণে তখন আরো বেশি উৎসাহী হতে হবে। তখনই হবে সত্য স্বপ্নের সঠিক মূল্যায়ন। এর বিপরীত করলে হবে সত্য স্বপ্নের অপব্যাখ্যা ও অবমূল্যায়ন।

স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা.) যদি কোনো নির্দেশ দেন, তাহলে...

যদি স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো কাজের নির্দেশ দেন, কাজটি যদি শরীয়তের সীমানার ভেতর হয়, যেমন কাজটি হয়ত ফরজ বা ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত অথবা মুবাহ– তবে ওই কাজটি করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু শয়তান নবীজী (সা.)-এর আকৃতি ধরতে পারে না এবং কাজটিও শরীয়তের গণ্ডিবহির্ভূত নয়, সেহেতু কাজটি করাই হবে তার জন্য শ্রেয়। না করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়

কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমে যদি রাসূল (সা.) এমন কোনো নির্দেশ দেন, যা শরীয়তের আওতায় পড়ে না; যেমন– কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)কে স্বপ্নে দেখলো, মনে হলো– তিনি এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যা শরীয়ত সমর্থন করে না, তখন স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে শরীয়ত অসমর্থিত কাজ করা জায়েয হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বপ্নকে শরীয়তের দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেননি। পক্ষান্তরে নবীজী (সা.)-এর যেসব বাণী বিশুদ্ধ সূত্রে আমরা পেয়েছি, সেগুলো শরীয়তের দলীল হিসাবেই পেয়েছি। যেগুলোর উপর আমল করা জরুরী।

স্বপ্নের কথার উপর আমল করা জরুরী নয়। কারণ, এতটুকু অবশ্যই সত্য যে, শয়তান রাসূল (সা.)-এর সুরত ধরতে পারে না, তবে স্বপ্নের সঙ্গে অনেক সময় নিজের চিন্তা-চেতনাও গুলিয়ে যায় এবং তার কারণে ভুল বিষয় মনে থেকে যায়– স্বপ্নের এ দিকটাও অবাস্তব নয়। তাই স্বপ্ন কখনও ইসলামের দলীল হতে পারে না।

একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন-ঘটনা

জনৈক ন্যায়বিচারক কাজী একবার একটি মামলা পরিচালনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি সাক্ষ্য এবং শরীয়তসম্মত প্রমাণও হাতে পেয়ে গেছেন। এসবের ভিত্তিতে তিনি বাদীর পক্ষে রায় দিবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হঠাৎ মনে জাগলো, আজ ফায়সালা না দিয়ে আগামীকাল দিবো। মামলাটি নিয়ে আরেকটা দিন ভাববো। এ ভাবনা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন, মামলার রায় আগামী শুনানীতে হবে।

রাতের বেলায় যখন তিনি ঘুমালেন, স্বপ্নে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলছেন, তুমি যে রায় দেয়ার মনোস্থ করেছো, সেটি সঠিক নয়; রায় তোমার ইচ্ছে মত হবে না; বরং রায় এভাবে হবে।

কাজী সাহেব জাগ্রত হওয়ার পর হিসাব মিলিয়ে দেখলেন, রাসূল (সা.) যে রায়ের কথা নির্দেশ করেছেন, সে রায় শরীয়তের সীমানায় পড়ে না। কাজী সাহেব বিচলিত হলেন। একদিকে শরীয়তের দাবি, অন্য দিকে রাসূল (সা.) থেকে স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ– উভয়ের মাঝে স্পষ্ট বিরোধ। বিষয়টা কাজী সাহেবের নিকট দুর্বোধ্য মনে হলো। এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন যারা হন, তারাই বুঝতে পারবেন, ব্যাপারটা কত কঠিন। কাজী সাহেবের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তৎকালীন খলীফার শরণাপন্ন হলেন এবং সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন, আপনি দেশের উলামায়ে কেরামকে ডাকুন, তাঁদের সামনে মাসআলাটি পেশ করুন এবং তাঁদের রায় তলব করুন।

যথারীতি উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হলেন। তাঁরা অনুভব করলেন যে, আসলেই মাসআলাটি খুব জটিল। একদিকে শরীয়তের দাবি, অপর দিকে রাসূল (সা.)-এর স্বপ্নপ্রাপ্ত নির্দেশ। শয়তান তো রাসূল (সা.)-এর সুরত ধরতে পারে না, কিন্তু তাই বলে কী শরীয়তের স্পষ্ট বিষয়কে উপেক্ষা করা যাবে?

উলামায়ে কেরাম যখন এরূপ দোটানায় ভুগছিলেন, তখন ওই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) ওঠে দাঁড়ালেন। তিনিও উলামাদের মজলিসেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন,

আমি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলছি, কাজী সাহেব যে ফায়সালা দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, সেই ফায়সালাই দিন। যেহেতু কাজী সাহেবের ফায়সালা শরীয়ত সমর্থিত– এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতএব এ ফায়সালার কারণে যে সাওয়াব কিংবা গুনাহ হবে তার যাবতীয় দায়ভার আমার কাঁধে নিয়ে নিলাম। স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করা মোটেও জায়িয হবে না। শয়তান যদিও রাসূল (সা.)-এর সুরত ধরতে পারে না; কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, জাগ্রত হওয়ার পর শয়তান অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করে দিয়েছে অথবা এও তো হতে পারে, নিজের কোনো খেয়ালীপনা স্বপ্নের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। মোটকথা, স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্নের মাঝে সমূহ সন্দেহ ও সম্ভাবনা অস্বীকার করা যাবে না। এজন্যই স্বপ্ন কখনও শরীয়তের দলীল হতে পারে না। আর শরীয়ত শরীয়তই। স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ সূত্রে জাগ্রত অবস্থার পবিত্র কথামালা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে পেয়েছি, একেই তো শরীয়ত বলে। আমরা শরীয়তের উপর আমল করবো। স্বপ্নের ভিত্তিতে শরীয়তকে উপেক্ষা করা যাবে না। অতএব কাজী সাহেবের ফয়সালার সাওয়াব অথবা গুনাহর দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে আমি নিলাম।

স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি শরীয়তের বিধান পরিবর্তন করতে পারে না

'গুনাহ-সাওয়াব আমার কাঁধে তুলে নিলাম' এ ধরনের কথা এত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওই সকল বান্দাগণই বলতে পারেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা দানের জন্য ও হেফাযতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। স্বপ্ন শরীয়তের দলীল হিসাবে যদি একবারের জন্য সাব্যস্ত হয়ে যেতো, তাহলে শরীয়তের ঠিকানাই ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। তখন স্বপ্নদ্রষ্টাদের প্রাদুর্ভাবে শরীয়তের বিশুদ্ধ ঠিকানা সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যেতো। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমানে যেসব জাহেল ও বিদআতী পীর আছে, তারা এসব স্বপ্নকেই সবকিছু মনে করে। স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম– এসব শব্দ তাদের দরবারে খুবই আস্থা ও ভরসার শব্দ। এগুলোর মাধ্যমে তারা নির্দ্বিধায় শরীয়তের খেলাফ আমল করে। ভালোভাবে বুঝে নিন, যত বড় বুযুর্গই (!) এসব কথা বলে, তাদের এগুলো শরীয়তবিরোধী হলে নিঃসন্দেহে আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে হবে। স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম কখনও শরীয়তকে পরিবর্তন করার যোগ্যতা রাখে না।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর একটি ঘটনা

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ছিলেন সকল ওলী-বুযুর্গের শিরোমনি। এক রাতে তিনি ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। তাহাজ্জুদের সময় হলে হঠাৎ

একটি নুর চমকে উঠলো। নুর থেকে আওয়াজ আসলো, 'হে আবদুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করেছো। এখন তুমি এ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছ যে, আজ থেকে তোমার ইবাদত আর প্রয়োজন হবে না। তোমার জন্য আজ থেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত– সবকিছু মাফ। যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তুমি আমল করতে পার, তোমাকে আমি জান্নাতী বানিয়ে দিলাম।'

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'অভিশপ্ত কোথাকার! দূর হয়ে যা। যে নামায রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্য, সমস্ত ওলীদের জন্য মাফ হয়নি, সে নামায আমার জন্য মাফ! দূর হয়ে যা, শয়তান!' একথা বলে তিনি শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন।

ক্ষণিক পরে আরেকটি আলোকধারা চমকে উঠলো। এ ছিলো যেন আলোর বন্যা। প্রথমবারের নুরের চেয়ে এবারের নুরের ঝলকানি আরো তীব্র। এবার আওয়াজ এলো, 'আবদুল কাদের! তোমার ইলম আজ তোমাকে রক্ষা করে দিলো। অন্যথায় এটা ছিলো এমন এক টোপ, যার মাধ্যমে আমি বড় বড় মানুষকে শিকার করেছি এবং ধ্বংস করেছি। তোমার মাঝে যদি ইলম না থাকতো, তুমিও ধ্বংস হয়ে যেতে।'

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এবার উত্তর দিলেন, শয়তান! অভিশপ্ত! দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছো। দূর হয়ে যা। আমার আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন, ইলম আমাকে রক্ষা করেনি।'

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, দ্বিতীয় ধোঁকাটি ছিলো, প্রথম ধোঁকার চেয়েও শত গুণ ভয়ানক। কেননা, শয়তান তখন তাকে ইলমের ধাঁধায় ফেলতে চেয়েছিলো; কিন্তু তিনি সেটিকেও তাড়িয়ে দিলেন।

স্বপ্নের কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যান জায়েয নেই

পরিস্থিতি খুব নাজুক। আজকাল মানুষ এমনকি শিক্ষিত দ্বীনদার লোকও দেখা যায়, স্বপ্ন, কাশফ, কারামত, ইলহামের পেছনে দৌড়ায়। শরীয়তে স্বপ্নের অবস্থান কতটুকু– এটা জানা ছাড়াই দাবি করে বসছে, আমার কাশফ হয়েছে, অমুক হাদীস সহীহ নয়, বুখারী ও মুসলিমের অমুক হাদীস ইহুদীদের বানানো। কাশফের মাধ্যমে এভাবে জানতে থাকলে কিংবা এ ধরনের হাস্যকর কাশফ হতে থাকলে দ্বীনের মূল কাঠামোই নড়বড়ে হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা ওই সকল উলামায়ে কেরামকে রহমত দান করুন, যাঁদেরকে বাস্তবিক অর্থেই তিনি দ্বীনের মুহাফিজ ও পাহারাদার বানিয়েছেন। নিন্দুকেরা এসব মনীষীদের বিরুদ্ধে যত নিন্দাবাদই ঝরাক না কেন, তাঁরা নিজ দায়িত্ব ঠিকভাবেই আদায় করেছেন। দ্বীনকে তাঁরা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি থেকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। স্পষ্ট ভাষায় তাঁরা বলে গেছেন, স্বপ্ন, কাশফ কিংবা কারামত– এ তিনটি কোনোটিই শরীয়তের দলীল নয়। এগুলোর মধ্যে শরীয়তের দলীল হওয়ার যোগ্যতা নেই। শরীয়তের দলীল হলো সেটাই, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আরে ভাই! কাশফ তো পাগলেরও হতে পারে, এমনকি কাফেরেরও হতে পারে। অতএব নুর দেখেছি, হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করেছি ইত্যাদি দ্বারা কখনও ধোঁকায় পড়ো না। এ সকল জিনিস মর্যাদার মাপকাঠি হতে পারে না।

স্বপ্নদ্রষ্টা কি করবে?

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি স্বপ্নের অপ্রীতিকর কিছু দেখে তাহলে সে যেন বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করে এবং أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে। আর তারপর যে কাত হয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিলো, সে কাত যেন পরিবর্তন করে নেয়। তাহলে এ স্বপ্ন 'ইনশাআল্লাহ' কোনো কুপ্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব কেউ ভীতিকর কোনো স্বপ্ন দেখলে, যেন উক্ত কাজগুলো করে। এগুলো আমাদেরকে রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন।

আর কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে যার-তার কাছে প্রকাশ করবে না। যেমন পার্থিব কোনো উন্নতি বা এ জাতীয় স্বপ্ন দেখলে এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবে, যে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। যার-তার কাছে স্বপ্নের কথা বললে অনেক সময় এর উল্টো ব্যাখ্যা করে বসে। ফলে ভালো স্বপ্নও অনেক সময় উল্টো ব্যাখ্যার কারণে বিস্বাদে রূপান্তরিত হয়। তাই স্বপ্নের কথা বলবে নিজের শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে এমন ব্যক্তির নিকট। ভালো স্বপ্ন দেখলে অবশ্যই আল্লাহর শোকর আদায় করবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৯৮৬)

স্বপ্ন বর্ণনাকারীর জন্য দুআ করবে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কেউ কোনো স্বপ্নের বর্ণনা দিলে তিনি তার জন্য নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

خَيْرًا تَلْقَاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِأَعْدَائِنَا

অর্থাৎ– আল্লাহ তাআলা এ স্বপ্নের ভালো দিকগুলো তোমাকে দান করুন এবং তার অনিষ্ট থেকে তোমাকে হেফাজত করুন। আর আল্লাহ করুন, স্বপ্নটি যেন আমাদের জন্য ভালো হয় এবং আমাদের দুশমনদের জন্য অনিষ্টের কারণ হয়।

দুআটি অর্থপূর্ণ। সকলেই এর উপর আমল করার চেষ্টা করবে। স্বপ্নের আদব, তাৎপর্য ও আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। মানুষের মাঝে স্বপ্ন বিষয়ে অনেক রকম বিভ্রান্তি রয়েছে। আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন। দ্বীনের উপর সহীহভাবে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

“কোনো কাজ করার ব্যাপারে যখন অলসতা দেখা দিবে, তখন ওই সময়টি মানুষের জন্য এক পরীক্ষার সময়। তখন একটা সুরত এ হতে পারে যে, অলসতার কাছে হার মেনে যাবে, নফসের ডাকে সাড়া দিয়ে দিবে। কিন্তু এর ফলে হার মানার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আজ এক কাজে হার মানলে, অন্যদিন আরেক কাজে হার মানার জন্য মন আঁকুপাকু করবে।

অপর দিকে আরেকটা সুরত এ হতে পারে যে, তখন অলসতাকে হিম্মত দ্বারা পিষে ফেলবে। মেহনত ও শ্রমের মাধ্যমে অলসতার মোকাবেলা করবে। সাহস, মেহনত ও শ্রমের বরকতে ‘ইনশাআল্লাহ’ কাজ হয়ে যাবে।”

অলসতার মোকাবেলায় হিম্মত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ ٦٩)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ

হামদ ও সালাতের পর

অলসতার মোকাবেলায় হিম্মত

গত কয়েক দিন আমি রেঙ্গুনসহ মায়ানমারের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেছিলাম। বিরামহীন আলোচনার প্রোগ্রাম ছিলো। প্রতিদিন চারটি, পাঁচটি পর্যন্ত আলোচনা করতে হয়েছে। তাই স্বর এখন অনেকটা পড়ে গেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ঘটনাক্রমে আগামীকাল আবার হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। আজ মেজাযে অনেকটা আলস্যভাব চলে এসেছে। মনে করলাম, গত জুমায় যখন প্রোগ্রাম করতে পারিনি, আরেকটি জুমুআও এভাবেই যাক না।

কিন্তু আমার শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর একটা কথা মনে পড়ে গেলো। একবার তিনি বলেছিলেন—

“কোন কাজ করার ব্যাপারে যখন অলসতা দেখা দিবে, তখন ওই সময়টি মানুষের জন্য পরীক্ষার সময়। তখন একটা সুরত এ হতে পারে, অলসতার কাছে হার মেনে যাবে, নফসের ডাকে সাড়া দিয়ে দিবে। কিন্তু এর ফলে হার

মানার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আজ এক কাজে হার মানলে অন্যদিন আরেক হার মানার জন্য মন আঁকুপাকু করবে।

অন্যদিকে আরেকটা সুরত এ হতে পারে যে, তখন অলসতাকে সাহসিকতা দ্বারা দলিত করে দিবে। মেহনত ও শ্রমের মাধ্যমে অলসতার মোকাবিলা করবে। সাহস, মেহনত ও শ্রমের বরকতে 'ইনশাআল্লাহ' কাজটি করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিবেন।"

তাসাওউফের নির্যাস দু'টি কথা

এ জাতীয় স্থানে আমাদের শায়খ হযরত থানভী (রহ.)-এর বাণী শোনাতেন। প্রতিটি কথা হৃদয়ে অঙ্কিত করে রাখার মতো। হযরত থানভী (রহ.) বলতেন–

"সংক্ষিপ্ত কথা– যা তাসাওউফের নির্যাস তাহলো, ইবাদত করতে অলসতাবোধ হলে তখন অলসতার মোকাবেলা ওই ইবাদতের মাধ্যমেই করো। আর কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা জাগলে তার মোকাবেলা গুনাহটি বর্জন করার মাধ্যমেই করবে। এভাবে চলতে পারলে অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না। এর দ্বারাই আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়; এর দ্বারা তাআল্লুক মাআল্লাহ গভীর হয় এবং উন্নতি লাভ করে।"

মোটকথা অলসতা দূর করার পথ একটাই। তাহলো তার মোকাবেলায় হিম্মতকে কাজে লাগানো। মানুষ মনে করে, শায়খের ব্যবস্থাপত্র ট্যাবলেট তৈরি করে খাইয়ে দিলে অলসতা হাড়ি ভেঙে পড়ে এবং সকল কাজ সুস্থমনে চলতে থাকে। মনে রাখবে, অলসতার ব্যবস্থাপত্র 'হিম্মত' বৈ কিছু নয়।

নফসকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাজ নাও

ডা. আবদুল হাই (রহ.) প্রায় বলতেন, নফসকে একটু ভুলিয়ে ও ফুসলিয়ে কাজ নাও। তারপর তিনি নিজের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, এক দিন তাহাজ্জুদ নামাযের সময় হয়েছে, আমিও চোখ মেলেছি কিন্তু আলস্য ভাবের কারণে উঠতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, আজ শরীরটা ভালো নেই– অস্বস্তি লাগছে, বয়সতো কম হয়নি! তাছাড়া তাহাজ্জুদ তো ফরয ওয়াজিব এমন কিছু নয়। সুতরাং একদিন না পড়লেই বা কী হবে?

হযরত বলেন, তারপর ভাবলাম, যদিও এটা ঠিক যে, তাহাজ্জুদ ফরজ-ওয়াজিব নয়, অপর দিকে শরীরটাও সুস্থ নয়; তবে কথা হলো, এখন তো দুআ কবুলের মুহূর্ত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতসমূহ যমীনের অধিবাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান জানাতে থাকে, আছো কি কোনো মাগফিরাতপ্রার্থী, তাকে ক্ষমা করে দিবো। সুতরাং এমন পবিত্র সুযোগ হারানো তো উচিত নয়।

এ ভাবনার পর নফসকে সম্বোধন করে বললাম, ঠিক আছে– এক কাজ করো নামায না পড়লেও একটু উঠে বস এবং যা পার দুআ করে নাও। দুআ শেষে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়। তাই পর মুহূর্তেই উঠে বসলাম এবং দুআ শুরু করে দিলাম। দুআ করতে করতে নফসকে পুনরায় বুঝালাম, উঠে বসেছ যখন আরেকটু কষ্ট কর। ঘুম তো চলে গেছে। সুতরাং একটু অগ্রসর হও। বাথরুম পর্যন্ত যাও, ইস্তিঞ্জাটা সেরে নাও। তারপর দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পড়। এভাবে বাথরুম পর্যন্ত চলে গেলাম, ইস্তিঞ্জা সেরে নিলাম। ইতোমধ্যে নফসকে আবার বুঝালাম, ইস্তিঞ্জা করার পর অযুটাও করে নাও। কেননা, অযু অবস্থায় দুআ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তাই অযুও করে নিলাম। বিছানায় এসে বসে পড়লাম এবং দুআও শুরু করলাম। ইত্যবসরে নফসকে আবার ফুসলানো শুরু করলাম যে, এখানে বসে বসে দুআ করে কী লাভ? দুআ করার স্থান তো হলো তোমার জায়নামায। সেখানে যাও, দুআ কর। শেষ পর্যন্ত জায়নামাযে চলে গেলাম এবং ঝটপট দু' রাকাআত নামাযের নিয়ত বেঁধে ফেললাম।

অতঃপর হযরত বলেন, নফসকে এভাবেই ভুলাও, ফুসলাও এবং কাজ নাও। যেমনিভাবে নফস নেক কাজ নিয়ে টালবাহানা করে, তেমনিভাবে তার সঙ্গে তুমিও টালবাহানা কর। ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে নেক কাজের জন্য প্রস্তুত কর। এর দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তাআলা নেক কাজ করার তাওফীক দান করবেন।

যদি রাষ্ট্রপ্রধান ডাক দেয়

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) আরও বলতেন, তোমরা কর্মসূচি করে রেখেছো যে, অমুক সময় তেলাওয়াত করবে আর অমুক সময় নফল নামায পড়বে ইত্যাদি। তারপর যখন তোমাদের সময় হয়, তখন অলসতা চেপে বসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নফসকে দীক্ষা দাও। তাকে বুঝাও এবং পটাও। তাকে বলো, এ মুহূর্তে যদি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে তোমার নিকট এ পয়গাম আসে যে, রাষ্ট্রপ্রধান তোমাকে তলব করেছেন। পুরস্কার, পদ কিংবা চাকরি দেয়ার জন্য বিশেষভাবে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তখনও কি অলসতা দেখাবে। নিশ্চয় দেখাবে না; বরং তোমার মাথা যদি বিগড়ে না যায়, দৌড় দিবে। রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে।

বুঝা গেলো, তোমার ওজর আসলে কোনো ওজর নয়; বরং এ ছিলো নফসের টালবাহানা।

তারপর চিন্তা কর, দুনিয়ার একজন রাষ্ট্রপ্রধান যার শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার সামনে কিছুই নয়, তার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে যদি তুমি এতটা উদগ্রীব হতে পার, তাহলে যে আল্লাহ তাআলা বাদশাহদেরও বাদশাহ– সকল ক্ষমতার মালিক, যার হাতে তোমাদের জীবন-মরণ ও মান-সম্মান, সেই আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার ব্যাপারে তোমার অলসতা কেন?

এভাবে চিন্তা কর। এর দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ' হিম্মত তৈরি হবে, অলসতাও পালিয়ে বেড়াবে।

কালকের জন্য ফেলে রেখো না

অনেক সময় দেখা যায়, নেক আমলের কথা অন্তরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে নফসও ধোঁকা দিতে শুরু করে। নফস বলে, কাজটি তো অবশ্য ভালো, তবে আজ নয়; আগামীকাল করো। মনে রাখবে, এটা নফসের ধোঁকা বৈ কিছু নয়। কারণ, কথিত 'আগামী' আর তোমার জীবনে আসবে না। তাই নেক কাজ করতে চাইলে এখনই করে নাও। কাল তোমার মনে এ নেক কাজের কথা নাও থাকতে পারে। থাকলেও সময়-সুযোগ নাও হতে পারে। তাই যা করার এখনই করে নাও। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

নিজের ফায়দার জন্য আসি

দ্বিতীয়ত, এখানে মূলত আমি নিজের ফায়দার জন্য আসি। ভাবি, আল্লাহর নেক বান্দারা দ্বীনের তলব নিয়ে এখানে আসেন, আমি যেন তাদের বরকত লাভে ধন্য হতে পারি। আসলে দ্বীনী কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহর নেক বান্দারা যখন একত্র হয়, তখন প্রত্যেকেই তারা পারস্পরিক বরকত দ্বারা সিক্ত হয়। তাই আমিও সর্বদা এ নিয়তেই আসি যে, যেন নেক বান্দাদের থেকে বরকত হাসিল করতে পারি।

সেই মুহূর্তের মূল্যই বা কী?

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর আরেকটি কথা মনে পড়ে গেলো। এটাও আমি ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর যবানেই শুনেছি। তিনি বলেছেন, হযরত থানভী (রহ.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ডাক্তাররা যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা থেকে সকলকে বারণ করে দিয়েছিলেন, সেই সময়ের ঘটনা।

একদিন হযরত বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ চোখ খুললেন এবং বললেন, মৌলভী শফী কোথায়? হযরতওয়ালা 'আহকামুল কুরআন' আরবী করার দায়িত্ব আব্বাজানকে দিয়ে রেখেছিলেন। আব্বাজান উপস্থিত হলেন। হযরতওয়ালা আব্বাজানকে বললেন, আপনি তো 'আহকামুল কুরআন' লিখছেন, এই মাত্র আমার স্মরণে এলো, কুরআন মাজীদের অমুক আয়াত থেকে অমুক মাসআলা বের হয়। মাসআলাটি ইতোপূর্বে অন্য কোথাও দেখিনি। এই আয়াত পর্যন্ত যখন যাবেন, মাসআলাটি লিখে নিবেন।

এ বলে হযরত পুনরায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। দেখুন, মৃত্যুশয্যায় থেকেও কুরআন মাজীদের আয়াত ও তাফসীর নিয়ে এই পরিমাণ গবেষণায় লিপ্ত! কিছুক্ষণ পর পুনরায় চোখ মেলে বললেন, অমুক কোথায়? তাকে একটু ডাক। ভদ্রলোক যখন এলো হযরত তাকেও কিছু কাজের কথা বললেন। বারবার যখন এ রকম ডাকাডাকি করছিলেন, তখন খানকার নাযিম মাওলানা শিব্বীর আলী সাহেব– যিনি হযরতের সাথে অনেকটা ফ্রি ভাবে চলতে পারতেন– বললেন, হযরত! ডাক্তার ও হেকিমরা আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। অথচ আপনি বারবার কথা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাদের উপর দয়া করুন। তখন হযরত উত্তর দিলেন—

"তোমার কথা যদিও মিথ্যা নয়, কিন্তু আমি ভাবছি অন্যটা, আমার ভাবনা হলো– জীবনের যে মুহূর্তটিতে কারো খেদমত করতে পারিনি, সে মুহূর্তেই মূল্যই বা কী? যদি খেদমতের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে পারি, তাহলে এটা তো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।

দুনিয়ার পদ ও মর্যাদা

আমার মুরুব্বী ডা. আবদুল হাই আরেফী আরও বলতেন, দুনিয়াতে যত বড় বড় পদ ও গদি রয়েছে, তার কোনোটিই লাভ করা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। কোনো ব্যক্তি কোনো দেশ, সংস্থা বা দলের প্রধান হতে চাইলে এবং সেজন্য হাজার চেষ্টা করলেও তার সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া নিশ্চিত নয়। এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা এ চেষ্টা করতে-করতে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। অথচ সেই পদ লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া কেউ এ জাতীয় কোনো পদ লাভ করলেও এই গ্যারান্টি নেই যে, এই পদে সেই ব্যক্তি সর্বদা টিকে থাকতে পারবে। এমন অসংখ্য লোক রয়েছে, যারা পদাধিকারীদের ব্যাপারে হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। আর পদাধিকারী ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। অনেক সময় চেষ্টায় সফলও হয়। ফলে কালকের শাসককে আজকের কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্ত কণ্টকাকীর্ণ পদ ও গদি ছেড়ে আমি তোমাদেরকে

রোযা কেন রেখেছিলে?

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কথা বর্ণনা করেছিলেন। এক ব্যক্তি রমযানে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে গিয়েছিলো। এজন্য তার টেনশন হচ্ছে। হযরত বলেন, এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, দেখার বিষয় হলো, তুমি রোযা কার জন্য রাখছো? যদি নিজের জন্য, নিজের নফস তৃপ্তির জন্য, নিজের তামান্না পূরণ করার জন্য রোযা রেখে থাক, তাহলে চিন্তায় ক্লিষ্ট হতে পার। আর যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য রোযা রেখে থাক, তাহলে এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যেহেতু আল্লাহ নিজেই অসুস্থাবস্থায় রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। সুতরাং শরয়ী কোনো ওজরের কারণে যেমন অসুস্থতা, সফর ও নারীদের ঋতুস্রাবের কারণে রোযা অথবা কোনো আমল ছুটে গেলে এতে পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কারণ, এসব হলো ওজর। ওজরের কারণে অনেক কিছুই ছাড় দেয়া যায়। পক্ষান্তরে অলসতার কারণে কোনো আমল ছুটে যাওয়া কখনও কাম্য হতে পারে না।

অলসতার চিকিৎসা

অলসতার মোকাবেলা করাই অলসতার চিকিৎসা। যদি অলসতার সামনে হিম্মত ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এর চিকিৎসা মোটেও হবে না। বরং তার সামনে বুক টানটান করে দাঁড়াতে হবে। হিম্মতের সঙ্গে তার মোকাবেলা করতে হবে। শক্তহাতে তার কোমর ভেঙে দিতে হবে। তাহলে দেখবে, অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক চেষ্টার মাধ্যমে হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে অলসতার মোকাবেলা করার হিম্মত দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"কুদৃষ্টি আত্মশুদ্ধির পথে এক বাঁধার প্রাচীর। অন্যান্য গুনাহের তুলনায় এর ধ্বংসপ্রভাব অধিক। কুদৃষ্টির চিকিৎসা প্রয়োজন, এ ছাড়া আত্মশুদ্ধির কল্পনা করাও কঠিন। হাদীস শরীফে এসেছে, 'কুদৃষ্টি ইবলিস কর্তৃক বিষমিশ্রিত একটি তীর।' এ তীর বের হয় ইবলিসের তূনীর থেকে। যদি কেউ এ তীরে বিদ্ধ হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। আত্মশুদ্ধির অবকাঠামোর উপর কুদৃষ্টি এক মারাত্মক আঘাত। অশুদ্ধির জন্য এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।"

চোখের হেফাযত করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (النور ٣٠)

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

"মুমিনদের বলুন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।" (সূরা নূর : ৩০)

একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি

কুদৃষ্টি একটি মারাত্মক ব্যাধি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরই বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যাধিটি সমাজে ব্যাপক। বর্তমানের অবস্থা আরো নাজুক। ঘর

থেকে বের হলেই নজরে পড়ে নানা আকর্ষণীয় দৃশ্য। আম-খাছ, নামাযী, ধার্মিক এমনকি আলেমরাও অনেক সময় এ ব্যাধিতে জড়িয়ে পড়ে।

'কুদৃষ্টি' একটি ব্যাপক শব্দ। যার মর্মার্থ হলো, গায়রে মাহরামের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। লোলুপ দৃষ্টি হলে সেটি আরো মারাত্মক। গায়রে মাহরামের ফটোর উপর দৃষ্টি দিলেও একই গুনাহ হবে। কুদৃষ্টি হারাম। যৌনতার গন্ধ থাকলে তা জঘন্য।

কুদৃষ্টি আত্মশুদ্ধির পথে এক বাঁধার প্রাচীর। অন্যান্য গুনাহর তুলনায় এর ধ্বংস-প্রভাব অধিক। কুদৃষ্টির চিকিৎসা প্রয়োজন। অন্যথায় আত্মশুদ্ধির কল্পনা করাও কঠিন। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ (مجمع الزوائد ج ٨ - ص ٦٣)

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি ইবলিস কর্তৃক বিষমিশ্রিত একটি তীর। এ তীর বের হয় ইবলিসের তূণীর থেকে। যদি কেউ এ তীরে বিদ্ধ হয়, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য। আত্মশুদ্ধির অবকাঠামোর উপর কুদৃষ্টি এক মারাত্মক আঘাত। কুদৃষ্টির অশুভ প্রভাবের মত অন্য কোনো গুনাহ এতটা প্রভাবশীল নয়।

তিক্ত ডোজ পান করতেই হবে

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেছেন, দৃষ্টির অপব্যবহার আত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক বিষ। যদি আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন মনে কর, তাহলে সর্বপ্রথম দৃষ্টির হেফাযত করতে হবে। কাজটি নিতান্তই কঠিন মনে হয়। শত চেষ্টা করেও চোখ দুটির রক্ষা নেই। চারিদিকে বেপর্দার সয়লাব। উন্মুক্ত চলাফেরা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়া-বেলেল্লাপনার বাজার খুবই জমজমাট। এহেন পরিস্থিতিতে দৃষ্টিকে রক্ষা করা নিতান্তই কঠিন মনে হয়। কিন্তু ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে হলে, নিজের অন্তরকে পূতঃপবিত্র করতে হলে, তেতো ঔষধ সেবন করতেই হবে। তেতো ডোজ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রথম প্রথম তেতো প্রতিষেধক তেতো মনে হলো এর ভেতর লুকিয়ে আছে এক অন্যরকম স্বাদ। অভ্যাসে পরিণত হলে এ তেতো ঔষধ সুমিষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এটি ছাড়া মনে প্রশান্তিই আসবে না।

আরবদের কফি

আরবরা কফি পান করে। ছোট ছোট পেয়ালায় তারা কফি পান করে। আমি যখন ছোট ছিলাম, কাতারের এক শায়খ করাচি এসেছিলেন। আব্বাজানের সাথে আমিও তাঁর সাক্ষাতে গেলাম। সে সময় আমি কফির সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হই। উপস্থিত সকলের মাঝে কফি পরিবেশন করা হলো। ভেবেছিলাম,

কফি খুব সুমিষ্ট পানীয়। কিন্তু চুমুক দেয়ার সাথে-সাথে টের পেলাম, কফি ভীষণ তেতো। দু'-এক চুমুক পান করাও আমার কাছে প্রায় অসম্ভব মনে হলো। সেই সর্বপ্রথম কফি পান করি, তারপর আরেকটি মজলিসেও কফি পান করি। এখন একেবারে অভ্যস্ত। বরং কফি আমার কাছে সুপ্রিয় এক পানীয়। সুস্বাদু, মজাদার হিসাবে কফি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মজা পাবে

অনুরূপভাবে দৃষ্টির সঠিক ব্যবহার কফির মতই তিক্ত মনে হবে। তবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে মজা পেয়ে যাবে। কুদৃষ্টির সাময়িক মজা তখন খুবই তুচ্ছ মনে হবে। আল্লাহ তাআলা তৃপ্তি ও প্রশান্তির সুশীতল স্বাদ হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিবেন। কুদৃষ্টির নিকেল স্বাদ দূর করে দিবেন।

চোখ একটি মহা নেয়ামত

চোখ একটি মেশিন। আল্লাহপ্রদত্ত এক মহা নেয়ামত। না চাইতেই আল্লাহ দান করেছেন। সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে সে। কোনো কষ্ট ও অর্থ ছাড়াই এ নেয়ামত আমরা পেয়েছি। সুতরাং এর কদর করা উচিত। একজন অন্ধকে জিজ্ঞেস করুন চোখের মূল্য কত? চোখ ছাড়া এ জগতের কোনো মূল্য নেই। তখন সবকিছু অন্ধকার মনে হবে। প্রয়োজনে মানুষ এর জন্য সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিবে। এটি এমন এক মেশিন, যার কোনো তুলনাই হয় না। এরূপ যন্ত্র আবিষ্কার মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

চোখের পলকে সাত মাইল ভ্রমণ

একটি গ্রন্থে পড়েছি, আল্লাহ তাআলা চোখের মধ্যে যে পুত্তলি রেখেছেন, তা আলোতে সম্প্রসারিত হয় এবং অন্ধকারে সঙ্কুচিত হয়। মানুষ যখন আলো থেকে অন্ধকারে আসে কিংবা অন্ধকার থেকে আলোতে আসে, তখন সম্প্রসারণ ও সংকোচনের কাজটি হয়। এরই মাঝে চোখের স্নায়ুগুলো সাত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। অথচ মানুষ টেরও পায় না। এত বড় নেয়ামত একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন।

চোখের সুন্দর ব্যবহার

এ চোখ যদি সঠিক স্থানে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর মাঝে রয়েছে সাওয়াব। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, মহব্বত ও ভক্তির সাথে মাতা-পিতার প্রতি তাকালে এক হজ্জ ও এক উমরাহর সাওয়াব পেয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী একে

অপরের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে চোখের অপব্যবহার হলে আযাবের ভাগী হবে। কারণ, যে দৃষ্টিতে পবিত্রতা নেই, তার মাঝে আল্লাহর রহমত নেই।

কুদৃষ্টির চিকিৎসা

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার একটাই পথ। তাহলো, সংকল্প নেয়া। সাহসের সাথে এ সংকল্প নেয়া যে, দৃষ্টির অপব্যবহার করবো না; মনের দাপাদাপি যত তীব্রই হোক, কখনও কুদৃষ্টি দিবে না। কবির ভাষায়–

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہو
اب تو اس کو دل بنانا ہے ترے قابل مجھے

"আশা-ভরসা খুন হয়ে যাক কিংবা আফসোসগুলো পদদলিত হোক। প্রয়োজন আমার হৃদয়কে প্রভুর জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার।"

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) চোখের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যার প্রতিটি পরামর্শ স্মরণ রাখার মত। তিনি বলেন, "কোনো পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নফস তোমাকে প্রবঞ্চিত করতে চাইবে। বলবে, একবার দেখে নাও, এতে তেমন ক্ষতি কিসের? বুঝে নিবে, এটা নফসের প্ররোচনা। সুতরাং নফসের ডাকে সাড়া না দিয়ে তার আশা ধুলোয় মিশিয়ে দিবে।"

কুচিন্তার চিকিৎসা

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) একদিন বলতে লাগলেন, গুনাহর যে কল্পনা ও লোভ মনের মাঝে সৃষ্টি হয়, তারও ব্যবস্থাপত্র আছে। তাহলো, যখন মনে এ কুচিন্তা আসবে যে, আমার দৃষ্টি অন্যায় স্থানে ব্যবহার করবো– তখনই মুহূর্তের জন্য চিন্তা করবে, আমার আব্বা যদি কাজটি দেখতে পান, তাহলে তার চোখের সামনে কি এ ধরনের কাজ করতে পারবো? অথবা আমি যদি জানতে পারি যে, আমার কোনো মুরুব্বী আমাকে এ অবস্থায় দেখে ফেলবেন, তাহলে এরপরেও কি আমার এ কাজ অব্যাহত রাখবো? অথবা যদি বুঝতে পারি, আমার ছেলেমেয়েরা এ কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, তাহলেও কি আমার অন্যায় কাজটি অব্যাহত থাকবে?

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কোনো ব্যক্তির সামনেই আমি চোখকে যেখানে-সেখানে ব্যবহার করতে পারবো না। মনের বাসনা যত তীব্রই হোক না কেন, আমার অন্যায় কাজ তখন সামনে এগুবে না।

তারপর ভাববে, এসব লোকের দেখা কিংবা না দেখার কারণে আমার ইহকালীন কিংবা পরকালীন কোনো কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে না। কিন্তু আমার এ অবস্থা যদি আল্লাহ তাআলা দেখেন, তাহলে সেটা পরওয়া না করে তো পারি না। যেহেতু তিনি আমার এ অন্যায়ের শাস্তি দিবেন। এভাবে চিন্তা করলে এর বরকতে 'ইনশাআল্লাহ' গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

যদি তোমার জীবনের ফিল্ম চালানো হয়...

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর আরেকটি কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি বলতেন, একটু ভাবো, আখেরাতে আমার আল্লাহ যদি বলেন, আচ্ছা! জাহান্নাম তো তোমাদের জন্য ভীতিকর, তাহলে এসো, জাহান্নাম থেকে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দেবো, তবে তার জন্য একটি শর্ত আছে। তোমার সম্পূর্ণ জীবনে তথা শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য এবং বার্ধক্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু করেছ, তার ফিল্ম চালাবো। ফিল্মের দর্শক হবে তোমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষকবৃন্দ, শাগরিদগণ ও তোমার বন্ধু-বান্ধব। এর মাধ্যমে তোমার গোটা জীবনের ইতিহাস টানা হবে। যদি তোমরা এ কথাটি মেনে নিতে পার, তাহলে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

অতঃপর হযরত ডা. সাহেব (রহ.) বলেন, এ পরিস্থিতিতে সম্ভবত মানুষ আগুনের শাস্তিকে মাথা পেতে নিবে, তবুও এটা মানতে রাজী হবে না যে, এ সকল মানুষের সামনে আমার জীবনের চিত্রগুলো ভেসে উঠুক।

অতএব মাখলুকের সামনে তোমার মুখোশ উন্মোচন যদি মেনে নিতে না পার, তাহলে সে-ই চিত্রগুলো আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হবে– এটা কিভাবে মেনে নিবে? এ কথাটি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ।

দৃষ্টি অবনত রাখবে

হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তাআলা যখন শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দেন, বিদায় নেয়ার সময় সে প্রার্থনা করেছিলো, হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াত দান করলেন। তারপর সে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো–

لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

"আমি তোমার বান্দাদের নিকট যাবো। তাদের অগ্র-পশ্চাত, ডান-বাম এবং চতুর্দিক থেকে তাদের আক্রমণ করবো।" (সূরা আরাফ : ১৭)

বুঝা গেলো, শয়তানের আক্রমণ চতুর্মুখী হবে। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে তার আক্রমণ চলবে। তবে দুটি দিকের কথা শয়তান উল্লেখ করেনি। উপরের দিক এবং নিচের দিক। তাই উপর দিকও নিরাপদ, নিচের দিকও নিরাপদ। কিন্তু উপর দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে থাকলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। অতএব নিরাপদ দিক একটিমাত্র অবশিষ্ট থাকলো। আর তাহলো নিচের দিক। নিচের দিকে দৃষ্টিকে অবনত করে যদি চলতে পার, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' শয়তানের চতুর্মুখী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। কাজেই অকারণে ডানে-বামে ইতিউতি করবে না। দৃষ্টিকে অবনত রাখবে, আর আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। তারপরই দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তোমাকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে।' (সূরা নূর : ৩০)

নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এবং একটু সামনে গিয়ে তার ফলাফলও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, এর কারণে লজ্জাস্থানের হেফাযত হবে এবং আত্মিক পবিত্রতা লাভ হবে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর বাণী

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, কুদৃষ্টির একটি স্তর হলো, মনের মাঝে আকর্ষণ অনুভব করা। এটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। এর পরবর্তী স্তর হলো, আকর্ষণের অনুকূলে কাজ করা। এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিধায় এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ইচ্ছাকৃত কুদৃষ্টি দেয়া এবং কুচিন্তা করা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এসবের জন্য পাকড়াও করা হবে। এ স্তরের চিকিৎসা হলো, নফসকে দমিয়ে রাখা এবং দৃষ্টিকে অবনত রাখা। এ দুটি কাজ সাহসিকতার সাথে করতে হবে। এর দ্বারা নফস কিছুটা ব্যথিত হলেও এ ব্যথা জাহান্নামের শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। পনের দিন এভাবে চলতে পারলে, মনের আকর্ষণও এক সময় আর অবশিষ্ট থাকবে না। এটাই কুদৃষ্টির চিকিৎসা। এর চেয়ে ফলপ্রসূ কোনো চিকিৎসা নেই। সারা জীবন এর উপর আমল করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার পথে আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।' (সূরা আনকাবুত : ১২১)

দু'টি কাজ করে নাও

দু'টি কাজ করে নাও। হিম্মত কর এবং আল্লাহর দিকে রুজু হও। হিম্মত করার অর্থ হলো, যত সম্ভব দৃষ্টির অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার অর্থ হলো, গুনাহর পরীক্ষা সামনে এসে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাকে গুনাহটি থেকে বাঁচান, আমার চোখকে হেফাযত করুন, আমার চিন্তা-চেতনাকে রক্ষা করুন। আপনার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আদর্শের অনুসরণ কর

হযরত ইউসুফ (আ.) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তখন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর হিম্মত করেছেন। জুলায়খা তাঁকে চারিদিক থেকে আবদ্ধ করে ফেলেছিলো। সকল দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলো। ইউসুফ (আ.) দেখতে পেলেন, বের হওয়ার কোনো পথ নেই, তবুও তিনি হিম্মত করে চেষ্টা চালালেন। বন্ধ দরজার দিকেই দৌড় দিলেন। তাঁর সাধ্যে যতটুকু ছিলো ততটুকু তিনি করলেন। নিজের চেষ্টা শেষ হওয়ার পর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ! আমার শক্তি ও সামর্থ্য যতটুকু ছিলো, ততটুকু আপনার দরবারে নিবেদন করেছি। এর বেশি আমার সাধ্য নেই। পরক্ষণেই দেখা গেলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাহায্য করলেন। সকল তালা তিনি খুলে দিলেন। এ কথাটিই মাওলানা রুমী (রহ.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন–

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف وار می باید دوید

অর্থাৎ– 'যদিও পৃথিবীর বুকে কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পাচ্ছো না, বরং চারিদিকে শুধু গুনাহর হাতছানি দেখতে পাচ্ছো, তবুও তুমি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো গুনাহ থেকে পালাও। তোমার সাধ্যমতে তুমি গুনাহ থেকে পালাও এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। মানুষ এ দু'টি কাজ করতে পারলে সফলতা তার পদচুম্বন করবেই। সকল সফলতার ভেদ এর মাঝেই লুকায়িত।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর পদ্ধতি অবলম্বন কর

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) চমৎকার চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস (আ.)কে তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যে রেখেছেন। সেস্থান থেকে বের হয়ে আসার কোনো পথই ছিলো না। চতুর্দিক আঁধার অমানিশায় আচ্ছন্ন ছিলো এবং সমস্ত প্রক্রিয়াই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলো। ঠিক তখনই এই অন্ধপুরীতে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন এবং নিম্নোক্ত কালিমাটি পাঠ করতে থাকলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

আল্লাহ বলেন, গভীর অন্ধকারে বসে যখন সে আমাকে ডেকেছিলো, আমি সাড়া দিয়ে বললাম–

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ

অর্থাৎ– আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে চিন্তা থেকে মুক্তি দান করলাম। অবশেষে তিন দিন পর তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তি পেলেন। আল্লাহ বলেন, আমি এভাবেই মুমিন বান্দাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, এখানে আল্লাহ তাআলা কী কথাটি বলেছেন? বলেছেন, আমি মুমিনদেরও এভাবে মুক্তি দিয়ে থাকি। তাহলে প্রত্যেক মুমিন কি মাছের পেটে ঢুকবে? সেখানে বসে আল্লাহকে ডাকবে? তারপর আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে মুক্তি দান করবেন? আয়াতের মর্মার্থ কি এই?

না, বরং মর্মার্থ হলো যেমনিভাবে ইউনুস (আ.) মাছের পেটে নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তোমরাও অন্য কোনো অন্ধকারে পড়ে যেতে পার। তখন সেখানেও তোমাদের মুক্তির পথ সেটাই, যা হযরত ইউনুস (আ.) অবলম্বন করেছিলেন। আর তা হলো, এ শব্দগুলো দ্বারা আমাকে ডাকতে হবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

এ শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকলে বান্দা যে কোনো ধরনের বিপদেই পড়বে, তিনি পরিত্রাণ দিয়ে দিবেন।

আমাকে ডাকো

অতএব যখন প্রবৃত্তির কামনা নামক অন্ধকারের মুখোমুখী হবে, পরিবেশের অন্ধকারে যখন তুমি নিমজ্জিত হবে, সে সময় তুমি আমাকে ডাকবে। কাতরস্বরে

বলবে, হে আল্লাহ! এ অন্ধকার মেলা থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন। অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করুন। তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। এভাবে দুআ করতে পারলে, আশা করা যায় কবুল হবে।

পার্থিব উদ্দেশ্যে দুআ করলেও কবুল হয়

অর্থ-সম্পদ, চাকুরি, পদমর্যাদা, সুস্থতা মোটকথা পার্থিব যে কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দুআ করলে কবুল করে নেন। তবে কবুল করার ধরণ কখনও ব্যতিক্রম হয়। যেমন টাকা-পয়সা কিংবা পদমর্যাদার জন্য প্রার্থনা করলে হুবহু এগুলোই দান করা হয়। কিন্তু কখনও আরাধ্য বস্তু দান না করে আরো উত্তম অন্য কোনো বস্তু দান করা হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও তার চাহিদা এবং এগুলোর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ভালো করেই জানেন, এ ব্যক্তিকে তার আরাধ্য বস্তু দান করলে, দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলবে। তাই আরাধ্য অথচ ক্ষতিকর বস্তু দুআর কারণে দান করা হয় না। বরং দুআর কারণে বান্দার জন্য উপকারী বস্তুই দান করা হয়।

দ্বীনী উদ্দেশ্যসমৃদ্ধ দুআ নিশ্চিত কবুল হয়

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নিকট দ্বীনী কোনো বিষয়ে দুআপ্রার্থী হয়। যেমন দুআ করলো, হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের উপর চালান, সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দিন, গুনাহ থেকে হেফাযত করুন। তাহলে তার দুআ অবশ্যই কবুল হয়। সুতরাং দুআর সময় কবুল হওয়ার বিশ্বাসও রাখবে।

দুআর পর যদি গুনাহ হয়

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, গুনাহ মুক্তির দুআ করার পরও যদি গুনাহতে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে এর অর্থ হলো, তোমার দুআ কবুল হয়নি। পার্থিব ব্যাপারে তো বলা হয়েছিলো, দুআর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন না হলে, বুঝে নিতে হবে আল্লাহ তাআলা আমার কল্যাণার্থেই বস্তুটি দান করেননি। অন্যথায় দুআ অবশ্যই কবুল হয়েছে বিধায় এর পরিবর্তে আরো সুখকর কোনো বস্তু আমাকে দান করবেন। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এ রকম কথা বলা যায় না। কেননা মনে করুন, কেউ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক কামনা করে দুআ করলো, তবুও সে গুনাহয় লিপ্ত হয়ে গেলো। তাহলে এর অর্থ তো এটা অবশ্যই নয় যে, গুনাহ করাটাই দুআ প্রার্থীর জন্য মঙ্গলজনক ছিলো। বরং তখন এর অর্থ হবে, দুআ অবশ্যই কবুল হয়েছে। এরপরেও যদি গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, তবে

দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাওবা করার তাওফীক তাকে দান করবেন।

মোটকথা, দ্বীনের ব্যাপারে দুআ করলে মোটেও বৃথা যায় না, আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন। হুবহু কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাওয়া না গেলেও আল্লাহ তাআলা তাকে অন্যভাবে দান করেন। অনেক সময় এর বরকতে তার মর্যাদা সমুন্নত করেন।

ডা. আবদুল হাই (রহ.) আরো বলেন, দুআ করার পরও যদি তোমার পা দ্বীন থেকে ফসকে যায়, তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে দুর্বল ধারণা করো না যে, আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেননি। কারণ, এমনও তো হতে পারে, দুআর অসিলায় আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াবেন। তাঁর 'সাত্তার' 'গাফফার' ও 'রহমান গুণের পাত্র বানাবেন। অতএব কোনো দুআই বৃথা বলা যায় না– এ ইয়াকীন জাগরুক রাখবে। সাধনা করবে আর আল্লাহর নিকট দুআ করবে, তারপরেই দেখতে পাবে, শুভ ফল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সংবাদ।

গুনাহ থেকে বাঁচার একটিমাত্র ব্যবস্থাপত্র

কুদৃষ্টিই নয় শুধু; বরং সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার একটাই ব্যবস্থাপত্র। তাহলো, হিম্মতকে কাজে লাগাও, পুনঃ পুনঃ তাকে সতেজ করে তোল এবং আল্লাহর দিকে মন-মানসকে ফিরাও, তাঁর কাছে দুআ কর। হিম্মতভাঙ্গা কাজ করে এবং চেষ্টা-সাধনা তথা মুজাহাদা বন্ধ করে দিয়ে দুআ করলে কোনো কাজ হবে না। যথা এক ব্যক্তি পূর্ব দিকে চলছে। চলছে তো চলছে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছে, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিম দিকে চালাও। তাহলে তার এ জাতীয় দুআ কিভাবে কবুল হবে? বরং তাকে তো কমপক্ষে পশ্চিম দিকে মুখ ঘোরাতে হবে, তারপর দুআ করলে সে দুআ কবুল হবে। কাজের কাজ না করে শুধু দুআ করলে মোটেও ফায়দা হবে না। বরং এটা হবে আল্লাহর সাথে একপ্রকার ছেলেমিপনা।

অতএব প্রথমে গুনাহ থেকে বাঁচার সংকল্প কর এবং সংকল্পের অনুকূলে পদক্ষেপ নাও, সঙ্গে-সঙ্গে দুআও করতে থাক, তাহলে সে দুআ কবুল হবেই। হিম্মতের ব্যবহার এবং দুআর ব্যবহার– এ দু'য়ের সম্মিলন ঘটলেই নেক আমল করতে পারবে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

“বিসমিল্লাহ’র মধ্যে এক মহান দর্শন রয়েছে। ‘বিসমিল্লাহ’ মূলত এ শিক্ষা দেয় যে, যে লোকমাটি মুহূর্তের মধ্যে তুমি গলাধঃকরণ করলে, তা তোমার নিকট পৌঁছুতে বিশ্বজগতের কত শক্তি ব্যয় হয়েছে। চিন্তা করে দেখ, এক টুকরা রুটি কিভাবে পৌঁছলো তোমার হাতে? কৃষক বীজ বপন করার পূর্বে জমি চাষযোগ্য করার জন্য কিছুদিন বলদ দ্বারা হাল চাষ করেছে। এরপর বীজ বপন করেছে। এতটুকু ছিলো কৃষকের কাজ। তারপর কোন সেই সত্তা, যিনি মাটির সেই ছোট বীজের মধ্যে এমন উৎপাদনযন্ত্র লাগিয়েছেন যে, তাতে অঙ্কুর ছুটে বের হয়? কে সেই সত্তা, যিনি শক্ত মাটির পরতের মধ্যে অঙ্কুরকে লালন করে এমন শক্তি দান করেন যে, তার কৃশ দেহের কোমল কিশলয় মাটির আবরণ ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং শস্য-শ্যামল ক্ষেতের রূপ লাভ করে? কে তাকে আন্দোলিত বাতাসের ক্রোড় জোগাড় করে দেন? তার উপর মেঘের সামিয়ানা টাঙিয়ে রোদের ঝলসানো থেকে রক্ষা করেন? কে সেই সত্তা, যিনি প্রয়োজন মাফিক চন্দ্র-সূর্যের কিরণ তার উপর বিকিরণ করেন? প্রয়োজনে বারি বর্ষণ করে তার প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি করেন? অবশেষে এক একটি জমিতে শত শত শীষ তৈরি করেন এবং এক একটি দানা থেকে শত শত দানা সৃষ্টি করেন, কে সেই সত্তা?

খাওয়ার আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ

عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِيْ
حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي
الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ
بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (صحيح بخاري، كتاب الاطعمة، باب التسمية
على الطعام، حديث نمبر ٥٣٧٦)

হামদ ও সালাতের পর!

ইতোপূর্বে আপনাদের সামনে আরজ করে এসেছি, আজ পুনরায় স্মরণ রিয়ে দিচ্ছি যে, ইসলামের বিধি-বিধান পাঁচ প্রকার। যথা– আকাঈদ, ইবাদাত, আমালাত ও আখলাক। গোটা দ্বীন এ পাঁচটি সূচিতে বিভক্ত। এর কোনো টিও বাদ দেয়ার অবকাশ নেই।

অতএব, ঈমান-আকীদা দুরস্ত হতে হবে। ইবাদত সঠিক হতে হবে। ন-দেন, কাজ-কারবার স্বচ্ছ হতে হবে। আখলাক পরিশুদ্ধ হতে হবে। মাজিক জীবনাচার সুন্দর ও পবিত্র হতে হবে। শেষোক্তটির নাম মু'আশারাত। আশারাত দ্বীনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা কখনো বিনষ্ট করা যাবে না।

অনুপম জীবনাচার– যা না হলেই নয়

এ যাবত আখলাকের আলোচনা সর্বাধিক করে আসছি। এরই মাঝে ইমাম রী (রহ.) আরেকটি পরিচ্ছেদের সূচনা করলেন এবং দ্বীনের এমন সব হাদীস

উল্লেখ করলেন, যেগুলোর বিষয়বস্তু হলো– মু'আশারাত। একে অপরের সঙ্গে জীবনযাপন করার সুবাদে যেসব নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার প্রয়োজন হয়, তারই নাম 'মু'আশারাত'। তথা জীবন যাপনের সহীহ তরীকা, পানাহারের দাবি ও চাহিদা, বাইরের চলাফেরা, কথাবার্তা ও আদব-কায়দা, আবাসনের উঠাবসা ইত্যাদির প্রতিটির শাখা-প্রশাখাকে এক কথায় বলা হয় মু'আশারাত।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন, বর্তমানে মু'আশারাত একটি উপেক্ষিত বিষয়। মানুষ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদাসীনতা দেখাচ্ছে এবং দ্বীনের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করছে। এমনকি যাদের নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াত, তাসবীহাত ও যিকির-আযকার নিয়মিত, তাদের মু'আশারাতও আজ শরীয়ত বহির্ভূত। ফলে তাদের দ্বীন-ধর্ম অঙ্গহীন ও অপূর্ণ।

এ কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, যার উপর আমল করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

নবীজী (সা.) সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন

মু'আশারাত সম্পর্কে আল্লামা নববী (রহ.) সর্বপ্রথম খাওয়ার অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) প্রতিটি বিষয়ের ন্যায় পানাহারের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। একবার জনৈক মুশরিক ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)কে বলেছিলেন–

إِنِّيْ أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ - قَالَ أَجَلْ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيْ بِأَيْمَانِنَا (ابن ماجه، كتاب الجهارة، باب الاستنجاء بالحجارة)

"তোমাদের নবী দেখি তোমাদেরকে সবকিছুই শিখিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার রীতি-নীতিও।"

লোকটার উদ্দেশ্য ছিলো খুঁত ধরা। অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার কথাও কি কেউ কাউকে বলে দেয়? এটাও কি আবার শিক্ষাদানের বিষয়? লোকটা ভেবেছিলো, এতো এমন কোনো আহামরি বিষয় নয় যে, নবীর মতো ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে।

সালমান ফারসী (রা.) লোকটিকে বললেন, দেখো, তুমি যে বিষয়টিকে লজ্জাজনক ভাবছো, তা আমাদের কাছে গৌরবজনক। অর্থাৎ তিনি আমাদের দয়ালু নবী। যিনি আমাদেরকে সবকিছুই শিখিয়েছেন। এমনটি পেশাব-পায়খানার রীতি-নীতিও। যেন আমরা পবিত্র কাবার দিকে ফিরে কিংবা ডান

হাতে কাজটি না করি। মাতা-পিতা তাদের ছেলেমেয়েকে যেমনিভাবে সবকিছু শিখিয়ে থাকেন, অনুরূপ আমাদের নবীও আমাদেরকে প্রতিটি বিষয়ের দিঙনির্দেশনা দিয়েছেন। মাতা-পিতা যদি অহেতুক লজ্জাবশত সন্তানকে পেশাব-পায়খানার সহীহ তরীকা শিক্ষা না দেয়, তাহলে পুরা জীবনেও সে শিষ্টাচার শিখতে পারবে না। মাতা-পিতার চেয়ে শতগুণ অধিক রহমদিল আমাদের প্রিয়নবী (সা.)। তাই তিনি খুটিনাটি সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। পানাহার এটির মধ্যে অন্যতম। তাঁর বাতলানো পদ্ধতিতে পানাহার করলে তা নিছক পানাহার থাকে না, বরং ইবাদতে পরিণত হয়, সাওয়াবের উপলক্ষ্য হয়।

খাওয়ার তিন আদব

আমর ইবনে সালামা (রা.) বলেছেন, নবীজী (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নিবে। অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' পড়ে খাওয়া শুরু করবে। ডান হাতে খাবে। তোমার নিকটবর্তী অংশ থেকে খাবে। হাত বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে খানা খাবে না।

আলোচ্য হাদীসটিতে খাওয়ার তিনটি আদব সুস্পষ্ট। প্রথম আদব– বিসমিল্লাহ পড়ে খানা শুরু করা। অপর হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাম স্মরণ করে খাওয়া শুরু করবে। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ভুলে গেলে খাওয়া চলাকালীন যখনই স্মরণে পড়বে, তখনই পড়ে নিবে। আর তা এভাবে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (ابو داؤد، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٣٧٦٧)

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। সূচনাতে এবং যবনিকাতেও।"

শয়তানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো না

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশকালে এবং খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়, বিতাড়িত শয়তান তার সাঙ্গ-চেলাদের বলতে থাকে, এ ঘরে তোমাদের রাত যাপনের সুযোগ নেই। কারণ, ঘরের মালিক প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নিয়েছে, খাওয়ার সময়ও তাঁর নাম জপেছে, সুতরাং শয়তানের কপালে হাত, তার সকল আশা-ভরসা সম্পূর্ণ মিটে গেছে। পক্ষান্তরে ঘরে প্রবেশকালে কিংবা খাওয়ার শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ পড়া না হয়, শয়তান আনন্দে নেচে উঠে। সাঙ্গ-পাঙ্গদের জানিয়ে দেয়, তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, খাওয়ার ব্যবস্থাও ভাগ্যে জুটেছে, যেহেতু এ লোকটি বিসমিল্লাহ পড়েনি, সুতরাং আশাও মিটে যায়নি। (আবু দাউদ, কিতাবুল আত'ইমা, হাদীস নং ৩৭৬৫)

মোটকথা, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, আল্লাহর নাম না নিলে শয়তানের অধিকার সাব্যস্ত হয়। ফলে শয়তান সহজেই নিজের জায়গা করে নেয়। গুনাহকে সে মনোহারী করে তোলে। মন-মগজে ইতিউতি করে। দ্বিধা, সংশয় ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে। শয়তান অধিকার করে নেয়– এর অর্থ হলো, বরকত চলে যায়। সে খানা হয়তো জিহ্বা সিক্ত করে, কিন্তু বরকত ও নূর সৃষ্টি করতে পারে না।

ঘরে প্রবেশের দু'আ

এখানে রাসূল (সা.) দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। একটি হলো, ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেওয়া। এ সুবাদে চমৎকার একটি দু'আ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিলো ঘরে প্রবেশকালে দু'আটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (ابو داؤد، كتاب الأداب، رقم الحديث ٥٩٦)

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবেশ প্রার্থনা করছি।" অর্থাৎ– আমার প্রবেশ যেন কল্যাণসমৃদ্ধ হয় এবং ঘর থেকে যখন বের হই, তাও যেন কল্যাণসমৃদ্ধ হয়।

সাধারণত মানুষ বাইরে থাকাকালীন ঘরের খোঁজখবরে একটু ঢিলেমি আসে। ফলে একটা অজানা শঙ্কা মনের মাঝে কাজ করে। দ্বীনী কিংবা দুনিয়াবী দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই ঘরে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ চেয়ে নেবে, যেন বিব্রতকর পরিস্থিতির পরিবর্তে সুখকর পরিস্থিতি মিলে।

পুনরায় যখন প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বের হবে, তখনও যেন এ বের হওয়া সুখকর হয়। হতাশা, দুর্দশার যেন সাক্ষাৎ না হয়। যেমন– ঘরে ফিরে দেখা গেলো, স্ত্রী অসুস্থ, তাই তার চিকিৎসার জন্য বের হতে হলো অথবা বাড়িতে কোনো সমস্যা দেখা দিলো, সমাধানের জন্য দৌড় দিতে হলো– এরূপ বের হওয়া কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই এ থেকে নিরাপদে থাকতে হলে দু'আ করে নেবে। এ লক্ষ্যেই রাসূল (সা.) উক্ত দু'আটি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। দু'আটি মুখস্থ করে বাসার দরজায় লিখে রাখা যায়। দু'আটি পাঠ করলে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। সে মুষড়ে পড়ে এবং বলে, আমার জন্য এ ঘরে থাকার আর সুযোগ নেই। তাছাড়া দু'আটি দুনিয়াতে যেমন উপকারী, আখেরাতের জন্যও তেমন সাওয়াবের উপযোগী।

খাওয়ার সূচনা করবে বড়জন

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খানায় শরীক হতাম, আমাদের নিয়ম ছিলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়া শুরু করার পূর্বে আমরা খাদ্যের প্রতি হাত বাড়াতাম না, বরং অপেক্ষা করতাম। তারপর তিনি শুরু করলে আমরাও শুরু করতাম।

এ হাদীস থেকে ফকীহগণ এ মাসআলা চয়ন করেছেন, যখন কেউ বয়সে অপেক্ষাকৃত বড় কারো সঙ্গে একই দস্তরখানে বসবে, তখন আদব হলো, যে বয়সে বড় তাকে প্রথমে খাওয়া শুরু করতে দেয়া।

শয়তান নিজের জন্য খাবার হালাল করতে চায়

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে এক কিশোরী দৌড়ে এলো। তাকে খুব ক্ষুধার্ত মনে হলো। কেউ তখনও খাওয়া শুরু করেনি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) এখনও শুরু করেননি। মেয়েটি তড়িঘড়ি করে খাবারের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঝট করে তার হাত ধরে ফেললেন এবং খাওয়া থেকে বিরত রাখলেন এবং কিছুক্ষণ পর এক গ্রাম্য ব্যক্তি এলো। তাকে ক্ষুধায় কাতর মনে হলো। খাবারের দিকে সেও হাত বাড়াচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাতও ধরে ফেললেন এবং খাবার থেকে বিরত রাখলেন। এরপর উপস্থিত সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন–

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهٖ، فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ، وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ اِنَّ يَدَهٗ فِیْ يَدِیْ مَعَ يَدِهَا

(صحیح مسلم، كتاب الاشربة، رقم الحديث ٤٠١٨)

"অর্থাৎ– শয়তান খাবারে এভাবে ভাগ বসাতে চায়, যাতে তাতে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়। তাই সে এ মেয়ের মাধ্যমে খাবার হালাল করার চেষ্টা করলো, কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর শয়তান খাবার হালাল করার উদ্দেশ্যে এ গ্রাম্য ব্যক্তির রূপ ধরে আসলো, কিন্তু এবারও সে আমার কাছে ধরা খেয়ে গেলো। আল্লাহর কসম! এ মেয়েটির হাতের সাথে এ মুহূর্তে শয়তানের হাতটিও আমার হাতে ধৃত রয়েছে।"

ছোটদের প্রতি খেয়াল রাখবে

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইঙ্গিত করেছেন, বড়দের কর্তব্য হলো– তাদের উপস্থিতিতে যদি ছোটরা আল্লাহর নাম নেয়া ছাড়া খাওয়া শুরু করে, তবে তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। প্রয়োজনে হাত ধরে ফেলবে এবং বলবে, প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলো, তারপর খাও।

কিন্তু আজ আমাদের সমাজে ছোটদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না– তারা ইসলামের শিষ্টাচার পালন করছে কিনা। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীসে এ শিক্ষা দিলেন, বড়দের কর্তব্য হলো, ছোটদেরকে শিষ্টাচার শেখানো, তাদের ইসলামী তাহযীবের ছায়াতলে গড়ে এবং প্রয়োজনে ভুল শুধরে দেয়া। অন্যথায় বরকত থেকে সকলেই বঞ্চিত হয়ে যাবে।

শয়তান বমি করে দিলো

হযরত উমাইয়া ইবনে মাহশী (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। পাশেই এক ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' না বলে খাবার খাচ্ছিলো এবং সবগুলো খাবার সাবাড় করে দিলো। সর্বশেষ লোকমাটি শুধু অবশিষ্ট ছিলো। এ লোকমাটিও খাওয়ার জন্য যখন হাত উত্তোলন করলো, তখন 'বিসমিল্লাহ' পড়ার কথা স্মরণ হলো। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, কেউ খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ বলে নিবে। তাই এ ব্যক্তি দু'আটি পড়ে নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হেসে বললেন, তুমি যখন বিসমিল্লাহ না বলে খাবার খাচ্ছিলে, শয়তানও তোমার সঙ্গে খাচ্ছিলো। স্মরণ হওয়ার পর যখন বিসমিল্লাহ পড়ে নিলে, শয়তান যা খেয়েছিলো তা বমি করে দিলো। ফলে খাবারে তার যে অংশ ছিলো তা বিলীন হয়ে গেলো।

রাসূল (সা.) এ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করে হেসে দিলেন এবং এ দিকে ইঙ্গিত করলেন, কোনো ব্যক্তি খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে, স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ পড়ে নিবে। তাহলে তার খাবারের বেবরকতি দূর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৮)

খাদ্য আল্লাহর দান

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। যদিও এটি একটি সাধারণ বিষয় মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করলে প্রতিভাত হয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত! এর উসিলায় খাদ্যগ্রহণও 'ইবাদত' ও সাওয়াব

লাভের 'মাধ্যম'-এ পরিণত হয়। উপরন্তু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা মারিফাতের এক বিশাল দ্বারও উন্মোচিত হয়। কেননা, বিসমিল্লাহ উচ্চারণকারী প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করে যে, আমার সম্মুখে যে খাবার এসেছে, তা আমার ক্ষমতা বা যোগ্যতার বিনিময়ে আসেনি। বরং এটা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমার এ সাধ্য ছিলো না যে, আমি খাবার প্রস্তুত করবো, এর দ্বারা প্রয়োজন মেটাবো এবং ক্ষুধা নিবারণ করবো। এসবই বরং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তাঁরই কুদরত, দয়া ও একান্ত অনুগ্রহে এ খাবার আমার সামনে এসেছে।

এ খাবার তোমার কাছে কীভাবে আসলো?

আসলে এ 'বিসমিল্লাহ'র মধ্যে এক মহান দর্শন রয়েছে। 'বিসমিল্লাহ' মূলত এ শিক্ষা দেয় যে, যে লোকমাটি মুহূর্তের মধ্যে তুমি গলাধঃকরণ করলে, তা তোমার নিকট পৌঁছুতে বিশ্বজগতের কত শক্তি ব্যয় হয়েছে। চিন্তা করে দেখ, এক টুকরা রুটি কিভাবে পৌঁছলো তোমার হাতে? কৃষক বীজ বপন করার পূর্বে জমি চাষযোগ্য করার জন্য কিছুদিন বলদ দ্বারা হাল চাষ করেছে। এরপর বীজ বপন করেছে। এতটুকু ছিলো কৃষকের কাজ। তারপর কোন সেই সত্ত্বা, যিনি মাটির সেই ছোট বীজের মধ্যে এমন উৎপাদনযন্ত্র লাগিয়েছেন যে, তাতে অঙ্কুর ফুটে বের হয়? কে সেই সত্ত্বা, যিনি শক্ত মাটির পরতের মধ্যে অঙ্কুরকে লালন করে এমন শক্তি দান করেন যে, তার কৃশ দেহের কোমল কিশলয় মাটির আবরণ ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং শস্য-শ্যামল ক্ষেতের রূপ লাভ করে? কে তাকে আন্দোলিত বাতাসের ক্রোড় জোগাড় করে দেন? তার উপর মেঘের সামিয়ানা টাঙিয়ে রোদের ঝলসানো থেকে রক্ষা করেন? কে সেই সত্ত্বা, যিনি প্রয়োজন মাফিক চন্দ্র-সূর্যের কিরণ তার উপর বিকিরণ করেন? প্রয়োজনে বারি বর্ষণ করে তার প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি করেন? অবশেষে এক একটি জমিতে শত শত শীষ তৈরি করেন এবং এক একটি দানা থেকে শত শত দানা সৃষ্টি করেন, কে সেই সত্ত্বা?

চিন্তা করে দেখো, তোমার কি ক্ষমতা আছে যে, এসব মাখলুকের শক্তি ব্যয় করে এক লোকমা খাবার তৈরি করে মুখে দিবে? আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ কি তোমার ক্ষমতায় রয়েছে? সূর্যের আলো কি তোমার ক্ষমতায় রয়েছে? দুর্বল অঙ্কুরকে মাটির উপর উত্থিত করার ক্ষমতা কার? আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন–

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

একটু চিন্তা কর, যে বীজ তোমরা যমীনে ফেলে আস। তা কি তোমরা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? তোমরা এর জন্য যত অর্থ ব্যয় কর না কেন,

যত কৌশল কাজে লাগাও না কেন, এরপরেও এতসব কিছু তোমাদের সাধ্যের ভেতর ছিলো না। সুতরাং একটু চিন্তা করে এ খাবার গ্রহণ কর, তাহলে এ খাবার গ্রহণও তোমার জন্য ইবাদতে পরিগণিত হবে। খাবারের এ লোকমাটি তোমার বাহুবলে লাভ করতে পারনি; বরং এটা মহান দাতার দান, যিনি এ খাদ্য তোমার নিকট পৌছানোর জন্য বিশ্বজগতের বিশাল ও বিপুল শক্তিতে তোমার অধীন করে দিয়েছেন। তাই লোকমা গ্রহণকালে সেই মহান দাতাকে ভুলে যেয়ো না।

মুসলমান এবং কাফেরের খাবারের মধ্যে পার্থক্য

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, আসলে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের নামই হচ্ছে দ্বীন। দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করে নিলেই দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। যেমন খাবার আল্লাহর নেয়ামত- একথা চিন্তা না করে এবং বিসমিল্লাহ না বলে খেয়ে ফেললে তোমার ও কাফেরের খাবার গ্রহণে কোনো তফাৎ থাকলো না। কারণ, কাফেররাও খানা খায়, তোমরাও খাও। তারাও ক্ষুধা মেটায়, তোমরাও মেটাও। তারাও স্বাদ আস্বাদন করে, তোমরাও কর। এই যদি তোমার অবস্থা, তাহলে তুমি নিছক পার্থিব প্রয়োজনে খাবার গ্রহণ করলে বিধায় তোমার খানার সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক রইলো না। কাফের ও তোমার খানার মাঝে কোনো ব্যবধান থাকলো না। যেমন গরু, মহিষ, মেষ খাবার গ্রহণ করছে, তদ্রূপ তুমিও খাবার গ্রহণ করেছো- তোমাদের দু'জনের খাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলো না।

অধিক আহার কোনো যোগ্যতার পরিচয় বহন করে না

এ বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর একটি বিরাট রহস্যপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। তাঁর যুগে আর্য সমাজের হিন্দু সম্প্রদায় ইসলামের বিরাট অপপ্রচার চালাচ্ছিলো। হযরত নানুতুবী ওই আর্য সমাজের সাথে মুনাযারা করতেন, যেন মানুষের সামনে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। একবার তিনি এক মুনাযারার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে আর্য সমাজের একজন পণ্ডিতের সঙ্গে মুনাযারা ছিলো। মুনাযারার পূর্বে খানা-পিনার আয়োজন করা হলো, অভ্যাস অনুযায়ী হযরত নানুতুবী সামান্য কিছু খেয়ে উঠে গেলেন। অপর দিকে আর্য হিন্দু পণ্ডিত অতি ভোজনে অভ্যস্ত ছিলো বিধায় খুব পেট ভরে খাবার খেলো। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে নিমন্ত্রণকারী বললো, মাওলানা! আপনি খুব সামান্য খাবার খেলেন। হযরত নানুতুবী উত্তরে দিলেন, যতটুকু চাহিদা ছিলো ততটুকু খেয়েছি। পণ্ডিতজী পাশ থেকে বলে উঠলো, আপনি যেহেতু খাওয়ায় হেরে গেলেন, সুতরাং বিতর্কেও হেরে যাবেন। হযরত

নানুতুবী জবাব দিলেন, যদি খাওয়ার প্রতিযোগিতা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার সাথে করার কী প্রয়োজন ছিলো? কোনো গরু কিংবা মহিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলেই তো হতো। গরু-মহিষের সঙ্গে খাওয়ার প্রতিযোগিতা হলে অবশ্যই আপনি হেরে যাবেন। আমি খাওয়ার প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে আসিনি, বরং আপনার ভ্রান্তি যুক্তিগুলো খণ্ডন করার লক্ষ্যে এসেছি।

পশু ও মানুষের মাঝে ব্যবধান

হযরত নানুতুবী (রহ.)-এর উত্তরে প্রচ্ছন্নভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, একটু বিবেক খরচ করলেই দেখা যাবে, খানা-পিনার বেলায় মানুষ ও পশুতে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। পশুরাও খায়, মানুষও খায়। আর আল্লাহ তাআলা সকল প্রাণীকেই রিযিক দান করেন, এমনকি অনেক সময় মানুষের চেয়েও উন্নত রিযিক দান করেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মানুষ খায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে। পশু-পাখি এ কাজটি করতে পারে না। এটাই হলো, মানুষ ও পশুর মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান।

সুলায়মান (আ.) কর্তৃক সৃষ্টিকূলকে দাওয়াত প্রদান

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.)কে পুরা দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছিলেন। একবার তিনি সমস্ত সৃষ্টি জীবকে এক বছর পর্যন্ত খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, সুলায়মান! এটা তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না। সুলায়মান (আ.) এক মাসের জন্য আবেদন জানালেন। জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, এটাও তুমি পারবে না। অবশেষে এক দিনের মেহমানদারীর জন্য আবেদন করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটাও তোমার সাধ্যে কুলাবে না। তবুও তোমার আবেদন রক্ষার্থে কবুল করে নিলাম।

অনুমতি পেয়ে হযরত সুলায়মান (আ.) খুব খুশি হলেন। অসংখ্য মানব ও জীনকে খাবার প্রস্তুতের কাজে লাগিয়ে দিলেন। কয়েক মাস ব্যাপী প্রস্তুতি কর্ম চললো, তারপর সমুদ্রতীরে দস্তরখান বিছানো হলো। সেখানে খাবার পরিবেশন করা হলো। আর তিনি বাতাসকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, খাবার যেন নষ্ট না হয়- সেজন্য নদীর তীর দিয়ে প্রবাহিত হতে।

সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হলো, তখন তিনি আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! খানা প্রস্তুত হয়েছে। এখন আপনি আপনার সৃষ্টিজীবের একটি দল পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, আমি প্রথমে সমুদ্র থেকে একটি মাছ পাঠাচ্ছি। ফলে সমুদ্র থেকে একটি মাছ উঠে এলো এবং সুলায়মান (আ.)কে বললো, জানতে পারলাম, আজ নাকি আপনি দাওয়াত দিয়েছেন। সুলায়মান (আ.) বললেন, দস্তরখানে যাও,

সেখান থেকে খাও। মাছটি দস্তরখানের একপ্রান্ত থেকে খানা শুরু করলো এবং অপর প্রান্তে পৌছা পর্যন্ত একাই সব খানা সাবাড় করে দিয়ে বললো, আরো চাই। সুলায়মান (আ.) উত্তর দিলেন, সব খানা তো তুমি একাই খেয়ে ফেলেছ, এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মাছ বললো, মেজবানের পক্ষ থেকে এমন উত্তর দেয়া কি উচিত? আমি যে দিন সৃষ্টি হয়েছি, সে দিন থেকে আমার প্রতিপালক আমাকে পেট ভরে খাবার দিয়েছেন। আজ তোমার দাওয়াতে এসেছি, অথচ আমার ক্ষুধা মিটেনি। তোমার প্রস্তুতকৃত সকল খাবারেরও দ্বিগুণ আমি প্রতিদিন খাই। আমার আল্লাহ আমাকে খাওয়ান। একথা শুনে হযরত সুলায়মান (আ.) সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

(নাফহাতুল আরব)

খাওয়ার পর শোকর আদায় কর

সকল সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা আল্লাহ তাআলা। সমুদ্রের গভীর তলদেশে বসবাসকারী প্রাণীকেও তিনি রিযিক দান করেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীর বুকে এমন বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেননি।" (সূরা হুদ : ৬)

সুতরাং প্রমাণিত হলো, রিযিক প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কোনো বৈষম্য করেন না। যারা আল্লাহর দুশমন, তাদেরকেও তিনি রিযিক দান করেন। অথচ তারা আল্লাহকে মানে না; বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে হঠকারিতা প্রদর্শন করে। এরপরেও আল্লাহ তাদেরকে রিযিক দান করেন। অতএব, খাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? প্রকৃত পার্থক্য হলো, জীব-জন্তু ও কাফির-মুশরিকরা খাদ্য গ্রহণ করে ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে। তাই তারা খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় না। আর তোমরা তো মুসলমান। তোমরা একটু খেয়াল করে আল্লাহর নাম নিয়ে আহার কর। খাওয়ার পর তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। 'আলহামদু লিল্লাহ' বলো। তাহলে এ খাবার গ্রহণও তোমাদের জন্য ইবাদত হয়ে যাবে।

দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ কর

ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি কথা বলতেন। বছরের পর বছর আমি এর উপর আমল করেছি। যেমন কোনো ব্যক্তি ঘরে গেলো, খাবারের সময় হলো,

দস্তরখানে গিয়ে বসে পড়লো এবং খাবার সামনে আনা হলো। ক্ষুধায় তার পেট চোঁ-চোঁ করছে, খাবারও খুব তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। মন চায় খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে। কিন্তু সে তা করলো না; এক মুহূর্ত বিলম্ব করলো এবং ভাবলো, এ খাবার আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। আল্লাহর বিশেষ দান। আমার বাহুবলে এটি আসেনি। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার সামনে এলে শোকর আদায় করতেন, তারপর খানা খেতেন। তাই আমিও তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহর নাম নিয়ে আহার করবো। এভাবে ভাবো, তারপর বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে দাও।

অনুরূপভাবে ঘরে ফেরার পর তুমি দেখলে, ফুলের মত শিশুটি খেলছে। মন চাচ্ছে, তাকে কোলে তুলে নিবে, আদর করবে। কিন্তু তুমি ক্ষণিকের জন্য থেমে গেলে। ভাবলে, শুধু মন খুশির জন্য শিশুটিকে কোলে নিবো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদেরকে স্নেহ করতেন, কোলে তুলে নিতেন, চুমো খেতেন। আমি তাঁর সুন্নাতেরই অনুসরণে শিশুকে কোলে নিবো। হযরত বলতেন, এই অনুশীলন আমি বছরের পর বছর ধরে করেছি। এরপর তিনি এই কবিতাটি শোনাতেন-

جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں
کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

"যুগ-যুগ ধরে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কলিজা পানি করে ফেলেছি, চির অভ্যাসের বন্ধনমুক্ত হওয়া কি অত সহজ!"

বছরের পর বছর অনুশীলন করে এ অভ্যাস গড়ে তুলেছি। এখন 'আলহামদুলিল্লাহ' অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এখন থেকে যখনই কোনো নেয়ামত সামনে আসে, তখনই মনোযোগ প্রথমে এ দিকে আকৃষ্ট হয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তারপর তাঁর শোকর আদায় করে কাজ সম্পন্ন করে ফেলি। আর একেই বলা হয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এর ফলে পার্থিব বিষয়ও দ্বীনের অংশে পরিণত হয়ে যায়।

খাবার একটি নেয়ামত

একদিন শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর সঙ্গে এক দাওয়াতে গিয়েছিলাম। খাওয়া শুরু হলে হযরত বললেন, তোমরা একটু চিন্তা কর, এই যে খাবার যা তোমরা এখন খাচ্ছো, এতে আল্লাহর কত নেয়ামত রয়েছে। প্রথমত খাবারই স্বতন্ত্র একটি নেয়ামত। কেননা, মানুষ যখন ক্ষুধার তাড়নায় তাড়িত হয়, তখন

খাবার ভালো হোক কিংবা মন্দ, সুস্বাদু হোক বা না হোক, সে তা গনীমত মনে করে আহার করে এবং ক্ষুধা নিবারণ করে। সুতরাং স্বয়ং খাবারই একটি নেয়ামত।

দ্বিতীয় নেয়ামত খাবারের স্বাদ

খাবার সুস্বাদু ও পছন্দসই দ্বিতীয় নেয়ামত। কেননা, খাবার মজাদার ও পছন্দনীয় না হলে ক্ষুধা নিবারণ হবে বটে, তবে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় নেয়ামত সম্মানের সাথে খাবার লাভ করা

তৃতীয় নেয়ামত হলো, নিমন্ত্রণকারী মেহমানকে সম্মানের সাথে খাবার খাওয়ানো। কেননা, উপস্থিত খাবার যত উন্নত ও তৃপ্তিদায়কই হোক না কেন, নিমন্ত্রণকারী যদি চাকরের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহলে সে খাবার তৃপ্তি দিতে পারবে না। অসম্মানের সাথে খাবার খেতে দিলে মজাদার খাবারও বিস্বাদে পরিণত হয়।

কবির ভাষায়–

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

"রিযিক যদি লাঞ্ছনার হয়, এমন রিযিকের চেয়ে মওতই উত্তম। জীবনাচার পিছিয়ে দেয়, এমন রিযিকের চেয়েও মরে যাওয়াই ভালো।"

'আলহামদুলিল্লাহ' এ তৃতীয় নেয়ামত আমরা পাচ্ছি। লাঞ্ছনার রিযিক নয়; বরং সম্মানের রিযিকই আমরা খাচ্ছি।

চতুর্থ নেয়ামত ক্ষুধা লাগা

খাওয়ার চাহিদা সৃষ্টি হওয়া ও ক্ষুধা অনুভূত হওয়া– চতুর্থ নেয়ামত। কারণ, খাবার উপস্থিত হলো এবং তা সুস্বাদুও হলো। মেযবানও সম্মানের সাথেই খাওয়ালো। কিন্তু ক্ষুধা মন্দা এবং পরিপাকযন্ত্র অকার্যকর। এ অবস্থায় উন্নত থেকে উন্নততর খাবারও ভালো লাগবে না। যেহেতু এ অবস্থায় খাবার খাওয়া যায় না। 'আলহামদুলিল্লাহ' আমাদের খাবার সুস্বাদু। আপ্যায়নকারীও যথেষ্ট আপ্যায়ন করছেন, পর্যাপ্ত ক্ষুধা ও চাহিদাও আমাদের আছে।

পঞ্চম নেয়ামত স্থিরতার সাথে খাওয়া

পঞ্চম নেয়ামত হলো, স্বস্তির সাথে খাওয়া। কেননা, খাবার সুস্বাদু হলো বটে, আপ্যায়নকারীও ইজ্জতের সাথে খাওয়ালো, সাথে সাথে ক্ষুধাও লাগলো। কিন্তু এমন অস্থিরতা কিংবা দুশ্চিন্তা বিনা মেঘে বজ্রপাতের এসে গেলো। ফলে মন-মস্তিষ্কে দুশ্চিন্তা ছেয়ে গেলো এবং স্বস্তি ও স্থিরতা উবে গেলো। এমতাবস্থায় যতই ক্ষুধা থাক; খাবার ভালো লাগবে না। 'আলহামদুলিল্লাহ' আমাদের স্বস্তিও আছে, এমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই– যার কারণে খাবার বিস্বাদে পরিণত হবে।

ষষ্ঠ নেয়ামত প্রিয়জনদের সাথে খাওয়া

ষষ্ঠ নেয়ামত হলো, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে এক সাথে বসে খাওয়া। কেননা, উল্লিখিত পাঁচটি নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও যদি একাকী বসে খেতে হয়, খাবার মজা লাগে না। কারণ, প্রিয়জনদের সাথে বসে খানা খাওয়ার মাঝে এক আলাদা তৃপ্তি আছে। সুতরাং এটাও স্বতন্ত্র এক নেয়ামত। তাই ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, এ খাবার স্বয়ং একটি নেয়ামত, যে নেয়ামত আরো অনেক নেয়ামত বুকে নিয়ে আছে। এরপরেও কি আল্লাহ তাআলার এসব নেয়ামতের শোকরগুজার হবে না?

খাবার অনেক ইবাদতের সমষ্টি

বোঝা গেলো, খাবার অনেক ইবাদতের সমষ্টি। সুতরাং এ খাবারকে মহান আল্লাহর নেয়ামত মনে করে বিনয়ের সঙ্গে খেতে হবে। খাবারের এ নেয়ামত যখন শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করবে, তখন ক্ষুধাও মিটবে, উপরন্তু ইবাদতের সাওয়াবও পাওয়া যাবে। কারণ, শুধু বিসমিল্লাহর সাথে আরম্ভ করে, তার মাঝে আল্লাহর দেয়া অন্যান্য নেয়ামতের কথা স্মরণ না করলেও এ খাওয়া ইবাদতে গণ্য হতো। কিন্তু খাওয়ার মধ্যে বিদ্যমান সমূহ নেয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে খাবার গ্রহণ করলে তাতো অনেক ইবাদতের সমষ্টি হলো। একেই বলে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এর মাধ্যমে মুমিনের দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেছিলেন–

آبر و باد و مہ و خورشید ہمہ در کارند
تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

(گلستاں سعدی رح)

আল্লাহ তাআলা এ আসমান, যমীন, মেঘমালা, চন্দ্র, সূর্যকে তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে যেন তোমরা রুটি-রিযিক আহরণ করতে পার। তবে কথা হলো, এ রিযিক তোমরা অবহেলাসহ গ্রহণ করো না। এটাই হলো তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলার নাম নিবে। খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ পড়ে নিবে।

নফল আমলের ক্ষতিপূরণ

শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার কোনো নফল আমল যথাসময়ে করার কথা ভুলে গেলে অথবা ওজরের কারণে তা আদায় করতে না পারলে, সে যেন মনে না করে, এখন তো নফল পড়ার সময় শেষ হয় গেছে, আর আদায় করতে হবে না। বরং পরে যখনই সুযোগ পাবে, তখনই আদায় করে নিবে।

একবার আমরা তাঁর সাথে মাহফিলে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। মাগরিবের পূর্বে সেখানে পৌছার কথা ছিলো। কিন্তু রওনা করতে আমাদের দেরি হয়ে গেলো। তাই মাগরিবের নামায পথে এক মসজিদে পড়ে নিই। যেহেতু লোকজন ওখানে অপেক্ষা করার সম্ভাবনা ছিলো, তাই হযরত শুধু তিন রাকাত ফরজ ও দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন। আমরাও তা-ই করলাম এবং দ্রুত রওনা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌছে গেলাম। মাহফিল শুরু হলো। রাত দশটা পর্যন্ত মাহফিল চললো। ইশার নামাযও আমরা সেখানেই পড়ে নিলাম।

অবশেষে ফেরার পূর্বে হযরত আমাদেরকে বললেন, আজকের মাগরিবের পরের আওয়াবীন কোথায় গেলো? আমরা বললাম, তাতো আজ তাড়াহুড়ার কারণে ছুটে গেলো। পড়ার সুযোগ হয়নি।

হযরত বললেন, ছুটে গেলো, কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ছুটে গেলো? বললাম, হযরত! যেহেতু লোকজন অপেক্ষা করছিলো, তাই জলদি পৌছার প্রয়োজন ছিলো। এ কারণেই আওয়াবীনের নামায ছুটে গেলো।

হযরত বললেন, 'আলহামদুল্লিাহ' ইশার নামায ও প্রতিদিনের আমল আদায় করার পর আমি অতিরিক্ত ছয় রাকাত নফলও আদায় করে নিয়েছি। আওয়াবীনের ওয়াক্ত না থাকার কারণে এখন যদিও তা আওয়াবীন নয়, তবুও ভাবলাম, আজকের ছুটে যাওয়া আওয়াবীনের একটা ক্ষতিপূরণ তো হওয়া দরকার। এ ছয় রাকাত পড়ে আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করেছি।

তারপর বললেন, তোমরা মৌলভী মানুষ। তাই এখনই হয়ত বলবে, নফল নামাযের কাযা হয় না। কাযা শুধু ফরয-ওয়াজিবের হয়; সুন্নাত ও নফলের হয় না। আপনি কিভাবে আওয়াবীনের কাযা আদায় করলেন?

শুনো ভাই, তোমরা কি ওই হাদীসটি পড়েছ, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা ভুলে যাও, তখন খাওয়ার মাঝে যখনই মনে পড়বে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নিবে। যদি খাওয়ার শেষ দিকে স্মরণ হয়, তখনই পড়ে নিবে।

এবার বলো, এ দু'আ পড়া কি ফরজ ছিলো? অবশ্যই না। তাহলে কেন তিনি বললেন, পড়ে নিয়ো?

আসল কথা হলো, যে কোনো নফল ও মুস্তাহাব অবশ্যই নেক আমল। এগুলোর মাধ্যমে আমলনামা সমৃদ্ধ হয়। যদিও কোনো কারণে এগুলো ছুটে যায়, তবুও একেবারে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং অন্য সময় আদায় করে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে যদিও 'কাযা' বলা কিংবা না বলার অবকাশ নেই, তবে কিছুটা ক্ষতিপূরণ তো অবশ্যই হয়।

এসব কথাই বুযুর্গদের কাছ থেকে শিখতে হয়। সে দিন হযরত আমাদের চোখ খুলে দিলেন। ফিকহশাস্ত্রের মাসআলা হলো, নফলের কাযা হয় না। মাসআলাটি যথাস্থানে সঠিক। তবে কথা হলো, কাযা না হলেও ক্ষতিপূরণ তো হয়। পরবর্তী সময়ে এ ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে নেয়ার কিছুটা অবকাশ তো অবশ্যই আছে। আল্লাহ তাআলা হযরতের মাকাম বুলন্দ করুন। আমীন।

দস্তরখান উঠানোর দু'আ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهٗ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ اِلَّا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٥٤٥٨)

অর্থাৎ– হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) দস্তরখান উঠানোর সময় এ দু'আ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সুন্দর দু'আটি শিক্ষা দেয়ার কারণ হলো, সাধারণত মানুষ যখন কোনো জিনিসের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে, তখন সেই প্রয়োজন

পূরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যখন প্রয়োজন মিটে যায়, ব্যাকুলতাও কেটে যায়, তখন ওই জিনিসের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। যেমন- কেউ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন সে খাওয়ার প্রতিও আগ্রহী হয়। কিন্তু যখন খাবার খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে, তখন দ্বিতীয়বার একই খাবার তার সামনে পেশ করা হলে খাবারের প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হয়। তাই রাসূল (সা.) এ দু'আর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, খাওয়া শেষে সাধারণ খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকে না। এর কারণে যেন আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত না হয়। কেননা, এ খাবারই আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করেছে এবং আমাদেরকে তৃপ্তি দিয়েছে। আর খাবারের প্রতি আমরা অনীহা প্রদর্শন করেও উঠছি না। হে আল্লাহ! আমরা খাবার থেকে বিমুখ নেই। কারণ, দ্বিতীয়বার পুনরায় খাবারের প্রয়োজন হবে।

দস্তরখান উঠানোর সময় এ দু'আ পড়লে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে। দ্বিতীয়ত এ দু'আও হয়ে যাবে যে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে পুনরায় নেয়ামত দান করেন।

খাওয়ার পর দু'আ করলে গুনাহ মাফ হয়

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ - غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ترمذى، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا فرغ من الطعام، رقم الحديث ٣٤٥٤)

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পর এই দু'আটি পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। দু'আর অর্থ হলো, সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাবার খাইয়েছেন। আমার চেষ্টা ও সাধনা ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।

এবার একটু ভেবে দেখুন। কত ছোট আমল। অথচ তার সাওয়াব হলো, পূর্বের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার কত বড় দয়া।

আমল ছোট, নেকী অনেক

যেসব আমল দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য হলো, তার দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হওয়া। কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। অনুরূপভাবে বান্দার হকও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ না করলে মাফ হয় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নেক আমলের বরকতে সগীরা গুনাহ মাফ করে দেন। এজন্যই খাবার পরে কেউ উক্ত দু'আ পড়লে তার বিগত সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেন। এটি একটি ছোট আমল, কিন্তু নেকী অনেক বেশি।

শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে একটি মূল্যবান দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। এখন আমরা সশব্দে পড়ি কিংবা ক্ষীণ শব্দে পড়ি অথবা মনে মনে পড়ি- আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় হয়ে যাবে এবং উক্ত নেয়ামতের উপযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

খাবারের দোষ ধরো না

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ - إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (صحيح البخارى، كتاب الاطعمة رقم الحديث ٥٤٠٩)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও খাবারের দোষ ধরতেন না। পছন্দ হলে খেয়ে নিতেন। পছন্দ না হলে খেতেন না; রেখে দিতেন। কিন্তু খাবারের দোষ বলতেন না। কেননা, যে কোনো খাবার আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক। আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক তা আল্লাহ তাআলার দান। আল্লাহপ্রদত্ত রিযিকের কদর করা আমাদের দায়িত্ব।

কুদরতের কারখানায় কোনো কিছুই নিরর্থক নয়

এ বিশ্ব-কারখানায় কোনো কিছুই এমন নয়,যাকে আল্লাহ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তু কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। প্রতিটি বস্তুই উপকারী। মরহুম ড. ইকবালের ভাষায়-

نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

"যামানার কোনো বস্তু অকর্মা নয়, বিশ্বের কোনো সৃষ্ট অহেতুক নয়।"

সৃষ্টিজগতভাবে সব বস্তুই উপকারী। হয়তো আমরা তা উদঘাটন করতে পারি না, বিধায় কিছু বস্তুকে 'অহেতুক' বলি। এমনকি সাপ-বিচ্ছুরও কাজ আছে। সৃষ্টিজগতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার বিচারে এদের মাঝেও উপকারিতা অবশ্যই আছে। আমরা তা জানি বা না জানি।

বাদশাহ ও মাছি

এক বাদশাহর ঘটনা। দরবারে তিনি শান ও সৌষ্ঠব নিয়ে বসে আছেন। কোত্থেকে একটি মাছি আসলো, তার নাকের ডগায় বসে পড়লো। মাছিটিকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সে গেলো বটে, পুনরায় ফিরে এসে সেখানেই বসলো। দ্বিতীয়বারও বাদশাহ তাড়িয়ে দিলেন। এতে তিনি বিরক্ত হলেন। বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন, মাছিকে কেন তিনি সৃষ্টি করলেন। এর কাজ তো দেখি শুধু কষ্ট দেয়া, কোনো উপকারে তো সে আসে না!

দরবারে তখন জনৈক বুযুর্গ ছিলেন। বললেন, জনাব! এ মাছির একটি কাজ তো এই যে, আপনার মত বাদশাহর দেমাগ ধোলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, আপনি নিজের নাকের ডগা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চাচ্ছেন, আপনি নিতান্তই দুর্বল। একটি তুচ্ছ মাছির মোকাবেলায়ও আপনি অসহায়। মাছির সৃষ্টির মাঝে লুকায়িত এ নিগূঢ় তত্ত্বই বা কম কিসের?

একটি বিস্ময়কর কাহিনী

ইমাম রাযী (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও কালাম শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাফসীরে কাবীর তাঁর সুবিশাল ও সুপ্রসিদ্ধ এক অনবদ্য রচনা। কেবল সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর করা হয়েছে দু'শ পৃষ্ঠাব্যাপী। সূরায়ে ফাতেহার প্রথম আয়াতের তাফসীর লিখতে গিয়ে তিনি একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন।

তিনি বলেন, বাগদাদের এক বুযুর্গের মুখে আমি ঘটনাটি শুনেছি। বুযুর্গ বলেন, কোনো এক বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে দজলা নদীর তীরে চলে গেলাম। নদীর পাড় ধরে হাঁটছিলাম, হঠাৎ একটি বিচ্ছু দেখতে পেলাম। ভাবলাম, নিশ্চয় এ বিচ্ছুকেও তো আল্লাহ তাআলা উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। জানি না, বিচ্ছুটি বের হলো কোত্থেকে? যাবে কোথায়? কী-ইবা করবে? মনে আমার বেশ কৌতুহল জাগলো, ভাবলাম– আজ আমার হাতে বেশ সময় আছে। সুতরাং আজ দেখবো, এটি যায় কোথায়, কী করে। বিচ্ছুটা আমার আগে আগে চলতে লাগলো। আমিও পিছে পিছে হাটা শুরু করলাম। একটু পর সে একেবারে সমুদ্রের কিনারে চলে গেলো। দেখতে পেলাম, একটি কচ্ছপ কিনারের দিকে

আসছে। বিচ্ছুটা এক লাফে কচ্ছপের পিঠে চড়ে বসলো। কচ্ছপ তাকে বহন করে নিয়ে চললো। আমিও একটি নৌকা নিয়ে কচ্ছপের পিছু নিলাম। আমার একটাই সংকল্প, আজ বিচ্ছুটার কাণ্ড দেখবোই। ইতোমধ্যে কচ্ছপ নদীর পাড়ে গিয়ে থামলো। অমনি বিচ্ছুটা লাফ দিয়ে তীরে গিয়ে নামলো। আমি বিচ্ছুর পেছনে পেছনে চললাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি গাছের ছায়ায় ঘুমুচ্ছে। শঙ্কিত হলাম, না-জানি বিচ্ছুটা লোকটিকে দংশন করে। ভাবলাম, লোকটিকে তুলে দিবো, যেন তার জীবন আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু লোকটির আরেকটু কাছে আসতেই দেখতে পেলাম, বিষাক্ত একটি সাপ লোকটির মাথার পাশে ফণা তুলে আছে। এক্ষুনি হয়তো দংশন করবে। এরই মধ্যে দেখতে পেলাম, বিচ্ছুটা দ্রুত অগ্রসর হলো এবং সাপের মাথায় হুল সিঁধিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সাপ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। আর বিচ্ছুটা অন্যদিকে রওনা হয়ে গেলো। ইত্যবকাশে লোকটির চোখ খুলে গেলো। দেখলো, একটি বিচ্ছু তার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। লোকটি একটি পাথর তুলে নিলো এবং বিচ্ছুর গায়ে ছুঁড়ে মারা কসরত করতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটা অবলোকন করছি। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ফেললাম। বললাম, এই বিচ্ছুটার কারণেই তো আজ তোমার জীবন বেঁচে গেলো। সে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলো, আর তুমি তাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছো! এই যে সাপটি দেখতে পাচ্ছ, এটি তোমাকে দংশন করার জন্য ফণা তুলেছিলো। আর একটু হলেই মৃত্যুর কোলে তুমি চলে যেতে। কিন্তু অনেক দূর থেকে এই বিচ্ছুটাকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন।

বুযুর্গ বলেন, সে দিন স্বচক্ষে খোদার কুদরত দেখলাম। একটা জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি কি কারিশমা দেখালেন! মূলত দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে আছে, কুদরতের অসীম নিগূঢ় তত্ত্ব।

চমৎকার ঘটনা

জানি না ঘটনাটি সঠিক কিনা? সঠিক হলে বিশেষ শিক্ষণীয় বটে। এক ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছিলো। মল ত্যাগের সঙ্গে সাদা ধরনের কৃমি দেখতে পেলো। লোকটি ভাবলো, আল্লাহর প্রতি সৃষ্টিই কোনো না কোনো উপকারে আসে– এটা অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তবে এই প্রাণীটা যার জন্ম-উৎস হলো অপবিত্র মল, যাকে ত্যাগ করতে পারলেই স্বস্তি; তাও আবার উপকারী– এটা আমার বোধগম্য নয়। আল্লাহই ভালো জানেন, কেন তিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

কিছুদিন পর লোকটির চোখে রোগ দেখা দিলো। এর পেছনে সে বহু চিকিৎসা শেষ করে ফেলেছিলো। কিন্তু কাজ হয়নি। অবশেষে এক প্রবীণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা প্রার্থনা করলো। চিকিৎসক গভীরভাবে ভাবলেন, তারপর বললেন, আপাতদৃষ্টিতে এর কোনো চিকিৎসা আমার জানা নেই, তবে একটা চিকিৎসার কথা মনে আছে। তা হচ্ছে, মানুষের পেটের ভেতর যে কৃমি জন্মায়, তা পিষে মিহি করে চোখে লাগাতে হবে। এতে আশা করি এ রোগের নিরাময় হবে।

লোকটি ডাক্তারের কথা শুনে একেবারে থ বনে গেলো। এবার তার বোধগম্য হলো, আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই অনর্থক নয়।

আহারের ব্যাপারেও এই একই দর্শন। কোনো খাবার আমাদের মনঃপুত না হলেও এটি আল্লাহর সৃষ্টি। উপরন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য রিযিক হিসাবে এটি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার সম্মান করা জরুরী। মনঃপুত না হলে খাবো না। কিন্তু মন্দও বলবো না। অনেকে খাবারের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়, এটা জায়েয নেই।

রিযিকের অবমূল্যায়ন করো না

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মূল্যবান শিক্ষা হলো, আল্লাহর দেয়া রিযিককে সম্মান করা এবং তার অবমূল্যায়ন না করা। বর্তমানে আমাদের সামাজিক শিষ্টাচারে ইসলামের কোনো মূল্যায়ন নেই। প্রতিটি কাজে আমরা বিজাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। খাওয়ার ব্যাপারেও আমরা তাদের অভিনয় করি। আজ আমাদের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের সামান্য মূল্যও নেই। খাবার বেঁচে গেলে আমরা ডাস্টবিনে ফেলে দেই। এ দৃশ্য দেখে অনেক সময় অন্তর কেঁপে উঠে। এসব কিছু মুসলমানদের ঘরেই চলছে। বিশেষ করে দাওয়াতের অনুষ্ঠানে এবং হোটেল ও কমিউনিটি সেন্টারে হচ্ছে। অথচ ইসলামের সুমহান শিক্ষা হলো, খাদ্যের একটি ছোট কণাকেও স্বযত্নে উঠিয়ে নেয়া। যেন রিযিকের অপচয় না হয়।

হযরত থানভী (রহ.) এবং রিযিকের মূল্যায়ন

ঘটনাটি শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর যবানে শুনেছি। একবার হযরত থানভী (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক ব্যক্তি তাঁকে কিছু দুধ দিলো। তিনি পান করলেন। অল্প একটু বেঁচে গেলো। এইটুকু তিনি শিয়রের কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠার পর জিজ্ঞেস করলেন : বেঁচে যাওয়া দুধটুকু কোথায়? খাদেম বললো, তাতো ফেলে দেয়া হয়েছে। একটু ছিলো, মাত্র এক ঢোক।

এ শুনে হযরত থানভী (রহ.) একেবারে রেগে গিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলার এ নেয়ামতটুকু ফেলে দিয়ে তোমরা বড় অন্যায় করেছো। আমি যখন পান করতে পারলাম না, তোমরা পান করে নিতে বা বিড়াল আছে, বিড়ালকে দিয়ে দিতে অথবা তোতাটিকে দিলেও তো পারতে। এতে আল্লাহর সৃষ্টির ফায়দা হতো। ফেলে দিলে কেন?

তারপর তিনি একটি মূলনীতি বললেন, যেসব বস্তুর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ তার জীবনযাত্রায় ব্যবহার করে, খায় এবং পান করে সেসব বস্তুর স্বল্প পরিমাণও যত্ন করা ওয়াজিব। যেমন, খাবারের একটি বিরাট পরিমাণ অংশ মানুষ খায়, ক্ষুধা মেটায় এবং প্রয়োজন পূরণ করে। সুতরাং এর যদি সামান্য অংশও বেঁচে যায়, এর যত্ন নেয়া ও কদর করা ওয়াজিব। নষ্ট করে ফেলা জায়িয নয়।

কথাটি মূলত ওই হাদীসের নির্যাস, যে হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রিযিকের অবমূল্যায়ন করো না।

দস্তরখান ঝাড়ার সঠিক নিয়ম

দারুল উলূম দেওবন্দে আব্বাজানের একজন উস্তাদ ছিলেন। নাম ছিলো মাওলানা সাইয়্যিদ আসগর হুসাইন (রহ.)। পরিচিত মহলে তিনি 'হযরত মিয়াঁ সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ওই সকল উস্তাদের একজন ছিলেন, যাঁরা যশ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি থেকে সর্বদা শত ক্রোশ দূরে অবস্থান করতেন। খুব উঁচু মাকামের বুযুর্গ ছিলেন। যাঁর জীবনাচার দেখলে সাহাবায়ে কেরামের কথা মনে পড়ে যেতো। একবার আব্বাজান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে যান। খাওয়ার সময় হলে বৈঠকখানায় দস্তরখান বিছিয়ে তাঁরা আহার করেন। আহার শেষে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা দস্তরখানটি বাইরে কোথাও ঝেড়ে আনার জন্য ভাঁজ করতে আরম্ভ করেন। তখন মিয়াঁ সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি একি করছেন?' আব্বাজান নিবেদন করলেন, 'হযরত! দস্তরখান উঠাচ্ছি, বাইরে কোথাও ঝেড়ে নিয়ে আসি।' মিয়াঁ সাহেব বললেন, 'আপনি দস্তরখান উঠাতে জানেন?' আব্বাজান বললেন, 'দস্তরখান উঠানোও কি কোনো বিদ্যা, যা শিখতে হবে?' মিয়াঁ সাহেব উত্তর দিলেন, 'জি হ্যাঁ। এটিও একটি বিদ্যা।' এজন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি এ কাজ পারেন কি না?' আব্বাজান দরখাস্ত করলেন, 'হযরত! তাহলে এ বিদ্যা আমাকেও শিখিয়ে দিন।' মিয়াঁ সাহেব বললেন, 'আসুন, শিখাচ্ছি।'

একথা বলে তিনি দস্তরখানে বেঁচে যাওয়া খাদ্যের টুকরাগুলো পৃথক করলেন। হাড্ডিগুলো ভিন্ন করে রাখলেন। রুটির বড় টুকরাগুলো পৃথক করলেন। তারপর দস্তরখানে পড়ে থাকা রুটি গুঁড়ো গুঁড়ো টুকরাগুলোও খুঁটে

খুঁটে আলাদা করে জমা করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আমি এসবের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক জায়গাও ঠিক করে রেখেছি। এই টুকরাগুলো আমি অমুক জায়গায় রেখে দিই। প্রতিদিন একটি বিড়াল এসে ওখান থেকে খেয়ে যায়। হাড্ডির জন্যও পৃথক জায়গা আছে, কুকুর তা চিনে, এসে খেয়ে চলে যায়। রুটির এ বড় টুকরাগুলো অমুক জায়গায় রেখে আসি। সেখানে পাখি আসে। এগুলো পাখির কাজে আসে। আর রুটির এ গুঁড়ো খণ্ডগুলো পিপড়ার গর্ত মুখে রেখে দিই, তারা খেয়ে নেয়।

তারপর তিনি বললেন, এ সবই আল্লাহর দান। যথাসম্ভব এর কোনো অংশই যেন নষ্ট না হয়– খেয়াল রাখা উচিত।

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আব্বাজান বললেন, সেদিন আমার প্রথম জানা হলো, দস্তখানা উঠানোও একটি বিদ্যা; এটাও শিখার বিষয়।

আমাদের অবস্থা

অথচ আমাদের অবস্থা হলো, দস্তরখান সরাসরি ডাস্টবিনে নিয়ে ঝেড়ে আসি। আল্লাহ তাআলার রিযিকের কোনো মূল্য দিই না। মানুষের মত অন্যান্য প্রাণীরাও তো আল্লাহ তাআলার মাখলুক। তারাও এসব আল্লাহপ্রদত্ত রিযিকের হকদার। অন্তত আমাদের উচ্ছিষ্ট খাবার তাদেরকে দেয়া দরকার। আগেকার যুগের শিশুরাও এসব শিষ্টাচার বড়দের কাছ থেকে পেতো। খাবার পড়ে থাকতে দেখলে শিশুরাও তুলে নিয়ে যত্নসহ উঁচু জায়গায় রেখে দিতো। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব শিষ্টাচার আমাদের মধ্য থেকে উঠে গেছে। পশ্চিমাদের সভ্যতা আমাদের সবকিছুকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত ও শিক্ষা ব্যাপকভাবে চর্চা করার এবং পশ্চিমারা সভ্যতার নামে অসভ্যতার যে আপদ চাপিয়ে দিয়েছে, তা থেকে মুক্তি লাভের কৌশল খুঁজে বের করার।

সিরকা ও তরকারি

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَئَلَ اَهْلَهُ الْاِدَامَ، فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ، فَدَعَابِهِ، فَجَعَلَ يَاْكُلُ وَيَقُوْلُ : نِعْمَ الْاِدَامُ اَلْخَلُّ، نِعْمَ الْاِدَامُ اَلْخَلُّ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة رقم الحديث ٢٠٥٢)

'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বললো, আমাদের নিকট সিরকা ছাড়া কিছু নেই। তিনি তাই আনতে বললেন এবং ঐ সিরকা দিয়েই রুটি খেতে খেতে বললেন, সিরকা একটি চমৎকার তরকারি। সিরকা একটি উত্তম তরকারি।'

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার

এমনই দিন কাটাতে হতো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারকে। রুটি আছে, তরকারি নেই। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে, তিনি এক সঙ্গে এক বছরের ভরণ-পোষণ স্ত্রীগণকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁরাও তো ছিলেন উঁচু ও মর্যাদাবান। দান-সদকার ব্যাপারে ছিলেন খুবই দরাজ দিল। যার কারণে ঘর শূন্য হয়ে যেতো। আয়েশা (রা.)-এর ভাষায়, কোনো কোনো সময় তিন-চার মাস পর্যন্ত আমাদের চুলায় আগুন জ্বলেনি। পানি আর খেজুর– এ দুই বস্তু দিয়েই দিনাতিপাত করেছি।

নেয়ামতের কদর

সিরকাকে সাধারণত তরকারি বলা হয় না; বরং স্বাদ বৃদ্ধির জন্য তরকারির সঙ্গে মেশানো হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) একেই তরকারি হিসাবে রুটি দ্বারা খেলেন, প্রশংসা করলেন, উত্তম তরকারি হিসাবে স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করলেন। এতে বোঝা যায়, তিনি সব ধরনের নেয়ামতকেই মূল্যায়ন করতেন।

খাবারের প্রশংসা করা উচিত

আলোচ্য হাদীসকে সামনে রেখে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, কেউ যদি এ নিয়তে সিরকা খায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সিরকা খেয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' সাওয়াব পাবে। এ হাদীস থেকে আরেকটি মাসআলা বের হয় যে, খাবার যদি মনঃপুত হয়, তাহলে খাবারের প্রশংসা করা উচিত। উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা। এতে রান্নাকারীও খুশি হবেন। এমন যেন না হয় যে, পেট ভরলাম, মজা পেলাম আর উঠে চলে গেলাম, মুখে একটু প্রশংসাও করলাম না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) সিরকারও প্রশংসা করেছেন। তাই খাবার ও রান্নাকারীর প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসার শব্দ মুখ থেকে বের না করা এক প্রকার কৃপণতা বৈ কি!

রান্নাকারীর প্রশংসাও প্রয়োজন

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) একবার নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীসহ আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক রাখতো। একদিন তারা আমাকে বাসায় দাওয়াত করলো। আমি গেলাম, খাবার খেলাম। খাবার ভারি মজা ও উন্নত হয়েছিলো। খাওয়া-দাওয়া শেষে গৃহিনী পর্দার আড়াল থেকে সালাম দিলো। পূর্ব অভ্যাস মত গৃহিনীকে বললাম, তুমি তো সুন্দর পাকাতে জানো! আজকের রান্না খুব মজা হয়েছে। আমার একথা শোনামাত্র পর্দার আড়াল থেকে কান্নার আওয়াজ শুরু হলো। আমি হতচকিত হয়ে গেলাম।

ভাবলাম, জানি না বেচারি মহিলা আমার দ্বারা কোনো কষ্ট পেলো কিনা? জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো; কাঁদছো কেন? অবশেষে মহিলা অনেক কষ্টে কান্না থামালো এবং বললো, হযরত! আমি আমার স্বামীর সঙ্গে আজ চল্লিশ বছর সংসার করছি। আজ পর্যন্ত তিনি একবারের জন্যও বলেননি, তোমার রান্না ভালো হয়েছে। তাই আপনার মুখ থেকে বাক্যটি শুনে আমার কান্না এসে গেছে। তখন আমি গৃহকর্তাকে বললাম, আল্লাহর বান্দা! এত কার্পণ্য কর কেন? দু' একটা প্রশংসার বাক্যও বলা যায় না?' এতে মানুষও তো খুশি হয়।

হাদিয়ার প্রশংসা

সাঁধারণ মানুষের অভ্যাস হলো হাদিয়া আসলে লৌকিকতা দেখিয়ে বলে, ভাই! এ হাদিয়ার কী প্রয়োজন ছিলো? শুধু শুধু কষ্ট করলেন কেন? কিন্তু শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)কে দেখেছি, তাঁকে হাদিয়া দেয়া হলে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেন না। বরং বেশ খুশি হতেন, আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বললেন, ভাই! তুমি এমন জিনিস এনেছো, যা আমার প্রয়োজন ছিলো।

একদিন আমি একটি কাপড় হাদিয়া নিয়ে হযরতের কাছে গেলাম। আমি কল্পনাও করিনি যে, তিনি এত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। কাপড়টি যখন হযরতের সামনে রাখলাম, বললেন, এমন কাপড়ই আমি খুঁজছিলাম। এটা আমার দরকার ছিলো। কাপড়টার রঙও বেশ পছন্দ। কাপড়টি খুব ভালো। তারপর তিনি বলেন, কেউ আন্তরিকতার সঙ্গে হাদিয়া নিয়ে এলে কমপক্ষে এতটুকু প্রশংসা করবে, যাতে আন্তরিকতার মূল্যায়ন হয় এবং হাদিয়াদাতাও খুশি হয়। হাদীস শরীফে এসেছে- تهادوا تحابوا অর্থাৎ "একে অপরকে হাদিয়া দাও, আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে।" আর আন্তরিকতা তখনই প্রকাশ পাবে, যখন হাদিয়া আগ্রহসহ গ্রহণ করা হবে।

মানুষের শুকরিয়া আদায় কর

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ (ترمذى، كتاب الله والصلوة، باب ما جاء فى الشكر لمن احسن اليك، رقم الحديث ١٩٥٤)

"যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।"

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, কেউ তোমাদের সঙ্গে আন্তরিকতা দেখালে এবং কোনো ইহসান করলে, তাকে ভাষার মাধ্যমে হলেও কৃতজ্ঞতা জানাবে

এবং দু' একটি প্রশংসা-বাক্য বলে দিবে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা। আজ যদি আমরা এ আদর্শ গ্রহণ করি, দেখতে পাবো, পারস্পরিক মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য কোমলভাবে আমাদের মাঝে স্থান করে নিবে এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। শর্ত হলো, নবীজী (সা.)-এর আদর্শকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে, তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সৎ সন্তানকে আদব শিক্ষা দান

عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ، قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٥٣٧٤)

হাদীসটি ইতোপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আমর ইবনে আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সৎ ছেলে ছিলো। হযরত উম্মে সালামা প্রথমে আবু সালামার স্ত্রী ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন। হযরত আমর ছিলেন আবু সালামার সন্তান। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর সঙ্গে তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। একবার আমি তাঁর সঙ্গে খাবার খেতে বসলাম। আমার হাত পাত্রের চারিদিক যেতে থাকে। এক লোকমা এদিক, দ্বিতীয় লোকমা অন্য দিক থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার এ অবস্থা দেখে বললেন, হে বৎস! খাওয়া শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। ডান হাতে খাবে। নিজের সামনের দিক থেকে খাবে।

নিজের সামনে থেকে খাওয়া

উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়ার তিনটি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমত. বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া, দ্বিতীয়ত. ডান হাত দ্বারা খাওয়া, তৃতীয়ত. নিজের সামনে থেকে খাওয়া। এদিক ওদিক থেকে না খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) এসব আদবের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা, নিজের সামনে থেকে খেলে অবশিষ্ট খাবার নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে পাত্রের চারিদিক থেকে খেলে অবশিষ্ট খাবার নষ্ট হবে। অন্যদের কাছেও তা অরুচি হবে।

খাবারের মাঝখানে বরকত

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খাবার সামনে আসলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তখন খাবারের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। সুতরাং মাঝখান থেকে খাবার শুরু করলে খাবারের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এক পাশ থেকে খেলে বরকত বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন হয়, কিভাবে বরকত নাযিল হয় এবং কেন নাযিল হয়? এর উত্তরের পেছনে না পড়ে বরং আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার উপর আমল করবো। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের সামনের দিক থেকে খাওয়ার এবং পাত্রের চারিদিক থেকে না খাওয়ার– আমরা এ শিক্ষা বিনাপ্রশ্নে মেনে চলব। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১৮০৬)

আইটেম ভিন্ন হলে পাত্রের চারদিকে হাত বাড়াতে পারবে

উল্লিখিত আদব হলো, এক জাতীয় খাবারের ক্ষেত্রে। পাত্রে বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকলে পছন্দমাফিক হাত বাড়িয়ে নিতে পারবে। যেমন, সাহাবী আকরাম (রা.) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এক বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত ছিলো। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। আমরা ওখানে পৌছার পর আমাদের সামনে দস্তরখান বিছানো হলো এবং ছারীদ আনা হলো। ছারীদ হলো, ঝোল ভেজানো রুটির টুকরা। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় খাবার। তিনি এর ফযীলতও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আকরাশ (রা.) বলেন, আমি বিসমিল্লাহ না বলে খাওয়া শুরু করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর। আমি পাত্রের চারদিকে হাত বাড়িয়ে খাচ্ছিলাম। রাসূল (সা.) আমার এ অবস্থা দেখে বললেন–

يَا عَكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ

'আকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও; কেননা, খাবার তো একই।' ফলে আমি পাত্রের একদিক থেকে খেলাম।

তারপর বিভিন্ন খাবারপূর্ণ একটি পাত্র আনা হলো। পাত্রটি নানা জাতের খেজুর ও অন্যান্য খাবার দ্বারা পূর্ণ ছিলো। আমি পাত্রটির একদিক থেকে খাচ্ছিলাম। আর রাসূল (সা.) চারদিক থেকে খাচ্ছিলেন। তিনি আমার এ অবস্থা দেখে বললেন–

يَا عَكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ

"আকরাশ! যে দিক থেকে ইচ্ছা খাও; কেননা, এ পাত্রে নানা আইটেমের খাবার রয়েছে।"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আদব শিক্ষা দিলেন যে, এক ধরনের খাবার হলে সামনে থেকে খাবে। বিভিন্ন ধরনের খাবার হলে পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খেতে পারবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৪৯)

বাম হাতে খাওয়া নিষেধ

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ – فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم الحديث ٤٠٤١)

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে বসে বাম হাতে খাচ্ছিলো। তিনি তাকে ডান হাতে খেতে বললেন। সে উত্তরে বললো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। বাহ্যত বোঝা যায়, লোকটি মুনাফিক ছিলো। যেহেতু তার কোনো অপারগতা ছিলো না। অথচ সে মিথ্যে বললো।

অনেকে নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না; বরং নিজের কথা ও কাজের উপর অটল থাকে। লোকটি সম্ভবত এ জাতীয় স্বভাবের ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ শোনা সত্ত্বেও সে স্পষ্ট বলে দিলো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলা আল্লাহ পছন্দ করলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বদ দু'আ করে বললেন– لَا اسْتَطَعْتَ 'তুমি ডান হাতে খেতে পারবে না।' হাদীসে রয়েছে, এ ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।

ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত

নিয়ম হলো, মানুষ হিসাবে কোনো ভুল হয়ে গেলে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে হয়ত আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু ভুল করে হঠকারিতা দেখানো ও নবীর সঙ্গে মিথ্যা বলা জঘন্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) কারো জন্য বদ দু'আ খুব কমই করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর

বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্তকারী এবং যুদ্ধকারী প্রাণের দুশমনদের জন্য বদ দু'আ করেননি। বরং তাঁর দু'আ ছিলো–

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দিন, তারা তো আমাকে চিনে না।"

অথচ আলোচ্য ব্যক্তি সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীজী (সা.)কে জানানো হয়েছে যে, সে অহংকার ও কপটতার কারণে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করেছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য বদ দু'আ করেছেন।

নিজের ভুল গোপন করা উচিত নয়

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, অন্যায় কিংবা গুনাহ করে ফেললে আল্লাহওয়ালাদের নিকট চলে যেতে হবে। তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে মিথ্যা বলা, নিজের ভুলের উপর অটল থাকা খুবই শঙ্কাজনক। নবীদের মর্যাদা তো সর্বোচ্চ শিখরে। অনেক ক্ষেত্রে নবীদের প্রকৃত ওয়ারিশ বুযুর্গদের সঙ্গেও এ ধরনের আচরণ আল্লাহর দরবারে বরদাশতযোগ্য নয়।

হযরত (রহ.) একবার হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, একবার থানভী (রহ.) ওয়াজ করছিলেন। এক ব্যক্তি অহংকারের বশীভূত হয়ে মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলো। এটা ছিলো মজলিসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ও আদব বিরোধী। খানকায় আগত কোনো ব্যক্তির কোনো ভুল হলে হাকীমুল উম্মত (রহ.) তা ধরে দিতেন। তাই লোকটিকে এভাবে বসতে বারণ করলেন। তখন সে সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে অপারগতা প্রকাশ করে বললো, 'হযরত! আমার কোমরে ব্যথা; তাই এভাবে বসেছি।' আসলে সে বলতে চাইছিলো, আপনার ভুল ধরাটা ঠিক হয়নি।

হযরত ডা. সাহেব বলেন, "আমি লক্ষ্য করলাম, লোকটির উত্তর শুনে হযরত থানবী (রহ.) ক্ষণিকের জন্য মাথা নিচু করে কি যেন ভেবে নিলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করে তিনি বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার কোমরে ব্যথা নেই। তুমি মজলিস থেকে উঠে যাও।" একথা বলে ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিলেন।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলা অজানা বিষয়গুলোও অনেক সময় তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে জানিয়ে দেন। সুতরাং বুযুর্গদের সঙ্গে মিথ্যা বলা, হঠকারিতা করা খুবই বিপদজনক। থানবী (রহ.) যাকে মজলিস থেকে বের করে দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে লোকেরা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললো, আসলে হযরত থানবী (রহ.) সঠিক কাজটিই করেছেন। আমার কোমরে কোনো ব্যথা ছিলো না। স্রেফ নিজের কথা ঠিক রাখার জন্য আমি এমন করেছি।

বুযুর্গদের সঙ্গে বেয়াদবী করো না

মানুষ হিসাবে অন্যায়-অপরাধ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি কেউ বুযুর্গদের দিগুনির্দেশনা মত নাও চলে, এরপরেও আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে তাওবার তাওফীক দিতে পারেন, মাফ করতে পারেন। কিন্তু বুযুর্গদের শানে বেয়াদবী করা, তাদের ক্ষেত্রে আপত্তিকর মন্তব্য করা এবং নিজের ভুল ভুল নয় প্রমাণ করার চেষ্টা মারাত্মক অন্যায়। এমনকি ঈমানহারা হওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান। আল্লাহ হেফাযত করুন। আমীন।

তাই কোনো আল্লাহওয়ালার কোনো কথা মনোপুত না হওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু বেয়াদবী করা যাবে না। ভুল হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে ভুলের উপর অটল থাকা যাবে না। একেই বলে চুরিতো চুরি আবার সীনাজোরী।

দুই খেজুর এক সঙ্গে খাবে না

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرُزِقْنَا تَمْرًا. فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاْكُلُ، فَيَقُوْلُ : لَا تُقَارِنُوْا، فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اِلَّا اَنْ يَّسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٥٤٤٦)

হযরত জাবালাহ ইবনে সুহাইম (রা.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর শাসনামলে একবার আমাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তখন আমাদের জন্য কিছু খেজুরের ব্যবস্থা হলো। আমরা খাচ্ছিলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, দু'টি খেজুর একসঙ্গে মিশিয়ে খেয়ো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। দু'টি খেজুর একসঙ্গে খাওয়াকে আরবীতে 'কিরান' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি নিষেধ করেছেন। কারণ, সকলের উদ্দেশ্যে যে খেজুরগুলো রাখা হয়েছে, সেগুলোতে সকলের সমধিকার রয়েছে। অতএব, কেউ যদি এক সাথে দুটো খায়, আর অন্যরা খায় একটি– তাহলে এর দ্বারা অপরের অধিকার নষ্ট হবে বিধায় এটা নাজায়িয। অবশ্য সকলেই যদি দু'টি করে খায় তাহলে অসুবিধা নেই। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অপরের হক যেন খর্ব না হয়।

যৌথ জিনিস ব্যবহারের নিয়ম

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তাহলো যৌথ জিনিসপত্র থেকে কেউ এককভাবে ফায়দা নিতে পারবে না। এটা নাজায়িয।

নিয়মটি সকলের ক্ষেত্রে সব জিনিসের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। এর সম্পর্ক কেবল খেজুরের সাথে নয়। তাই এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের জন্য জুটলেই হলো, আর সকলেই গোল্লায় যাক– এরূপ মানসিকতা কাম্য নয়। এ সুবাদে আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) দস্তরখানে বসে একটি মাসআলা বলতেন–

'যখন দস্তরখানে খানা রাখা হবে, দেখতে হবে, কত লোক খাবে এবং দস্তরখানের খানা সকলের মাঝে বন্টন করা হলে প্রত্যেকে কতটুকু করে পাবে। তারপর হিসাব মতে প্রত্যেকে যার যার অংশ গ্রহণ করবে। কেউ অতিরিক্ত নিলে আলোচ্য হাদীসের প্রতিপাদ্যভুক্ত হয়ে নাজায়িয সাব্যস্ত হবে।'

যানবাহনে অতিরিক্ত সিট দখল করা

অনুরূপভাবে একবার তিনি আরেকটি মাসআলাও বলেন যে, তোমরা রেলগাড়িতে যাতায়াত করে থাক। হয়ত লক্ষ্য করেছো, বগির ভেতর লেখা রয়েছে '২২ জন যাত্রী বসতে পারবে।' এখন তুমি সেখানে আগে ভাগে পৌছে তিন-চারটা সিট দখল করে নিলে এবং বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লে। ফলে অন্যান্য যাত্রীরা আসন না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অথচ তুমি শুয়ে ভ্রমণ করছো। এটাও হাদীসে উল্লিখিত 'কিরান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তোমার কাজটি বৈধ হয়নি। কেননা, তোমার অধিকার তো এতটুকু যে, তুমি একজনের আসনে বসবে। অথচ তুমি অপরের অধিকার খর্ব করে কয়েকটি আসন দখল করে নিলে। এতে তোমার দু'টি গুনাহ হয়েছে। প্রথমত. তুমি একটি আসনের ভাড়া দিয়েছ; একাধিক আসনের নয়। দ্বিতীয়ত. মুসলমান ভাইয়ের অধিকার নষ্ট করেছ, যেহেতু তুমি তার সিট দখল করেছ। প্রথমটির মাধ্যমে আল্লাহর হক নষ্ট করেছ। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বান্দার হক খর্ব করেছ।

মূলত তোমার এ কাজটি সমস্যাপূর্ণ একটি অপরাধ। কারণ, বান্দার হক মাফ করানো এক কঠিন ব্যাপার। বান্দা মাফ না করলে শুধু তাওবার মাধ্যমে এ হক মাফ হয় না। তাওবা হয়ত করলে কিন্তু যার হক নষ্ট করেছ, তাকে কোথায় পাবে? এজন্য এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। কুরআন মাজীদে একাধিকবার বলা হয়েছে– وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ অর্থাৎ 'পার্শ্বস্থ লোকের হক আদায় কর।' বাস বা রেলে সফরকালে যে লোকটি আমার পাশে আছে, সে লোকটি তোমার জন্য 'পার্শ্বস্থ লোক'। এরও হক রয়েছে। তার হক বিনষ্ট করো না। এ ক্ষণিকের সঙ্গীর অধিকার তোমার দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হলে– এর গুনাহ আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। তাই ক্ষণিকের পরিচিত লোকের সঙ্গেও মার্জিত আচরণ কর।

যৌথ বাণিজ্যের হিসাব-কিতাব এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ

বর্তমানে ভাইদের যৌথ-বাণিজ্যের প্রচলন আমাদের সমাজে ব্যাপক। যৌথ ব্যবসা করলেও সাধারণত তার হিসাব-কিতাবের ধার ধারে না। তাদের কথা হলো, ভাই-ভাই এ আবার কিসের হিসাব-কিতাব? আমরাই তো.... অপর কেউ তো আমাদের মাঝে নেই? তাই হিসাবেরও প্রয়োজন নেই। হেতু কার কত অংশ এবং কে কত পাবে লিপিবদ্ধ নেই। মাসিক কাকে কতটুকু মুনাফা দেয়া হবে, তার হিসাব নেই। সম্পূর্ণ লাগামহীন কারবার চলতে থাকে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ না পেলেও কিছু দিনের মধ্যেই টের পাওয়া যায়। অভিযোগ, অনুযোগ আরম্ভ হয় যে, অমুকের সংসার ভারি, তার ছেলে-মেয়ে বেশি। অমুক বেশি নিচ্ছে আর আমি বঞ্চিত হচ্ছি। এভাবে আরো কত কী! অভিযোগের যেন শেষ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই এসব কিছু হচ্ছে। মনে রাখবেন, যৌথ ব্যবসায় প্রত্যেক অংশীদারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ও স্পষ্ট হিসাব রাখাই হলো নবীজী (সা.)-এর শিক্ষা। হিসাব না রাখলে নিজে যেমন গুনাহগার হবে, তেমনি অন্যরাও গুনাহগার হবে। এ জাতীয় বিষয়ে ভাই-ভাই-এ কত রক্তপাত আমাদের সমাজে হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই সতর্ক হোন।

মালিকানায় শরয়ী ব্যবধান প্রয়োজন

কার মালিকানা কতটুকু হিসাব থাকা জরুরী। এমনকি পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মালিকানায়ও এ ব্যবধান আবশ্যক। হযরত থানবী (রহ.) স্ত্রীর ছিলো দু'জন। প্রত্যেকের ঘর ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। হযরত বলতেন, আমার মালিকানা এবং আমার উভয় স্ত্রীর মালিকানা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে রেখেছি। বড় স্ত্রী ঘরে যে সব সামানপত্র রেখেছি, সেগুলো তার। ছোট স্ত্রীর ঘরে যা আছে, সেগুলো তার। খানকার সামানাপত্র আমার। এখনই যদি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই, 'আলহামদুলিল্লাহ' কাউকে কিছু বলতে হবে না। সবকিছু স্পষ্ট, কোনো অস্পষ্টতা রাখিনি।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) ও তাঁর মালিকানা

আব্বাজানও এমনই ছিলেন। সব কিছুতেই মালিকানা স্পষ্ট করে দিতেন। শেষ বয়সে আব্বাজান পৃথক কামরায় একটি চৌকি রেখেছিলেন। দিন-রাত ওখানেই থাকতেন। আমরা সব সময় তাঁর খেদমতে থাকতাম। দেখেছি, প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস যখন তাঁর কামরায় আনতাম, প্রয়োজন শেষে তিনি বলতেন, জিনিসটি রেখে আসো। মাঝে মাঝে আমাদের একটু বিলম্ব হয়ে যেতো। এতে তিনি রাগ করতেন। বলতেন, তোমাদেরকে বলেছি, জিনিসটা রেখে আসো; এখনো রেখে আসোনি।

অনেক সময় আমরা ভাবতাম, এক্ষুনি ফেরত দেয়ার দরকার কি? এত তাড়া কিসের, একটু পরেই তো এমনিই ফিরিয়ে দেবো। একবার আব্বাজান বললেন, ব্যাপার হলো, আসলে আমি অসিয়তনামা লিখেছি, আমার কামরার জিনিসপত্র আমার মালিকানায় আর স্ত্রীর কামরার জিনিসপত্র তার মালিকানায়। তাই আমার কামরায় অপরের জিনিস এলে বিচলিত হই। না-জানি আমার ঘরে থাকার কারণে তার মালিক আমাকে মনে করা হয়। এই জন্যই আমার এত তাড়া।

এসব কথাও দ্বীনের অংশ। এগুলো বড়দের কাছ থেকে শিখতে হয়। অথচ আমরা এগুলোকে দ্বীন মনে করি না। মূলত এসব কথা ওই হাদীস থেকে চয়নকৃত, যে হাদীসে বলা হয়েছে 'তোমরা "কিরান" করো না।'

যৌথ জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি

আব্বাজান বলতেন, ঘরের কিছু জিনিস আছে যৌথভাবে সকলেই ব্যবহার করে। সেগুলোর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন গ্লাস রাখার, পেয়ালা রাখার, সাবান রাখার ভিন্ন ভিন্ন স্থান আছে। তোমরা এগুলো ব্যবহার করে এক জিনিস আরেক জিনিসের জায়গায় ফেলে রাখো। অথচ তোমরা জানো না, এটাও কবীরা গুনাহ। কারণ, এগুলো যৌথ ব্যবহার্য বিধায় যখন আরেকজন এসে খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না। ফলে সে কষ্ট পাবে। এক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

কত সূক্ষ্ম অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিন্তা। অথচ আমরা একটুও ভাবি না। এমনকি এগুলোকে দ্বীনের অংশও মনে করি না। মাসআলা জানার জন্য চেষ্টাও করি না। এর প্রধান কারণ হলো, আমাদের মাঝে দ্বীনের ফিকির নেই। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি নেই। দ্বিতীয়ত. এসব মাসআলা জানার ব্যাপারে রয়েছে আমাদের ব্যাপক অবহেলা। এসব বিষয়ও 'কিরান' শব্দের

অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে যদিও খেজুরের ব্যাপারে বলা হয়েছে; কিন্তু এর মাধ্যমে একটি মূলনীতি পাওয়া গিয়েছে। যার দু'-একটি উদাহরণ এতক্ষণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

যৌথ বাথরুমের ব্যবহার বিধি

বলতে যদিও সংকোচবোধ হয়; কিন্তু দ্বীনের কথায় তো লাজ-শরম থাকা ঠিক নয়। যেমন কেউ বাথরুমে গেলো। প্রয়োজনীয় কাজ সারলো, অথচ ভালোভাবে পরিষ্কার করে আসলো না, ওইভাবেই রেখে আসলো। আব্বাজান বলতেন, এটিও কবীরা গুনাহ। কারণ, আরেকজন যখন বাথরুমে যাবে, তার ঘৃণা আসবে, কষ্ট হবে। আর একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

অমুসলিমরা ইসলামী শিষ্টাচার আপন করে নিয়েছে

আব্বাজানের সঙ্গে একবার ঢাকার সফরে গিয়েছিলাম। ভ্রমণ ছিলো বিমানে। পথে আমার নিম্নচাপ হলো। হয়তো জানেন যে, বিমানে বাথরুমের বেসিনের কাছে একটি বাক্য লেখা আছে, 'বেসিন ব্যবহারের পর কাপড় দ্বারা মুছে রাখুন, যেন পরবর্তী ব্যবহারকারীর জন্য ঘৃণার কারণ না হয়'। আমি বাথরুম থেকে যখন ফিরে এলাম, আব্বাজান বললেন, বেসিনের উপর দিকে যে বাক্যটি লেখা আছে, তা মূলত ওটাই যা আমি তোমাদেরকে বারবার বলে থাকি। অপরকে কষ্ট না দেয়াও দ্বীন। এটি আজ অমুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা একথাগুলোকে আজ দ্বীন মনে করি না। এসব শিষ্টাচার আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছি বিদায় অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' বানিয়েছেন। এখানে আমল অনুপাতে ফলাফল পাবে।

এক ইংরেজ নারীর ঘটনা

প্রায় দু' বছর পূর্বে আমি বৃটেনে এক সফরকালে ট্রেনযোগে বার্মিংহাম থেকে এডেনবারা যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সিট ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে গিয়ে দেখি, এক ইংরেজ মহিলা আগে থেকে সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাই ভাবলাম, বাথরুম খালি নেই। বিধায় নিকটবর্তী একটি সিটে বসে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছু সময় যাওয়ার পর হঠাৎ বাথরুমের দরজায় আমার দৃষ্টি পড়ে। তাতে Vscant লেখা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো– যার অর্থ হলো, বাথরুম খালি রয়েছে, ভেতরে কেউ নেই। এতদসত্ত্বেও মহিলাটি

যথাপূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। ভাবলাম, হয়ত সে ভুল করছে। তাই তার নিকট গিয়ে বললাম, বাথরুম তো খালি, যেতে চাইলে যেতে পারেন। মহিলা উত্তর দিলো, আমি বাথরুমেই ছিলাম। কিন্তু প্রয়োজন শেষ করার পর গাড়ী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যায়। এজন্য কমোড ফ্লাশ করতে পারিনি (তাতে পানি দিতে পারিনি)। কারণ, গাড়ী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন ফ্লাশ করা ঠিক নয়। এজন্য অপেক্ষা করছি। গাড়ি ছেড়ে দিলে ভেতরে যাবো, ফ্লাশ করবো। তারপর আমার সিটে যাবো।

একটু চিন্তা করুন, মহিলাটি শুধু ফ্লাশ করার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। নিয়মের খেলাফ হবে বিধায় সেখানে দাঁড়িয়ে যথাসময়ে অপেক্ষা করছিলো। তার এ কাজটি দেখে আব্বাজানের কথা আমার মনে পড়ে গেলো। তিনি বলতেন, 'ময়লা যেন না থাকে তার খেয়াল রাখবে, তাই বাথরুমে কাজ সারার পর পানি ঢেলে দিবে।' এসব বিষয় মূলত দ্বীনেরই অংশ। দ্বীনের এসব শিষ্টাচার অমুসলিমরা চর্চা করলেও আমরা তার প্রয়োজনবোধ করি না। আমাদের মানসিকতা হলো, যে পরে আসবে সেই ঠিক করে নিবে। যার দরকার সেই বুঝবে, কী করবে, কীভাবে করবে।

অমুসলিমরা উন্নতি করছে কেন?

মনে রাখবেন, দুনিয়াটা হলো দারুল আসবাব। এসব শিষ্টাচার যারাই গ্রহণ করবে, তারাই উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবে। এসব সামাজিক শিষ্টাচার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাতেই রয়েছে, অথচ এগুলো আজ অমুসলিমরা লুফে নিয়েছে। ফলে তাদের উন্নতিও হচ্ছে। যদিও আখেরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। আমাদের অভিযোগ হলো, আমরা মুসলমান। কালিমা পড়েছি। ঈমান এনেছি। তবুও কেন অপদস্থ হচ্ছি? পক্ষান্তরে অমুসলিমরা এসব না করা সত্ত্বেও কেন উন্নতি লাভ করছে? এটা কিভাবে সম্ভব? অভিযোগ তো করতে জানি, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তলিয়ে দেখতে জানি না। মুসলমানদের শিষ্টাচার আজ অমুসলিমদের কাছে, আর অমুসলিমদের শিষ্টাচার মুসলমানদের কাছে। তাদের অবস্থা হলো, তারা ব্যবসায় সততা দেখায়, আর আমাদের অবস্থা হলো– ব্যবসায় আমরা কপটতা দেখাই। আমরা দ্বীনকে সংকুচিত করতে করতে মসজিদ-মাদরাসার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। ফলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাই হারাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক সমঝ দান করুন। আমীন।

হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থী

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا (صحيح البخاري، باب لا كل متكئا، رقم الحديث ٥٣٩٨)

হযরত আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হেলান দিয়ে খানা খেয়ো না।'

অপর হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم الحديث ٢٠٤٤)

হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে হাটু খাড়া করে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

পায়ের পাতায় ভর করে বসা সুন্নাত নয়

এ ব্যাপারে কয়েকটি ভুল ধারণা রয়েছে, যেগুলো দূর করা প্রয়োজন। হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, খেতে বসলে বিনয়ের সঙ্গে বসা এবং খানার কদর হয়– এমনভাবে বসা সুন্নাত। রাসূল (সা.) পায়ের পাতায় ভর করে বসেছেন বলে যে কথাটি প্রসিদ্ধ– এ ব্যাপারে কোনো হাদীস আমি পাইনি। হাঁ, এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) যখন খেতে বসতেন তখন বিনয়ের সঙ্গে বসতেন। আবদিয়্যাতের গুণ তখন ঝরে পড়তো। ফিরআউনী স্বভাব তাঁর মাঝে কখনো ছিলো না। আর হযরত আনাস (রা.)-এর একটি হাদীসেও এতটুকু পাওয়া যায়, রাসূল (সা.) একবার খেতে বসে উভয় হাটুকে সামনের দিকে উঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

খানার সময়ের সর্বোত্তম বৈঠক

এক সাহাবী বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি গোলামের বসার মত বসে খানা খাচ্ছেন। এ বিষয়ে সমূহ হাদীসের সমষ্টি থেকে বুঝা যায়, দো-ঝানু হয়ে বসা খাওয়ার সুন্নাত। কেননা, এ পদ্ধতিতে বিনয় অধিক প্রকাশ পায়। খাওয়ার কদর হয়। অতিভোজন হ্রাস পায়।

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, এক হাটু উঠিয়ে বসাও সুন্নাত। মোটকথা, বিনয়ের সঙ্গে বসে খানা খেলে অবশ্যই সাওয়াব পাবে।

আসন করেও বসা যাবে

খাওয়ার সময় চারযানু হয়ে বসা তথা আসন করে বসাও জায়েয। কিন্তু এ বৈঠক বিনয়ের অতটা কাছাকাছি নয়, যতটা কাছাকাছি পূর্ববর্তী দু' বৈঠক। তাই পূর্ববর্তী দু' বৈঠকের অভ্যাস করা উচিত। কেউ যদি এতে অভ্যস্ত না হয়, কিংবা একটু আরাম করে বসতে চায়, তাতেও অসুবিধা নেই। গুনাহ নেই।

অনেকে মনে করেন, আসন করে বসে খাওয়া জায়েয নেই। এটা ভুল ধারণা। অবশ্য উত্তম হলো দুযানু হয়ে বসা। এতে বিনয় ভাবটা ফুটে উঠে।

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া গুনাহ নয়। তবে মেঝেতে বসে খাওয়া সুন্নাতের অনুকূলে এবং সুন্নাতের অনুসরণ এতেই বেশি। তাই যথাসম্ভব এর অভ্যাস করতে হবে। আমল যত বেশি সুন্নাত-সমৃদ্ধ হবে, বরকতও তত বেশি হবে। সাওয়াব ও লাভও অত্যধিক পাবে।

যমীনে বসে খাওয়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি কারণে মাটিতে বসে খেতেন। প্রথমত. সে যুগের জীবনাচারে লৌকিকতা ছিলো না। সাধারণ জীবনযাপনে চেয়ার-টেবিলের প্রয়োজন হতো না। তাই নিচে বসতেন। দ্বিতীয়ত. এর মাঝে বিনয় ভাবটা বেশি। খাবারের কদরও অধিক। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, মেঝেতে বসা আর চেয়ার-টেবিলে বসার মাঝে পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা মনের। দাসত্ব ও বিনয় চেয়ার-টেবিলে নয়; বরং মেঝেতে। তবে প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিল নাজায়েয নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে কট্টরপন্থা অবলম্বন উচিত নয়। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি যমীনে বসে খাওয়ার কারণে মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাহলে কট্টরতা প্রদর্শন মোটেও উচিত নয়।

পাঠদানকালে আব্বাজানের মুখে একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন, একবার আমি এবং কয়েকজন সঙ্গী-সাথী দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলাম। খাবারের সময় হলে হোটেলে ঢুকলাম। কারণ, এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। হোটেলে তো চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ অন্য কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তাই আমার দুই সঙ্গী বললেন, মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নাত। সুতরাং আমরা

চেয়ার-টেবিলে বসবো না। সঙ্গীদ্বয় হোটেল-বয়কে বললেন, মাটিতে বসার ব্যবস্থা কর। আমরা রুমাল বিছিয়ে নিবো। আব্বাজান বলেন, আমি সঙ্গীদেরকে বারণ করলাম। নিচে বসার ব্যাপারে আপত্তি জানালাম। আমার সঙ্গীদ্বয় আমার কথায় সায় দিতে পারলো না। অবশেষে তাদেরকে বুঝালাম, নিচে বসে খাওয়া অবশ্যই সুন্নাত। কিন্তু এখানে পালন করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। লোকজন এ নিয়ে হাসাহাসি করবে। সুন্নাত উপহাসবস্তুতে পরিণত হবে। আর এটা আমাদের কারণেই হবে। অথচ সুন্নাত নিয়ে উপহাস করা গুনাহ। ক্ষেত্র বিশেষ কুফরিও। শেষ পর্যন্ত তারা আমার যুক্তি মেনে নিলো।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

তারপর আব্বাজান আমাদেরকে বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুলায়মান আ'মাশ (রহ.)-এর একটি গল্প শোনালেন। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদ। হাদীসের সকল কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। আ'মাশ আরবী শব্দ। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়– আ'মাশ। যেহেতু তিনি আলোর তীব্র ঝলকানি সহ্য করতে পারতেন না, চোখের পাতা মেলতে পারতেন না, তাই তাঁকে আ'মাশ বলা হতো। একবার তাঁর নিকট তাঁর এক শাগরিদ এলো। সে ছিলো পঙ্গু। ছাত্রটি উস্তাদের খুব ভক্ত ছিলো। সর্বদা পেছনে লেগে থাকতো। উস্তাদ যেখানে, ছাত্রও সেখানে। তিনি বাজারে গেলে ছাত্রও বাজারে যেতো। লোকজন এ দৃশ্য দেখে মজা পেতো। প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো, উস্তাদের চোখ নেই, ছাত্রের পা নেই। ইমাম আ'মাশ এতে খুব বিচলিত হলেন। ছাত্রকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে বাজারে যাবে না। ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, কেন? আপনি আমাকে সাথে নিবেন না কেন? ইমাম আ'মাশ বললেন, কারণ মানুষ এ নিয়ে হাসাহাসি করে। ছাত্রটি বললো, مَا لَنَا نُؤْجَرُ وَيَأْثَمُوْنَ অর্থাৎ হযরত! তারা মজা পায়– পেতে দিন। আমরা সাওয়াব পাবো, তারা গুনাহগার হবে। হযরত আ'মাশ উত্তর দিলেন–

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُوْنَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ نُؤْجَرَ وَيَأْثَمُوْنَ

আমরা এবং তারা উভয় পক্ষই গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া– আমাদের সাওয়াব প্রাপ্তি ও তাদের গুনাহ প্রাপ্তি থেকে অনেক উত্তম। আমার সঙ্গে বাজারে যাওয়া তো কোনো ফরজ-ওয়াজিব নয়। না গেলে আমাদের কারো ক্ষতিও নেই। তবে একটা লাভ আছে– মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। সুতরাং তুমি আমার সঙ্গে যেও না।

রসিকতার পরওয়া সকল ক্ষেত্রে নয়

গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। এ ব্যাপারে কে কি বললো– পরওয়া করা যাবে না। লোকে বিদ্রূপ করবে– এজন্য গুনাহয় লিপ্ত হওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে ফরজ-ওয়াজিব ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে ছেড়ে দেয়া যাবে না। এর অনুমতি নেই। হাঁ, উত্তম কাজ করতে গেলে যদি কৌতুকের শিকার হতে হয়, তাহলে তা ছেড়ে দিয়ে বৈধ কিন্তু উত্তম নয়– এমন পন্থা গ্রহণ করা যাবে। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এটাই কাম্য।

স্বাভাবিক অবস্থায় চেয়ার-টেবিলে খাবে না

হযরত থানবী (রহ.) একবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। তখন তিনি বলেছিলেন, চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া এমনিতে নাজায়েয নয়, তবে বিজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মৃদু সাদৃশ্যতা এতে রয়েছে। কেননা, কাজটি ইংরেজদের মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। এ বলে তিনি পা তুলে নিলেন। পা ঝুলিয়ে বসা থেকে বিরত রইলেন। তারপর তিনি বললেন, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে যাওয়ার যে আশঙ্কা করেছিলাম, তা দূর হয়ে গেলো। কারণ, তারা পা ঝুলিয়ে বসে আর আমি পা উঠিয়ে বসলাম।

এজন্য প্রয়োজনের মুহূর্তে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, পিঠ যেন পেছনের সঙ্গে লেগে না যায়, বরং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যাবে, তারপর খানা খাবে। হেলান দিয়ে বসে খাওয়া অহঙ্কারপূর্ণ– হাদীস শরীফে এটাই বলে। এটা অহঙ্কারীদের আমল, জায়েয নেই।

চৌকিতে বসে খাওয়া

চৌকিতে বসে খাওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং চেয়ার-টেবিলের তুলনায় এটাই উত্তম। কারণ, আহারকারী ও আহার্য বস্তু সমান্তরালে থাকা– আহারকারী নিচে আর আহার্য বস্তু উপরে থাকার চেয়ে উত্তম। সর্বোত্তম তো হলো, মাটিতে বসে খাওয়া। আল্লাহ আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

খাওয়ার সময় কথা বলা

খাওয়ার সময় কথা বলা নাজায়েয– এটি আমাদের মাঝে প্রচলিত একটি মারাত্মক ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা। বরং প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে। রাসূল (সা.) থেকেও এর প্রমাণ আছে। অবশ্য হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, খাওয়া চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর কথা না বলা ভালো। সাধারণ কথা হলে ক্ষতি

নেই। কারণ, খানারও তো হক আছে। খানার হক হলো, মনোযোগসহ খাওয়া। গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু হলে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। এতে খানার কদর হবে না। কিছুটা রসালাপও করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ নীরব থাকা উচিত নয়।

খাওয়ার পর হাত মোছা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ اِصَابِعَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، رقم الحديث ٥٤٥٦)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ খানা খাবে, তখন সে যেন চেটে খাওয়ার পূর্বে অথবা অন্য কাউকে চাটাবার পূর্বে হাত পরিষ্কার না করে।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদীসটি দু'টি মাসআলার উৎসস্থল। প্রথমত. খাওয়া শেষে হাত ধোয়া মুস্তাহাব ও সুন্নাত। তবে হাত মুছে নেয়ারও অনুমতি আছে। উত্তম হলো, ধুয়ে নেয়া। পানি না থাকলে তোয়ালে বা এ যুগের আবিষ্কার টিস্যু বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত. ধোয়া কিংবা মোছার পূর্বে হাত চেটে খাবে। প্রিয় নবী (সা.)-এরও এ অভ্যাস ছিলো। তিনি চেখে খেতেন। কেন এমন করতেন, তা অপর হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে যে, জানা নেই, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। খাবারের এ ক্ষুদ্র অংশেও তো বরকত থাকতে পারে। এর সম্ভাবনা খুবই প্রবল বিধায় এ অংশটুকু চেটে খাও; যেন বরকত থেকে বঞ্চিত না হও।

বরকত কাকে বলে?

প্রশ্ন হলো, বরকত কী? আজকের বস্তুবাদের যুগে এর তাৎপর্য রহস্যপূর্ণ মনে হয়। মানুষ আজ বস্তুবাদী হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা বস্তুর পেছনে দৌড়াচ্ছে। তাই 'বরকত' শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে না। অথচ 'বরকত' দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সমৃদ্ধ ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ একটি ছোট্ট শব্দ। এটি মূলত আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ দান। অনেকের জীবনে এটি একাধিকবার ধরা পড়েছে। বরকতের স্বরূপ কিছুটা এভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, অনেক সময় মানুষ কিছু একটা করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় উপকরণ জমা করে, অথচ লাভ হয় না, তখন এ ব্যক্তিই বুঝতে পারে বরকত কাকে বলে।

যেমন বাসায় সব ধরনের বিলাসসামগ্রী আনা হলো। দামি ফার্নিচার দ্বারা সজ্জিত করা হলো। চাকর-নকরও রাখা হলো। অথচ রাতে তার ঘুম নেই। এ-পাশ ও-পাশ করে তার সারা রাত কেটে যায়। তাহলে সুখানুভূতি কোথায় গেলো? বুঝা গেলো, বস্তু সুখ দিতে পারে না– এর অর্থই হলো, বরকত পাওয়া গেলো না। সুতরাং আমরা যে বলে থাকি, অমুক জিনিসে বরকত আছে– এর অর্থ হলো, বস্তুটি যে উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। আর বে-বরকতি হলো, বস্তু যে জন্য নেয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না।

সুখ আল্লাহর দান

মনে রাখবেন, সুখ-শান্তি কোনো 'পণ্য' নয় যে, মার্কেটে পাওয়া যায়। এটা আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। একেই বলে বরকত। যাদের টাকা-পয়সায় বরকত আছে, সংখ্যায় অল্প হলেও, সুখ-শান্তি তারা পাচ্ছে। যেমন একজন কোটিপতি– বিলাসসামগ্রীর অভাব নেই। অথচ মজাদার খাবার তার ভাগ্যে নেই। কারণ, তার পেট সুস্থ নেই। তখন এটাকেই বলা হয়, বে-বরকতি। পক্ষান্তরে একজন দিনমজুর, প্রতিদিন তাকে আট ঘন্টা শ্রম দিতে হয়। বিনিময়ে একশ' টাকা পায়। রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়। ক্ষুধা সুন্দরভাবেই মেটাতে পারে। মজাদার খাবার খুব কমই দেখে। রাতের বেলায় যখন ঘুমোতে যায়, নড়বড়ে খাটে ঘুমায়। কিন্তু নাক ডেকে এই পরিমাণে ঘুমায় যে, সারা দিনের পরিশ্রম উসুল করেই ছাড়ে। বুঝা গেলো, আহার ও নিদ্রার সুখ দিনমজুরই পেয়েছে, কোটিপতি পায়নি। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বেচারা দিনমজুরের শরীরে টাকার উষ্ণতা নেই, তবে শান্তির আমেজ আছে। আর প্রতাপশালী কোটিপতির জীবনে টাকার উত্তাপ আছে, তবে সুখানুভূতি নেই। একেই বলে বরকত এবং বে-বরকত।

খাদ্যে বরকতের অর্থ

ভেবে দেখুন, খাদ্য কোনো মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, শক্তি সঞ্চয় করা, শরীর সুস্থ থাকা। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, ক্ষুধা নিবারণ করা ও তৃপ্তিবোধ করা। তবে খাদ্যের এসব গুণ তখন আসবে, যখন আল্লাহ দান করবেন। এ কথাটির প্রতিই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইঙ্গিত করেছেন এভাবে– 'তুমি কি জানো, খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে।' এমনও তো হতে পারে, যা তুমি খেয়েছো, তাতে বরকত নেই। যা তোমার আঙুলের সাথে লেগে আছে, তাতেই সব বরকত রয়ে গেছে। অথচ এ অংশটুকু তুমি খাওনি বিধায় খাদ্য বরকতপূর্ণ হয়নি এবং দেহের শক্তিও জোগায়নি। বরং বদহজম হয়েছে, স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে যে শক্তি হওয়ার কথা ছিলো, তা হয়নি।

দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের প্রভাব

এতো বললাম বাহ্যিক অবস্থার কথা। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে অন্তরচক্ষু দান করেছেন, তারা আরো সুন্দর কথা বলেন যে, খাদ্যে খাদ্যে ব্যবধান আছে। কিছু খাদ্য আছে, মানুষের চিন্তা-চেতনার উপর প্রভাব ফেলে। কিছু খাবার আছে, মানুষের আত্মাকে তমসাচ্ছন্ন করে তোলে, অন্তরে কু-চিন্তা ও গুনাহ করার উৎসাহ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে কিছু কিছু খাবার আছে এতই বরকতময় যে, খাওয়ার পর অন্তরে সুখ আসে, তৃপ্তি আসে, ভালো ইচ্ছা ও ভালো উৎসাহ সৃষ্টি হয়, ফলে নেক কাজের প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের বস্তুপূজারী চোখ এ নিগূঢ় দিকটি দেখতে পায় না। আলো-অন্ধকারের ব্যবধান আমরা বুঝে উঠি না। আল্লাহ যাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, তাদের নিকট বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করুন। এটা এক বাস্তব সত্য।

চমৎকার ঘটনা

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)– যিনি হযরত থানবী (রহ.)-এরও উস্তাদ এবং দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; ঘটনাটি সম্ভবত তাঁরই। এক ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত করেছিলো। তিনি গেলেন। আহার পর্ব শুরু হলো। প্রথম লোকমা মুখে দেয়ার পর তিনি বুঝে ফেললেন, নিমন্ত্রণকারীর উপার্জন হালাল নয়। খানা রেখে তিনি চলে গেলেন। তবে যে লোকমাটি গিলে ফেলেছিলেন, তার সম্পর্কে বলতেন, দু' মাস পর্যন্ত এর অন্ধকার আমি অনুভব করেছি। তা এভাবে যে, এ দু' মাসের মধ্যে গুনাহ করার আগ্রহ আমার অন্তরে কয়েকবার সৃষ্টি হয়েছে।

এক লোকমা হারাম খাদ্য এবং গুনাহর প্রেরণা সৃষ্টি– এ দু'টির মাঝে আক্ষরিক অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এটাই বাস্তব। আমরাও আজ গুনাহর নেশায় আচ্ছন্ন। গুনাহ ও হারাম আমাদের কাছে একাকার হয়ে গেছে। তাই প্রকৃত অবস্থা অনুভবে আসে না। অনুভব হবেই বা কিভাবে? একটি সাদা কাপড়ে অগণিত দাগ পড়ে গেলে যেমনিভাবে বুঝা যায় না, নতুন দাগ কোনটি, তেমনিভাবে আমাদের গুনাহপূর্ণ অন্তর বুঝতে সক্ষম হয় না, এখনকার হারাম কোনটি। পক্ষান্তরে ধবধবে সাদা কাপড়ের উপর যদি একটি মাত্র দাগ পড়ে, সহজেই চোখে পড়বে। অনুরূপভাবে আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে– যা সাদা কাপড়ের মতই পরিষ্কার যদি একটি দাগও পড়ে, সাথে সাথে নিজের কাছে তা ধরা পড়ে। হযরত ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) এর বাস্তব উপমা।

আমরা বস্তুপূজার জালে ফেঁসে গেছি

বস্তু ও অর্থপূজার মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। ফলে কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমরা দেখতে পারি না। এসব বিষয় এখন মনে হয় যেন প্রলাপ বৈ কিছু নয়। ফলে 'বরকত' শব্দটিও মনে হয় অর্থহীন। অমুক কাজে বরকত আছে– এ জাতীয় কথা হাজারবার বললেও আমাদের কানে পশে না। অন্যদিকে কেউ যদি বলে, কাজটি কর, হাজার টাকা পাবে; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সক্রিয় হয়ে উঠি। মনে মনে বলি, এতদিন পর একটা কাজের কথা শোনা গেলো। এর কারণ একটাই, তাহলো আমাদের চিন্তা-চেতনা পার্থিব চাকচিক্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে রাখবেন, সুন্নাতের অনুসরণ করতে হলে বস্তুর প্রভাব দূরে ফেলে দিতে হবে। তবেই বরকত পাওয়া যাবে। অন্যথায় নয়। উল্লিখিত হাদীসে আঙুল চেটে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এটি একটি সুন্নাত, অতএব এর মাঝেই বরকত।

ভদ্রতা নাকি অভদ্রতা?

দুঃখের বিষয়, এখন তো ফ্যাশনের যুগ। নতুন নতুন সভ্যতা ও সামাজিকতা আমদানির যুগ। আঙুল চেটে খাওয়া নাকি এখনকার যুগে অভদ্রতা! জেনে রাখুন, মুসলমানের জন্য সভ্যতা ও ভদ্রতার একমাত্র উৎস রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত। প্রিয় নবী (সা.) যেটাকে বলেছেন ভদ্রতা; সেটাই ভদ্রতা। যে ভদ্রতা আজ এ রকম, কাল অন্য রকম। যে সভ্যতা আজ মার্জিত, তো কাল অমার্জিত। সে ভদ্রতা ভদ্রতা নয়। সে সভ্যতা সভ্যতা নয়। ভিত্তিহীন সভ্যতা মূলত অসভ্যতা। স্থিরবিহীন ভদ্রতা মূলত অভদ্রতা।

দাঁড়িয়ে খাওয়া অসভ্যতা

যেমন দাঁড়িয়ে খাওয়া আধুনিক সভ্যতার একটি ফ্যাশন। এক হাতে প্লেট আর অপর হাতে চামচ। একই প্লেটে ভাত, রুটি, তরকারি, সালাদ সবকিছু। ভোজ অনুষ্ঠানে খাবারের ব্যাপক অপচয়। এগুলো অভদ্রতা নয়। ফ্যাশনপূজা ওদের চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে। তাই নিজেদের অভদ্রতাও ভদ্রতা মনে হয়। দাঁড়িয়ে খাওয়া অভদ্রতা– এ সত্যটি আজ ফিকে হয়ে গেছে।

ফ্যাশন কখনও আদর্শ নয়

ফ্যাশন পরিবর্তনশীল। প্রকৃত ভদ্রতা ও সামাজিকতা ফ্যাশনের তোড়ে দূরে সরে যায়। ফ্যাশনের কোনো স্থিরতা নেই; অস্থির। আর অস্থির যে কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গ্রহণযোগ্য আদর্শ শুধু একটাই– রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, যা রাসূল (সা.) সুন্নাত তথা তরীকা বহির্ভূত, তা অবশ্যই আদর্শ বিবর্জিত। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতে রয়েছে বরকত। অতএব, আঙুল চেটে খাওয়াও বরকতময় কাজ। সুন্নাতের নিয়তে কাজটি করলে সাওয়াব পাবে। 'অভদ্রতা' মনে করে কাজটি ছেড়ে দিলে বঞ্চিত হবে, গুনাহ ও আত্মিক অন্ধকার তখন দিশেহারা করে তুলবে।

তিন আঙুল দ্বারা খাওয়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণত তিন আঙুল দ্বারা খেতেন। বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা– এ তিন আঙুল দ্বারা লোকমা মুখে দিতেন। উলামায়ে কেরাম এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সে যুগ ছিলো সরলতার যুগ। বিলাসিতা ও লৌকিকতা তাদের মাঝে ছিলো না। তাই তিন আঙুলই যথেষ্ট ছিলো। দ্বিতীয়ত. তিন আঙুলের সাহায্যে লোকমা নিলে স্বাভাবিকভাবে তা ছোটই হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে লোকমা যত ছোট হবে, হজম ততো ভালো হবে। দাঁত দ্বারা বড় লোকমা পুরোপুরি পেষা যায় না বিধায় পাকস্থলিতে গিয়ে হজম শক্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। তৃতীয়ত. ছোট লোকমা ভদ্রতার পরিচায়ক। বড় লোকমা লোভ ও অভদ্রতার পরিচায়ক। চতুর্থত. ছোট লোকমা দ্বারা অল্প ভোজনের অনুশীলনও হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন আঙুল দ্বারা খানা খেতেন।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩১)

আঙুল চেটে খাওয়ার তরতীব

সাহাবায়ে কেরামের নবী প্রেমের নমুনা দেখেন। নবী করীম (সা.)-এর খুটিনাটি বিষয় তাঁরা সংরক্ষণ করেছেন। ফলে আমাদের জন্য আমল করা সহজ হয়ে গেছে। নবীজী (সা.) খাওয়ার পর তিন আঙুল চেটে খেয়েছেন– এর তারতীব কেমন ছিলো, সাহাবায়ে কেরাম এটাও সংরক্ষণ করেছেন। তিনি প্রথমে মধ্যমা, তারপর তর্জনী, সর্বশেষ বৃদ্ধাঙ্গুলী চেটে খেতেন।

সাহাবায়ে কেরাম যখন পরস্পর বলতেন, সুন্নাতের আলোচনা করতেন। পরস্পরকে সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ দিতেন।

ঠাট্টা-বিদ্রূপের তোয়াক্কা আর কত দিন?

মাথা থেকে পা পর্যন্ত পশ্চিমাদের অনুসরণ করলেও তাদের দৃষ্টিতে আমরা পশ্চাদপদ। ওদের রঙ্গে রঙ্গীন হলেও তাদের মতে আমরা সেকেলে। পোশাক-পরিচ্ছদ হতে শুরু করে সবকিছুতেই তো তাদের অনুসরণ করছি, বলুন দেখি,

এতে ভিন্ন কোনো ইমেজ তাদের কাছে তৈরি হয়েছে কি? আমাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতায় একটু পানি পড়েছে কি? ভবিষ্যতেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হবে কি?

ওদের হাতে আমরা আজও মার খাচ্ছি, অপদস্থ হচ্ছি। তাদের দৃষ্টিতে আমরা এখনও অভদ্র, অসভ্য। এসব কেন হচ্ছে? কারণ, আমরা নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়েছি। ঠাট্টা-বিদ্রূপের তোয়াক্কা করতে করতে আমরা আজ একেবারে নতজানু হয়ে পড়েছি। আর কত দিন? সিদ্ধান্ত নিন, দুনিয়ার মানুষ যা বলে বলুক, আমরা প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাত পালন করবই। দেখবেন, ইতিহাসের মোড় ঘুরে যাবে।

তিরস্কার আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত না নিলে তারা তিরস্কার করতেই থাকবে। আসলে মানুষ যখনই সত্যের পথে চলে তখনই তিরস্কার শুনতে হয়, গালমন্দও শুনতে হয়। আমাদের মূল্যই বা কতটুকু? নবীগণ পর্যন্ত এসবের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তাদের তিরস্কার মূলত সত্যের পথচারীর জন্য এক অনন্য ভূষণ। কুরআন মাজীদে রয়েছে, কাফেররা নবীগণকে বলতো–

مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

"আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না।" (সূরা হূদ : ২৭)

সুতরাং তিরস্কার সহ্য করা নবীগণের সুন্নাত। আমাদেরকেও এটা সহ্য করতে হবে। মরহুম কবি আসাদ মুলতানী এ সুবাদে একটি চমৎকার কবিতা বলেছেন–

ہنسے جانے سے تم جب تک ڈروگے

زمانہ تم پر ہنستا ہی رہیگا

"হাসি-ঠাট্টাকে যত দিন ভয় করবে, যামানা তোমাকে নিয়ে হাসতেই থাকবে।"

তাই আল্লাহর ওয়াস্তে দুনিয়ার তিরস্কার-ভীতি দূরে ঠেলে দিতে হবে। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল শুরু করুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে দুনিয়ার চিত্র পাল্টে যাবে, দুনিয়া 'ইনশাআল্লাহ' স্যালুট দিতে বাধ্য হবে। ইজ্জতের যিন্দেগী নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতেই রয়েছে। সুন্নাতের অনুসরণ করলে একদিন এ ইজ্জত আমাদের পদচুম্বন করবেই।

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জন্য মহা সুসংবাদ

ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের অনুসরণ এক মহান সৌভাগ্যের বিষয়। এর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রয়েছে এক তুলনাহীন সুসংবাদ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"(হে রাসূল!) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন।"

(সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে কী-ইবা ভালোবাসবে, তোমাদের হাকীকতই বা কী? তোমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে? হাঁ তোমরা যদি তাঁর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ কর, স্বয়ং আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

শায়খ ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার নিয়তে যে আমলটি করতে থাকবে, আল্লাহর ভালবাসা তখন তার সাথী হবে। যেমন বাথরুমে ঢোকার সময় বাম পা আগে দেয়া এবং اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ –এ দু'আ পড়া প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাত। যখনই তুমি সুন্নাতের নিয়তে আমলটি করবে, তখনই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা নিজের প্রিয় বানাবেন

অনুরূপভাবে আঙুল চেটে খাওয়া যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। কাজটি করলে অন্তত ওই মুহূর্তে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যাবে। শত আফসোস! মাখলুকের ভালবাসা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, অথচ মাখলুকের খালেকের ভালবাসা পাওয়ার সুযোগও আমাদের কাছে আছে। সুতরাং মাখলুকের প্রতি নজর কেন? সুন্নাতসমূহের প্রতি যত্নবান হোন। অভ্যাস না থাকলে অভ্যাস করুন। কারো কারো ধারণা, আজকাল সুন্নাতের উপর চেষ্টা করেও আমল করা যায় না, আমি বলি, এ 'কঠিন' তা আমাদের সৃষ্টি। অন্যথায় যেমন বলুন দেখি, আঙুল চেটে খাওয়া এমন কী কঠিন কাজ? কে কার হাত ধরে রেখেছে? তাই কঠিনের অনুরোধ মন-মানস থেকে ঝেড়ে ফেলুন। হতে পারে একটি মাত্র সুন্নাত আপনার নাজাতের ওসীলা হবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আলোচ্য হাদীসে যেহেতু অপরকে দিয়ে চাটানোর কথাও আছে, সেহেতু নিজে চাটতে না পারলে অপরকে দিয়ে করাবে। যেমন কোনো শিশু অথবা বিড়াল কিংবা পাখিকে দিয়ে চাটানো যেতে পারে। তবুও আল্লাহর রিযিক যেন নষ্ট না হয়। ধুয়ে ফেললে তা আল্লাহর রিযিক নষ্ট হয়ে গেলো। আল্লাহর মাখলুক চেটে খেলে তো বরকতও লাভ হলো।

পাত্র চেটে খাওয়া

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ : اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِىْ اَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم الحديث ٤٠٣٣)

"জাবির (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আঙুল ও বরতন চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জানা নেই, খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে।"

আলোচ্য হাদীসে খাওয়ার আরেকটি আদব বর্ণিত হলো। তাহলো, আঙুল চেটে খাওয়ার পর পাত্রও মুছে খাওয়া। উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রিযিকের অবজ্ঞা না করা। পাত্রে প্রচুর পরিমাণে খানা নিবে না। পরিমিত খাবার নিবে। এমনভাবে নিবে, যেন নষ্ট না হয়। প্লেটে অতিরিক্ত খাবার দেখলে অনেকে সমস্যায় পড়ে যায়, মনে করে– সব খাবার আমাকেই শেষ করতে হবে। মনে রাখবেন, প্লেটের সব খাবার শেষ করা জরুরী নয়। যতটুকু পারবেন, খাবেন। শরীয়তের মূল বিধান হলো, নেওয়ার সময় অতিরিক্ত না নেয়া। কেউ যদি নিয়েই নেয়, তার জন্য অতিরিক্তটা রেখে দেয়ারও সুযোগ আছে। এমনভাবে রেখে দিবে, যেন প্লেট নোংরা না হয় এবং প্রয়োজনে আরেকজনকে দেওয়া যায়। এটা ইসলামের তরীকা।

যখন চামচ দিয়ে খাবে

অনেক সময় হাতে খাওয়া যায় না; চামচ দ্বারা খেতে হয়। এমতাবস্থায় আঙুলের মধ্যে যেহেতু খাবার লাগেনি, তাই আঙুল চেটে খাওয়ার সুন্নাতের উপর আমল কিভাবে করে? এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, তখন চামচে লেগে থাকা খাবার পরিষ্কার করে খাবে। আশা করি, এতে সুন্নাতের ফযীলত অর্জিত হয়ে যাবে।

লোকমা যখন মাটিতে পড়ে যাবে

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ، فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم الحديث ٤٠٣٣)

"হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, খাওয়ার সময় লোকমা মাটিতে পড়ে গেলে তুলে নেয়া উচিত। যদি ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, ধুয়ে নিবে এবং খেয়ে নিবে। শয়তানের জন্য রেখে দিবে না। আঙুল চেটে খাওয়ার পূর্বে রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না। কেননা, জানা নেই, খাবারের কোন অংশে বরকত বর্তমান।"

অনেক সময় লোকমা মাটিতে পড়ে গেলে তুলে নেয়া লজ্জাজনক মনে হয়। এটা উচিত নয়। কারণ, এটাও রিযিক; অবজ্ঞা শোভনীয় নয়। অবশ্য পরিষ্কার করা সম্ভব নয়– এমনভাবে ময়লাযুক্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। তখন এটা হবে অপারগতা। এ সুবাদে একটি সাহাবা-কাহিনী শুনুন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)

দ্বীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী একজন জলীলুল কদর সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক গোপন কথা তিনি জানতেন। তাই তাকে বলা হতো আবুসসির তথা রহস্যবিদ। মুসলমানরা যখন ইরান আক্রমণ করলো, কিসরার বাদশাহ সমঝোতার আহ্বান জানালেন। মুসলমানের পক্ষ থেকে হযরত রিবঈ ইবনে আ'মির (রা.) ও হযরত হুযায়ফা (রা.) মনোনীত হয়েছিলেন। কিসরা ছিলো সমকালীন বিশ্বের Super Powr তথা মহাপরাশক্তি। ইরানের সভ্যতা-সংস্কৃতি তখন গোটা পৃথিবীতে ছিলো সমৃদ্ধ। রোম সভ্যতা ও ইরানী সভ্যতা ছিলো তৎকালীন পৃথিবীর অপারাজেয় সভ্যতা। তন্মধ্যে ইরানী সভ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে রোমীয় সভ্যতার চেয়ে প্রসিদ্ধিটা তার অধিক ছিলো।

যাহোক সাহাবীদ্বয় সমঝোতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁদের পোশাক ছিলো সাদামাটা ও পুরনো। দীর্ঘ সফর অতিক্রম করেছেন বিধায় কিছুটা ময়লাযুক্তও ছিলো। কিসরার দরবারে এই অবস্থায় প্রবেশ করা অন্যায়। প্রহরী তাঁদেরকে থামিয়ে দিলো। বললো, তোমরা এই প্রতাপশালী রাজ দরবারে এ

পোশাকে যাচ্ছো? দাঁড়াও। এ পোশাকে যাওয়া যাবে না। এ বলে সে পরিপাটি জুব্বা বের করে দিলো। বললো, এগুলো পরে নাও। রিবঈ ইবনে আমের (রা.) উত্তর দিলেন, বাদশাহর দরবারে যেতে হলে যদি তারই দেয়া পোশাক পরতে হয়, তাহলে আমরা যাচ্ছি না। আমরা এ পোশাকেই যেতে চাই। এতে যদি বাদশাহর অনুমতি না হয়, তাহলে আমাদের আগ্রহ নেই। তাঁর দরবারে যাওয়ার জন্য আমরা লালায়িত নই। আমরা ফিরে যাচ্ছি।

তরবারি দেখেছো, বাহুশক্তিও দেখে নাও

প্রহরী রাজ দরবারে বৃত্তান্ত জানালো। ইত্যবসরে রিবঈ ইবনে আমের (রা.) নিজের ভাঙ্গা তরবারির পেচানো কাপড় টেনেটুনে দিচ্ছিলেন। প্রহরী তা লক্ষ্য করে বললো, দেখি– কেমন তরবারি? তিনি তরবারিটা দিলেন। প্রহরী তরবারি হাতে নিয়ে বললো, এই তরবারি দিয়েই কি তোমরা ইরান জয়ের স্বপ্ন দেখছো? রিবঈ (রা.) উত্তর দিলেন, কেবল তরবারি দেখেছ, তরবারিওয়ালার বাহুখানা তো দেখনি! প্রহরী বললো, ঠিক আছে, তাহলে বাহুটাও দেখাও। রিবঈ (রা.) বললেন, তাহলে এক কাজ কর, তোমাদের সবচে' শক্ত-দুর্ভেদ্য ঢালটি নিয়ে আস। তারপর আমার বাহু দেখো। অবশেষে তা-ই করা হলো। যে ঢালটির কথা রূপকথার মতো সকলের মুখে মুখে ছিলো, দরবারের সেই ঢালটিই আনা হলো। রিবঈ (রা.) বললেন, মোকাবেলার জন্য একজন এগিয়ে আস। এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে রিবঈ (রা.)-এর সামনে দাঁড়ালো। তিনি ঢালটির উপর সজোরে আঘাত করলেন। তাঁর ভাঙ্গা তরবারির আঘাতে ঢালটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেলো। মন্তব্য করলো, খোদাই জানেন, এরা কেমন প্রাণী! অবশেষে সাহাবীদ্বয়কে ভেতরে ডেকে পাঠানো হলো।

এসব গর্দভের কারণে সুন্নাত ছেড়ে দেবো?

ভেতরে প্রবেশ করার পর তাঁদের সামনে খাবার আনা হলো। খাওয়ার সময় এক সাহাবীর হাত থেকে কিছু খাবার মাটিতে পড়ে গেলো। প্রিয় নবী (সা.)-এর শিক্ষা হলো, খাবার মাটিতে পড়লে নষ্ট হতে দেবে না। যেহেতু হতে পারে পতিত অংশটিই বরকতের অংশ। তাই সেটি তুলে নিবে। ময়লাযুক্ত হলে পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। নবী কারীম (সা.)-এর এ শিক্ষার কথা হুযায়ফা (রা.)-এর মনে পড়ে গেলো। তাই পতিত খাবারটুকু তুলে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। এ কাণ্ড দেখে পাশে উপবিষ্ট লোকটি হুযায়ফা (রা.)কে কনুই দ্বারা গুতো মারলেন এবং বললেন, এসব কী হচ্ছে? এ যে পরাশক্তি কিসরার দরবার! এ দরবারে এটা অভদ্রতা। অভদ্র আচরণ করলে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। দরবারের লোকেরা ভাববে, আপনারা ভুখা-নাঙ্গা মানুষ। তাই অন্তত আজকের জন্য আমলটি ছেড়ে দিন। প্রতিউত্তরে হুযায়ফা যা বললেন, তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। তিনি বলেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

"এসব গর্দভের কারণে আমি প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাতকে কি ছেড়ে দিবো?' এদের প্রশংসা কিংবা তিরস্কার; অসম্মান কিংবা পুরস্কার দিয়ে আমার কী হবে? এরা আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর তুলনায় আহম্মক। সুতরাং প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাত ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বলে তিনি লোকমাটি তুলে নিলেন এবং সকলের সামনেই খেয়ে নিলেন।

ইরান বিজেতা

কিসরার দরবারের নিয়ম ছিলো, বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন, অন্যরা তার সামনে দণ্ডায়মান থাকবে। রিবঈ ইবনে আ'মির (রা.) বাদশাহকে বললেন, আমরা অনুসরণ করি আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শিক্ষার। একজন বসা থাকবে, অন্যান্যরা দাঁড়িয়ে থাকবে– এটা তাঁর আনীত শিক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং আলোচনা এভাবে চলতে পারে না। বাদশাহ আমাদের মত দাঁড়াবেন বা আমরাও বাদশাহর মত বসবো, তারপর আলোচনা করবো। এটা শুনে বাদশাহ আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এরা তো দেখি আমার সর্বনাশ ডেকে আনছে। তৎক্ষণাৎ তিনি জ্বলে উঠলেন। নির্দেশ দিলেন, এর মাথায় কিছু মাটি উঠিয়ে দাও। এদের সঙ্গে আমার সমঝোতা হবে না। অবশেষে তাই করা হলো। রিবঈ ইবনে আ'মির এক টুকরি মাটি মাথায় করে দরবার থেকে চলে আসলেন। আসার সময় ইতিউতি করে সতর্ক ভঙ্গিতে বলে আসলেন, ওহে ইরানের বাদশাহ! জেনে রেখো, আজ তুমি আমার মাথায় ইরানের রাজত্ব তুলে দিলে।

ইরানের লোকেরা ছিলো অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ। তারা ভাবলো, এতো আমাদের জন্য কুলক্ষণ। বাদশাহ তড়িঘড়ি করে লোক পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন, এক্ষুনি ইরানের মাটি ছিনিয়ে আনো। কিন্তু রিবঈ ইবনে আমির (রা.)কে আর কে ধরে? তিনি সোজা চলে আসলেন মুসলিম শিবিরে। এ ছিলো ইরান বিজয়ীদের কৃতিত্ব।

কিসরার দম্ভ ধুলোয় মিটিয়ে দেয়া হলো

এবার বলুন, তাঁরা সম্মানিত ছিলেন নাকি সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে আমরা সম্মানিত? সুন্নাত ত্যাগ করে নয়; বরং সুন্নাতকে আঁকড়ে তাঁরা নিজেদের সম্মান

আদায় করে ছেড়েছেন। তাঁদের সমৃদ্ধ জীবনের কোনো তুলনা আছে কি? একদিকে তাঁরা লোকমা তুলে খেয়েছেন, অপরদিকে কিসরার দাম্ভিকতা ধুলোয় এমনভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهٗ

'এ কিসরার পতনের পর দ্বিতীয় আর কিসরা জন্ম নিবে না।'

বাস্তবেই কিসরার পতনের পর দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়াতে পারলো না। বিশ্বমঞ্চ থেকে সে একেবারেই মিটে গেলো।

বলতে চাচ্ছিলাম, খাওয়ার সুন্নাত হলো, নিচে পড়ে গেলে তুলে নিবে, প্রয়োজনে পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। অহেতুক লজ্জাবোধ মোটেও উচিত নয়। আমল করাই কর্তব্য।

তিরস্কারের ভয়ে সুন্নাত-ত্যাগ কখন বৈধ?

এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। ইতোপূর্বেও এর কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। অর্থাৎ যদি সুন্নাতটি এমন হয় যে, পরিত্যাগ করার অবকাশ আছে। তাহলে দেখতে হবে, আমল করতে গেলে কোনো মুসলমানের দিক থেকে তিরস্কার আসার সম্ভাবনা আছে কিনা? যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে একজন মুসলমানের ঈমান রক্ষার্থে সুন্নাতটি ছেড়ে দেয়া যাবে? যেমন হোটেলে ঢুকে যদি মাটিতে বসে খেতে চান, তাহলে নিশ্চিত তিরস্কারের মুখোমুখী হবেন। আর সুন্নাত নিয়ে তিরস্কার করলে ঈমান বাঁচানোর জন্য সুন্নাতটি ছাড়তে পারেন। পক্ষান্তরে সুন্নাত যদি এমন সুন্নাত হয়, যা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তাহলে তিরস্কারের ভয়ে সে সুন্নাত ছেড়ে দেয়া জায়িয নেই। অনুরূপভাবে তিরস্কারটা যদি মুসলমানের পক্ষ থেকে নয়; বরং অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হয়, তবে সেই সুন্নাতও পরিত্যাগ করার অনুমতি নেই। কেননা, তিরস্কারকারী তো এমনিতেই কাফির। সুতরাং সুন্নাতের তিরস্কার করে নতুন করে কাফির হওয়ার ভয় তার পক্ষ থেকে নেই।

খাওয়ার সময় মেহমান চলে এলে কি করবে?

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم الحديث ٤٠٥٩)

"হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। চারজনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট।"

এ হাদীসে একটি মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। তাহলো, খাওয়া চলাকালীন কোনো মেহমান অথবা ভিক্ষুক এলে এই বলে তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না যে, এখানে তো একজনের খাবার, শরীক করা হলে কম হয়ে যাবে। বরং তাকেও খাবারে শরীক করে নিবে। এতে আল্লাহ তাআলা বরকত দিবেন।

ভিক্ষুককে ধমক মেরে তাড়িয়ে দিবে না

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত কিংবা সমপর্যায়ের লোক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমরা মেহমান মনে করি না। অপরিচিত, অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে তো মেহমান ভাবার প্রশ্নই আসে না। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরাও মেহমান। আল্লাহ এদেরকে পাঠিয়েছেন। তাই যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন একজন মুসলমানের কর্তব্য। এ জাতীয় মেহমানকেও খাবারে শরীক করে নেয়া উচিত। বিশেষত খাওয়া চলাকালীন এলে তাড়িয়ে দেয়া তো একেবারে অনুচিত। সামান্য কিছু দিয়ে হলেও শরীক করবে। তাছাড়া কুরআন মাজীদের ভাষ্যমতে প্রমাণিত হয়, ভিক্ষুককে কোনো অবস্থাতেই তাড়িয়ে দেয়া যাবে না।

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

"কোনো ভিক্ষুককে কখনও ধমক দিবে না।"

অথচ অনেক সময় আমরা সীমালংঘন করে ফেলি। যার কারণে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখী হই।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

ঘটনাটি হযরত থানবী (রহ.) তাঁর মাওয়ায়েজে লিখেছেন। এক ধনী ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে বসে খাচ্ছিলেন। উন্নত খাবার বিধায় ঘটা করেই তারা বসেছেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক এলো, দরজার পাশে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই অস্বস্তিকর ও অপমানজনক মনে হলো। তাই ভিক্ষুককে তাদের ধমক শুনতে হলো এবং চলে গেলো।

কখনও কখনও মানুষের দু' একটি আমল এমন হয়, যার ফলে আল্লাহর গযব তেড়ে আসে। এ দম্পতির বেলায়ও তাই হলো। অল্প দিনের ব্যবধানে তাদের বিবাহ বন্ধনে চিড় ধরলো। এমনকি বিচ্ছেদের মত তিক্ত ঘটনাও ঘটে

গেলো। স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে এলো। চার মাস দশ দিন ইদ্দতের সময় পূর্ণ করলো। তারপর অন্যত্র দ্বিতীয়বারের মত বিবাহ হলো। দ্বিতীয় স্বামীও ছিলো ধনী। একদিন তারা দু'জন খেতে বসলো। ইত্যবসরে একজন ফকীর এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। স্ত্রী বললো, ইতোপূর্বে আমি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলাম। ভয় হয়, আল্লাহর কোনো গযব আবার আঘাত করে কিনা। তাই আমি একটু আসি। আগে ফকীরটাকে কিছু দিয়ে আসি। স্বামী বললো, ঠিক আছে যাও। আগে ফকীরকে বিদায় কর, তারপর খানা খাবো।

স্ত্রী দরজায় অপেক্ষমান ফকীরের কাছে যখন গেলো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো, এ যে তার পূর্বের স্বামী! ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠিয়ে দ্রুতগতিতে স্বামীর নিকট ফিরে এলো। বললো, ফকীরটা যে আমার প্রথম স্বামী! সে ছিলো খুব ধনী। একবার তার সঙ্গে খেতে বসেছিলাম, আজ যেমনিভাবে আপনার সঙ্গে বসেছি। এমন সময় দরজায় এক ভিক্ষুকের আওয়াজ শুনলাম। ভিক্ষুকটিকে আমার এ স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছিলো। যার কারণে সেও আজ ভিক্ষার ঝুলি নিলো।

বৃত্তান্ত শোনার পর স্বামী বললো, আরও বিস্ময়কর সংবাদ শুনবে কি? স্ত্রী বললো, বলুন, শুনবো। স্বামী বললো, জানো তোমাদের দরজার সেদিনকার সেই ফকীর আজ তোমার স্বামী। আমাকেই তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

এই হলো আল্লাহর কারিশমা। ধন-দৌলতের মালিককে বানালেন ফকীর। ফকীরকে করলেন ধনী। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

'হে আল্লাহ! প্রাপ্তির পর বিনাশ থেকে পানাহ চাই।'

উক্ত ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, ভিক্ষুকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষ উলামায়ে কেরাম এর অনুমতি দিয়েছেন। তবে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে এতদূর যেন না গড়ায়। বরং প্রথমে কিছু দিয়ে দিবে, তারপর বিদায় করবে।

উক্ত হাদীসের আরেকটি মর্মার্থ হলো, খাবারের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। বরং কম-বেশি খাওয়ার অভ্যাস করবে। যেন প্রয়োজনে সমস্যা না হয়। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর বাণী

এ পর্যন্ত খাওয়ার অধিকাংশ সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা হলো। যদি আমলে না থাকে, আজ থেকে আমল করার নিয়ত করুন। বিশ্বাস রাখুন, সুন্নাতের মাঝে

যে নূর, তাৎপর্য ও বিস্ময়কর ফায়দা আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, এসব ছোট ছোট সুন্নাতের উপর আমল করা দ্বারা তা ইনশাআল্লাহ হাসিল হয়ে যাবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর বাণী কেবল শুনতেই মনে চায়। তিনি বলেছিলেন–

আল্লাহ আমাকে জাহিরী ইলমের দৌলত যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ মোটকথা বহু জাহিরী ইলম দ্বারা 'আলহামদুলিল্লাহ' আমি ধন্য হয়েছি। এতে উল্লেখযোগ্য বুৎপত্তি লাভ করেছি। তারপর মনে জাগলো, এবার দেখা উচিত, সুফীগণ কী বলেন এবং কী করেন। ফলে তাদের প্রতিও মনোযোগী হলাম এবং ধন্য হলাম। সুফী সম্প্রদায়ের চার তরীকা তথা সোহরাওয়ারদিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া– এদের কার কী শিক্ষা, জানার প্রতি আমার আগ্রহ হলো। সবার দ্বারে দ্বারে গেলাম। তাদের যাবতীয় আমল, সবক, যিকির-আযকার, মুরাকাবা, মুশাহাদা ও চিল্লা সমাপ্ত করলাম। এসব কিছু করার পর আল্লাহ আমাকে উঁচু মাকামে পৌছালেন। এমনকি নবী করীম (সা.) স্বয়ং আমাকে তাঁর পবিত্র হাতে 'খালআ' পরালেন। তারপর আল্লাহ আমার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিলেন। ফলে 'আসল' পর্যন্ত পৌছলাম। তারপর সেখান থেকে 'জিল' পর্যন্ত পৌছলাম। তারপর আল্লাহ আমাকে এমন স্থানে পৌছালেন, যদি প্রকাশ করি– উলামায়ে জাহেরীগণ আমার উপর কুফরের ফতওয়া আরোপ করবেন এবং উলামায়ে বাতেন আরোপ করবেন যিন্দীকের ফতওয়া। কিন্তু আমার কী-ই-বা করার আছে। আল্লাহ তাআলা নিজ বেশুমার অনুগ্রহে সত্যি সত্যি এসব মাকাম দান করেছেন। এখন আমি এতসব অর্জন করার পর একটি দুআ সর্বদা করে থাকি– যে ব্যক্তি এ দু'আর উপর 'আমীন' বলবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। দু'আটি এই–

'হে আল্লাহ! আমাকে প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দিন– আমীন। হে আল্লাহ! প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমাকে জীবিত রাখুন– আমীন। হে আল্লাহ! প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমার জীবন অবসান করুন– আমীন।'

সুন্নাতের উপর আমল করো

সুতরাং সকল স্তরের শেষ কথা– নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করা। যা কিছু পাবে, তাঁর সুন্নাতের বদৌলতেই পাবে। মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) সকল স্তর অতিক্রম করেছেন, তারপর এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তোমরা প্রথম দিনেই এ সিদ্ধান্ত নিতে পার যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করবো। তাঁর সকল সুন্নাত কাজে লাগাবো। তারপর দেখবে, জীবন

কিভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে। জীবনের স্বাদ তখনই বুঝে আসবে। মনে রাখবে, গুনাহ ও অশ্লীলতার মাঝে জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। যারা সুন্নাতী জীবন যাপন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, জীবনের মজা কত। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলতেন, জীবনের যে স্বাদ আমি পেয়েছি, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যদি তার সন্ধান পায়, তাহলে তরবারি কোষমুক্ত করে আমার কাছে চলে আসবে এবং এ 'স্বাদ' ছিনিয়ে নেয়ার জন্য লড়াই করবে। তরবারির ঝনঝনানি আমাদের প্রয়োজন নেই। আসুন, সুন্নাতমাফিক জীবন গড়ুন। আর সে স্বাদ অনুভব করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"সমুদ্র থেকে পানি উঠিয়ে পর্বত চূড়ায় সংরক্ষণ করা এবং পুনরায় ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে পৌঁছানোর- এ বিশাল কর্মধারায় মানুষের শ্রম, চিন্তা, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার কোনোই ভূমিকা নেই। পানির যে 'ঢোক' আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠনালি দিয়ে ভেতরে গড়িয়ে দেই- এর প্রতিটি ফোঁটা আল্লাহর এক বিশাল কুদরতি ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, পানি পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবে।" মূলত এর মাধ্যমে তিনি উম্মতের জন্য চিন্তার এক আলোকিত দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।"

পান করার ইসলামী শিষ্টাচার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا، يَعْنِىْ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْاِنَاءِ (مسلم، كتاب الاشربة، باب كراهة التنفس في نفس الاناء)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَلٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (ترمذى، كتاب الاشربة، باب ما جاء في التنفس في الاناء)

হামদ ও সালাতের পর!

খাওয়ার আদব সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস আমরা এ যাবত শুনে এসেছি। এ পর্যায়ে পান করার আদব সম্পর্কীয় হাদীসগুলো আলোচনা করা হবে। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কোনো পানীয় তোমরা তিন নিঃশ্বাসে পান করবে। নিঃশ্বাস নেয়ার সময় পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিবে।

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, পানীয় বস্তু উটের মতো এক নিঃশ্বাসে পান করবে না। অর্থাৎ এক সঙ্গে পাত্রের সব পানি খালি করে ফেলা যেন উটের কাজ;

মানুষের কাজ নয়। তাই তোমরা এভাবে পান করবে না। বরং দুই নিঃশ্বাসে অথবা তিন নিঃশ্বাসে পান করবে এবং শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে।

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) একটি পুস্তিকা লিখেছেন। 'বিসমিল্লাহর ফাযায়েল ও মাসায়েল' নামক পুস্তিকাটি ছিলো ইলম ও মারিফাতের সমুদ্রসম। যেন ছোট পুকুরে একটি সমুদ্র সমৃদ্ধ করা হয়েছে। পুস্তিকাটি পড়লে চোখ খুলে যাবে। তিনি সেখানে যা লিখেছেন তার সার সংক্ষেপ হলো- যে পানি তোমরা নিমিষেই পান করে নিচ্ছ, এর ব্যাপারে কি একটু ভেবেছো? কোথায় ছিলো এ পানি এবং তোমাদের কাছেই কিভাবে আসলো?

কুদরতের কারিশমা

পানির গোটা ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের মাঝে রেখেছেন। অথচ সমুদ্রের পানিকে তিনি লবণাক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, সমুদ্রের পানি যদি মিঠা হতো, তাহলে কিছু দিন পরেই সব নষ্ট হয়ে যেতো। লাখো সৃষ্টিজীব সমুদ্রে পঁচে ও গলে, তবুও সমুদ্রের পানি নষ্ট হয় না কেন এবং স্বাদে ও গন্ধে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না কেন? কারণ, সমুদ্রের পানি লবণাক্ত বিধায় লাখো জানোয়ার হজম করার শক্তি তার আছে।

যদি আমাদেরকে বলা হতো, পানির প্রয়োজন পূরণ করবে সরাসরি সমুদ্র থেকে। তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা বিড়ম্বনায় পড়ে যেতাম। সমুদ্র থেকে পানি জোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা! জোগাড় করলেও তা পান করার উপযোগী তো নয়। তাই আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন, তিনি সমুদ্রের পানিকে নীরবে বাষ্পাকারে উঠিয়ে নেন ও মেঘমালায় পরিণত করেন। উঠানোর প্রক্রিয়াটাও আশ্চর্য বৈ কি? এ প্রক্রিয়ার মাঝেও তিনি এমন স্বয়ংক্রিয় মেশিন করেছেন যে, লবণাক্ত পানির 'লবণ' সমুদ্রে থেকে যায়। সমুদ্রের লোনা পানি মিঠা করার এ এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা তিনি করেছেন, যেন এর পেছনে মানুষের কোনো শ্রম বা অর্থ ব্যয় করতে না হয়।

আল্লাহ মেঘমালা থেকে সুমিষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মানুষের এ শক্তি নেই যে, সারা বছরের অথবা ছয় মাসের পানি একত্রে সঞ্চয় করে রাখবে। সেজন্য তিনি ভাসমান মেঘমালার পানি পাহাড়ে বর্ষণ করে জমাট আকারে পাহাড়ে সংরক্ষণ করেন। পানির মনোরম এ হিমাগার পাহাড় চূড়ায় হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য সৃষ্টি করার পাশাপাশি আমাদের পিপাসাও নিবৃত্ত করে।

উপরন্তু মানুষ নিজে গিয়ে সে তুষার ভাণ্ডার থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় না। বরং তিনি সূর্যের তাপ দ্বারা বরফ গলিয়ে নদী ও পাহাড়ী ঝর্ণা তৈরি করেন এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায় পানি সরবরাহের এমন পাইপ লাইন বিছিয়ে দেন

যে, মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তেই মাটি খনন করে পানি আবিষ্কার করতে পারে। আল্লাহ বলেন-

فَأَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ

'অতঃপর আমি পানিকে যমীনের বুকে সংরক্ষিত করি।' (সূরা মুমিনূন : ১৮)

সমুদ্র থেকে পানি উঠিয়ে পর্বতচূড়ায় সংরক্ষণ করা এবং পুনরায় ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে পৌছানোর- এ বিশাল কর্মধারায় মানুষের শ্রম, চিন্তা, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার কোনোই ভূমিকা নেই। পানির যে 'ঢোক' আমরা এক মুহূর্তে কণ্ঠনালি দিয়ে গড়িয়ে দেই- এর প্রতিটি ফোঁটা আল্লাহর এক বিশাল কুদরতি ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে আমাদের পর্যন্ত পৌছে। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পানি পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলো।' মূলত এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা পানি নামক নেয়ামতটি ভোগ করার পূর্বে আল্লাহর এই বিরাট অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমাদের অধর পর্যন্ত পানির প্রতিটি ফোঁটা পৌছানোর জন্য তিনি তাঁর বিশ্ব জগতের কতগুলো সৃষ্টিকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ।

একটি সাম্রাজ্য এবং এক গ্লাস পানি

একবার বাদশাহ হারুনুর রশিদ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। চলতে চলতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। পাথেয় যা এনেছিলেন, সব আগেই শেষ করে ফেলেছেন। ইতোমধ্যে প্রচণ্ড পিপাসাও পেয়েছে। হঠাৎ একটু দূরে একটি কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং ঘরের মালিককে বললেন, 'ভাই! একটু পানি দাও।' মালিক ছিলেন একজন দরবেশ- পানি আনলেন এবং বাদশার হাতে দিলেন। বাদশাহ পানি পান করার জন্য ঠোঁটের কাছে নিচ্ছিলেন, তখন দরবেশ বলে উঠলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! একটু থামুন।' বাদশাহ নিরস্ত হলেন। দরবেশ বললেন, 'বলুন তো প্রচণ্ড পিপাসার মুহূর্তে পানির জন্য আপনি প্রয়োজনে কী পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবেন?' বাদশাহ বললেন, 'পানি তো এমন এক জিনিস যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই আমি প্রচণ্ড পিপাসার মুহূর্তে পানির জন্য আমি প্রয়োজনে আমার অর্ধ রাজত্ব ব্যয় করবো।' দরবেশ বললেন, 'এবার পান করুন।' তিনি পান করা শেষ করলে দরবেশ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! এ এক গ্লাস পানি যদি আপনার দেহের ভেতরে থেকে যায়, বাইরে বের হতে না পারে। তখন তা বের করার জন্য আপনি কী পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবেন?' বাদশাহ উত্তর দিলেন, 'ভাই! এটা তো আরো বড় মুসিবত। এ মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে আমি অবশিষ্ট অর্ধেক

রাজত্বও ব্যয় করে ফেলবো।' তখন দরবেশ বললো, 'তাহলে আপনার গোটা রাজত্বের মূল্য হলো— এক গ্লাস পানি। আপনি একবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছেন, আল্লাহ আপনাকে প্রতিদিন কতটি রাজত্ব দান করেন।'

ঠাণ্ডা পানি : এক মহান নেয়ামত

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) একবার হযরত থানভী (রহ.)কে বলেন, 'মিয়াঁ আশরাফ আলী! পানি পান করতে চাইলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে। যেন তোমার শিরা-উপশিরা থেকে আল্লাহর শোকর প্রকাশ পায়।' সম্ভবত এ কারণেই রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমি খুব পছন্দ করি। একটি হলো, ঠাণ্ডা পানি। রাসূল (সা.) কোনো পানাহারের বস্তু ঘটা করে জোগাড় করেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু একমাত্র ঠাণ্ডা পানি তিনি দুই-তিন মাইল দূর থেকেও সংগ্রহ করেছেন। 'বীরে গরস' নামক কূপ— যার চিহ্ন এখনও মদীনাতে আছে, সেখান থেকে গুরুত্বসহ ঠাণ্ডা পানি জোগাড় করতেন।

তিন শ্বাসে পানি পান করা

উল্লিখিত হাদীস সমূহে রাসূল (সা.) পানি পান করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আদব হলো, তিন শ্বাসে পানি পান করা। এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ পদ্ধতিতে পানি পান করা উত্তম। দুই কিংবা চার শ্বাসেও পান করা যাবে। তবে এক শ্বাসে সকল পানি শেষ করে দেয়া উত্তম নয়। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে এক শ্বাসে পানি পান করা ঠিক নয়। যাহোক, আমাদের দেখার বিষয় হলো, রাসূল (সা.) এ পদ্ধতিতে পানি পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে এক শ্বাসে পান করা যদিও হারাম নয়; তবে উত্তমও নয়।

প্রিয়নবী (সা.)-এর শান

তিনি আমাদের রাসূল। রাসূল হিসাবে যে আদেশ-নিষেধ করেন, তা মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। রাসূল হিসাবে তিনি যে নিষেধাজ্ঞা করেন, সেটা আমাদের জন্য হারাম। পক্ষান্তরে উম্মতের জন্য তিনি একজন দরদী রাহবারও। যে পথে ও যে কাজে কল্যাণ রয়েছে, সে পথ ও কাজের প্রতিই তিনি দিঙনির্দেশনা দেন। প্রয়োজনে আদেশ করেন, প্রয়োজনে নিষেধ করেন। এ আদেশ-নিষেধ হলো, তাঁর কোমলতার পরিচয়। এটি হলো উম্মতের জন্য দরদী নবীর পরামর্শ। এটি প্রকৃত আদেশ নয়; প্রকৃত নিষেধ নয়। তাই মেনে চলা উম্মতের নৈতিক

দায়িত্ব হলেও শরঈ কর্তব্য নয়। এজন্য কেউ কাজটি না করলে— একথা বলা হবে না যে, সে গুনাহ করে ফেলেছে। হাঁ, একথা অবশ্যই বলা হবে যে, সে প্রিয় নবী (সা.)-এর পছন্দনীয় তরীকা পরিহার করেছে। আর যে ব্যক্তির হৃদয়ে নবীজী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা আছে, সে ব্যক্তি হারাম কাজগুলো তো অবশ্যই পরিত্যাগ করে, পাশাপাশি যে কাজ প্রিয়নবী (সা.) পছন্দ করেন না— তাও পরিহার করে।

পানি পান করো, সাওয়াব কামাও

এজন্য ফিকহ শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণে আমি বলেছিলাম, এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা হারাম নয় এবং গুনাহও নয়। তবে নবী (সা.)-এর প্রকৃত আশেকের জন্য এটা শোভনীয় নয়। যার অন্তরে নবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা আছে, সে এ ধরনের কাজের কাছেও যাবে না। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এক নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ পান করা অনুত্তম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মাকরূহে তানযিহী। পানি যখন পান করবোই, তখন অযথা একটি অনুত্তম কিংবা মাকরূহে তানযিহী কাজ কেন করতে যাবো? তিন নিঃশ্বাসে পান করলে প্রিয় নবী (সা.) খুশি হবেন। তাঁর সুন্নাত আদায় হবে। পানি পান ইবাদতে পরিণত হবে। নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র হওয়া যাবে। একটু মনোযোগ দিলেই এতসব সাওয়াব পাবে। তাই অবহেলা না করে সুন্নাতমাফিক আমল করাটাই ভাল হবে।

মুসলমান হওয়ার নিদর্শন

দেখুন, প্রত্যেক ধর্ম কিংবা মতবাদের স্বতন্ত্র কিছু শিষ্টাচার আছে। শিষ্টাচার হলো, একটি ধর্মের জন্য প্রতীক স্বরূপ। তিন নিঃশ্বাসে পান করাটাও মুসলিম মিল্লাতের একটি ধর্মীয় প্রতীক। কচি বয়স থেকেই এগুলো শেখাতে হবে। কচি মনে গেঁথে দিতে হবে এসব আদব ও শিষ্টাচার। কোনো শিশু এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে কোমলভাবে বলে দিতে হবে, 'বেটা! এটা ইসলামের তরীকা নয়, বরং ইসলামের তরীকা হলো, তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা। সুতরাং এভাবে না করে এভাবে কর।' আল্লাহর এমনও আশেক আছেন যে, এক ঢোক পানিও তিন নিঃশ্বাসে পান করেন। সুন্নাতের অনুসরণের লক্ষ্যে তাঁরা প্রতিটি কাজ নবীজী (সা.)-এর পছন্দমাফিক করতেন।

পাত্র মুখ থেকে সরিয়ে নিঃশ্বাস নিবে

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ (ترمذى، كتاب الأشربة)

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) পাত্রের মাঝে নিঃশ্বাস নেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটির বিস্তারিত বিবরণ অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে যে, এক লোক রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! পান করার সময় বারবার আমার নিঃশ্বাস নিতে হয়, আমি নিঃশ্বাস কিভাবে নিবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, যখন নিঃশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হবে, তখন পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে রাখবে। কিন্তু পান করার সময় পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ফেলবে না অথবা ফুঁ দিবে না। সুতরাং এ ধরনের কাজ আদব ও সুন্নাত পরিপন্থী।

একটি আমলে কয়েকটি সুন্নাতের সাওয়াব

ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, সুন্নাতসমূহের উপর আমলের নিয়ত করা লুটের মালের মত। অর্থাৎ একটি আমলের মাঝে যতগুলো সুন্নাতের নিয়ত করবে, ততটি সুন্নাতের সাওয়াব পেয়ে যাবে। যেমন তিন নিঃশ্বাসে পান করা একটি সুন্নাত। পরে থেকে মুখ সরিয়ে নেয়া আরেকটি সুন্নাত। একই সাথে এ দু'টি সুন্নাতের নিয়ত করা কত সহজ। তবে সুন্নাত সম্পর্কে যে, কোনটি সুন্নাত। সুন্নাত সম্পর্কে ইলম যত বেশি থাকবে, নিয়তের মাধ্যমে তত বেশি সাওয়াব লাভ করতে পারবে।

ডান দিক থেকে বন্টন শুরু করবে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ : اَلْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ (ترمذي، كتاب الأشربة)

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আদবের কথা বলেছেন। আদবটি মুসলিম উম্মাহর নিদর্শনও বটে। অথচ আমাদের সমাজে এ বিষয়েও অবহেলা করা হয়। আদবটি উক্ত হাদীসে বিবৃত হয়েছে একটি ঘটনার মাধ্যমে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পানি মিশ্রিত কিছু দুধ নিয়ে এলো। এ মিশ্রণটা ছিলো বিশেষ কোনো কারণে; দুধ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়। বরং আরবের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো, নির্ভেজাল দুধের চেয়ে পানি মিশ্রিত দুধের মধ্যে তুলনামূলক ভিটামিন অধিক। রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত দুধ থেকে কয়েক ঢোক পান করে বাকিটুকু উপস্থিতদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সে সময় তাঁর ডান দিকে উপবিষ্ট ছিলো এক গ্রাম্য আরব। আর বাম দিকে উপবিষ্ট ছিলেন হযরত আবু

বকর সিদ্দীক (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশিষ্ট দুধটুকু প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)কে না দিয়ে ডান দিকে উপবিষ্ট গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি ডান দিকে আছে, সর্বপ্রথম সেই পাওয়ার অধিক হকদার।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর ভাষায়– 'সিদ্দীক' বলা হয়, ওই ব্যক্তিকে যিনি নবীর প্রতিচ্ছবি হন। রাসূল (সা.) আয়নার সামনে দাঁড়ালে তাঁর সত্তা যদি নবী হয়, তাহলে আয়নার দেদীপ্যমান প্রতিচ্ছবির নাম হলো সিদ্দীক। রাসূল (সা.)-এর খলীফা বলতে যা বুঝায়– সিদ্দীকের ব্যক্তি সত্তার মাঝে তা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়াতের মর্যাদার পরিবর্তী স্থান যে ব্যক্তির তিনি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তাই হযরত উমর (রা.) একবার সিদ্দীকে আকবর (রা.)কে বলেছিলেন, গোটা জীবন যেসব আমল করেছি, সবগুলো আপনি নিয়ে নিন, তবে তার পরিবর্তে সেই এক রাত্রের সাওয়াব আমাকে দান করুন, যে রাতে আপনি প্রিয় নবী (সা.)-এর সঙ্গে হেরা গুহাতে কাটিয়েছিলেন। এত বড় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) দুধের পেয়ালাটা প্রথমে আবু বকর (রা.)কে দেননি; বরং গ্রাম্য ব্যক্তিটিকে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এর কারণও বলে দিয়েছেন যে, ডানের লোকের হক অধিক। ডানের পর আসবে বামের পালা। একটু ভাবুন, বন্টনের ক্ষেত্রে ডানকে প্রাধান্য দেয়ার গুরুত্ব কত বেশি।

বরকতময় ডান দিক

ডান দিককে আরবী ভাষায় يمين বলা হয়। যার অর্থ হলো, বরকতময়। সুতরাং ডান দিক থেকে শুরু করাটাও হবে বরকতময়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ডান হাতে খাও, ডান হাতে পান কর, ডান পায়ের জুতা প্রথমে পরিধান কর, চলার সময় ডান দিক থেকে চল। এমনকি রাসূল (সা.) ডান দিক থেকে চিরুনি চালাতেন, তারপর বাম দিক থেকে আঁচড়াতেন। তাঁর নিকট ডানের গুরুত্ব এত বেশি ছিলো। সুতরাং খাবারের মজলিসে বন্টন করবে ডান দিক থেকে। ডান মানে নবীজী (সা.)-এর সুন্নাত। নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতেই রয়েছে বরকত।

ডান দিকের গুরুত্ব

অপর হাদীসে এসেছে, একবার প্রিয় নবী (সা.)-এর দরবারে কোনো পানীয় আনা হলো, তিনি পান করলেন। কিন্তু অবশিষ্ট রয়ে গেলো। তাঁর ডান পাশে উপবিষ্ট ছিলো এক তরুণ। আর বাম পাশে ছিলো এমন কিছু লোক যারা বয়সে

ও জ্ঞানের দিক থেকে বড়। তিনি ভাবলেন, নিয়ম মতো ডান পাশের তরুণটি আগে পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু বাম পাশে যেহেতু বড়রা আছেন, তাদেরও মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাই তিনি তরুণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যেহেতু তুমি ডানে আছো, তাই নিয়মের কথা হলো– অবশিষ্ট এ পানীয়টুকু তুমি পাবে কিন্তু তোমার বামে যেহেতু বড়রা আছেন, তাই তুমি অনুমতি দিলে এইটুকু পানীয় তাদেরকে দিয়ে দিতে পারি। তরুণটি ছিলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে উত্তর দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্য ক্ষেত্রে হলে অবশ্যই আমি তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতাম। কিন্তু পানীয়টুকু কার মুখের– সেটাও তো দেখতে হবে। আপনার পবিত্র মুখের পানীয় আমি অন্য কাউকে দেবো না। আমার অধিকার যেহেতু, সেহেতু আমাকেই দিন। অবশেষে রাসূল (সা.) তরুণকেই দিলেন। এ তরুণ ছিলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। (মুসলিম)

দেখুন, রাসূল (সা.) নিয়মের বিপরীত কাজ করেননি। অথচ আমরা লৌকিকতাবশত প্রতিনিয়ত নিয়ম পরিপন্থী কাজ করি।

বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ، يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا وَيُشْرَبَ مِنْهَا (مسلم، كتاب الأشربة)

এ হাদীসে আরেকটি আদবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মশকের মুখ মুড়ে সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। বর্তমানের পানির গ্যালনের মতো, ওই যুগে ছিলো পানির মশক। গ্যালনে বা মশকে তথা বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন।

নিষেধের কারণ দু'টি

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, নিষেধের কারণ ছিলো দু'টি। প্রথমত, গ্যালন কিংবা মশক যেহেতু সাইজে বড় হয়, বিধায় ভেতরে কোনো বস্তু পড়ে মরে থাকা এবং এর দ্বারা পানি দূষিত হয়ে যাওয়া কিংবা অপবিত্র হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়ত, বড় পাত্র থেকে পান করতে গেলে এক সঙ্গে অনেক পানি গলায় আটকে যেতে পারে। এতে পানকারীর সমস্যা হতে পারে। তাই বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করা নিষেধ।

উম্মতের জন্য দরদ

একটু পূর্বে বলেছিলাম, এ জাতীয় হাদীস মূলত রাসূল (সা.)-এর দরদের বহিঃপ্রকাশ। উম্মতের জন্য তাঁর এ দরদ তিনি দেখিয়েছেন, উম্মতকে আদব শেখানোর উদ্দেশ্যে। অন্যথায় বড় পাত্রের মুখে পান করা হারাম নয়। প্রয়োজনে পান করা যাবে। যেমন দু'-একবার রাসূল (সা.)ও করেছেন। হ্যাঁ, আদবের পরিপন্থী তো অবশ্যই। তাই বিরত থাকা ভালো। জরুরতের সময় সুযোগ আছে পান করার।

মশকে মুখ লাগিয়ে পান করা

وَعَنْ اُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ، اُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِىْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا، فَقَطَعْتُهُ (ترمذى، كتاب الأشربة)

বিশিষ্ট কবি সাহাবী হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.)-এর সহোদরা কাবাশাহ বিনতে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। ঘরে একটি মশক ঝুলন্ত ছিলো। তিনি মশকের মুখে নিজ মুখ লাগিয়ে পান করলেন দাঁড়িয়ে। হযরত কাবাশাহ বলেন, তিনি যখন চলে গেলেন, তখন আমি মশকের কাছে গেলাম এবং তার পবিত্র ঠোঁট যেখানে লেগেছে, সে অংশটি আমি কেটে সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিলাম।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, নিষেধের হাদীস ছিলো, আমাদের জন্য দরদের হাতছানি। পক্ষান্তরে এ হাদীসটি হলো, প্রয়োজনের সময় মশকের মুখে পান করার অনুমতি।

প্রিয়তমের পবিত্র ঠোঁট যে জায়গা স্পর্শ করেছে, কাবাশাহ (রা.)-এর নিকট সেটি 'মুবারক' হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি হেফাযত করেছেন। এ ছিলো সাহাবায়ে কেরামের নবীপ্রেমের নমুনা। প্রিয়তম নবী (সা.)-এর জন্য তাঁরা থাকতেন সর্বদা নিবেদিত।

বরকতময় চুল

রাসূল (সা.)-এর এক সাহাবী আবু মাহযূরা (রা.)। রাসূল (সা.) তাঁকে মক্কা শরীফের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণকালে রাসূল (সা.) তাঁর মাথায় আদর করে হাত রেখেছিলেন। হযরত আবু মাহযূরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার চুলের যে

অংশ স্পর্শ করেছেন, সে অংশ আমি আজীবন কর্তন করিনি। কারণ প্রিয় নবী (সা.)-এর হাতের ছোঁয়া থেকে বরকত লাভ করেছি।

তাবাররুকের তাৎপর্য

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বস্তু কিংবা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের কোনো জিনিস বরকতের নিয়তে রাখা যাবে। বর্তমানে অনেকে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে। কেউ কেউ আবার সংকীর্ণতা দেখায়। প্রথম পক্ষের ধারণা হলো, তাবাররুকই সবকিছু। আর দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হলো, যে কোনো তাবাররুক শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ প্রকৃত সত্য এতদুভয়ের মাঝামাঝি। অর্থাৎ 'তাবাররুক' শিরকের বাহনও নয় কিংবা সবকিছুও নয়। বরং তাবাররুক হলো, আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার একটা ওসীলা। এর মাধ্যমে আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়, বিধায় বরকতও নাযিল হয়। একে শিরক আখ্যা দেয়া যাবে না, যেমনিভাবে একে 'সবকিছু' ভাবা যাবে না। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মানে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়া এবং সংকীর্ণতা দেখানো মানে আল্লাহওয়ালার সঙ্গে বেয়াদবী করা। সুতরাং উভয়টাই পরিহার করে মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

বরকতময় দিরহাম

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির (রা.)। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কিছু দিরহাম দিয়েছিলেন। তিনি দিরহামগুলো খরচ করেননি। আজীবন নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিলেন। রাসূল (সা.)-এর দানকৃত দিরহাম বরকতময় মনে করে এভাবে তার মূল্যায়ন করলেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদেরকেও অসিয়ত করে গেলে দিয়েছেন, 'দিরহামগুলো আমাকে আমার প্রিয়তম হাবীব (সা.) দান করেছেন। এগুলো তোমরা কখনও খরচ করবে না। বরকত হিসাবে দিরহামগুলো নিজেদের কাছে রাখবে।' পরবর্তীতে দেখা গেছে, জাবির (রা.)-এর বংশে দীর্ঘকালব্যাপী এটি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অবশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত এক পরিস্থিতিতে সেগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় নবীজী (সা.)-এর বরকতময় ঘাম

মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সালীম (রা.)। প্রিয়নবী (সা.)কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি বলেন, 'একদিন দেখতে পেলাম, প্রিয় নবী (সা.) শুয়ে আছেন। গরমের মওসুম ছিলো। প্রিয়তম (সা.)-এর পবিত্র শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিলো। আমি একটি শিশি নিলাম। ঘামগুলো যত্নের সঙ্গে শিশিতে ভরে

রাখলাম। কস্তুরি কিংবা জাফরানের সুগন্ধি নবীজী (সা.)-এর ঘামের সুগন্ধির কাছে কিছুই মনে হলো না। আমার ঘরে সুগন্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন হলে এখান থেকে সামান্য একটু নিতাম এবং অন্য সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতাম। বরকতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘামগুলো আমার ঘরেই ছিলো। ব্যবহার করতে করতে একদিন শেষ হয়ে গেলো।'

বরকতময় চুল

এক মহিলা সাহাবী বলেন, 'প্রিয় নবী (সা.)-এর কিছু চুল সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতে আসে। আমি একটি শিশির ভেতর পানি ঢুকিয়ে বরকতময় চুলগুলো সেখানেই রেখে দিলাম। আমাদের কেউ অসুস্থ হলে শিশিটি থেকে এক দু' ফোটা পানি অন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে নিতাম এবং রোগীকে পান করাতাম। এতে রোগ ভালো হয়ে যেতো।'

মোটকথা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) থেকে প্রাপ্ত জিনিসের এভাবে মূল্য দিয়েছেন। বরকত লাভের নিয়তে আজীবন সংরক্ষণ করেছেন। তারপর বংশ পরম্পরায় সেগুলো সংরক্ষিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবাররুক

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, 'মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে যেখানে রাসূল (সা.) অবস্থান করতেন, সেখানে আমিও অবস্থান করি এবং দু' রাকাত নফল নামায পড়ি, তারপর সামনে অগ্রসর হই।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর তাবাররুকগুলোকে এভাবেই গুরুত্ব দিতেন, যত্ন নিতেন এবং হেফাযতের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে বাড়াবাড়ি কিংবা কম-বেশি ছিলো না। শিরক কিংবা বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ তাঁদের থেকে কল্পনাও করা যেতো না।

প্রতিমা পূজা যেভাবে শুরু হয়

বাড়াবাড়ির পথ ধরেই শুরু হয় আরবদের মাঝে প্রতিমা পূজার প্রচলন। তাবাররুক নিয়ে সীমালংঘন– তাদেরকে শিরক পর্যন্ত নিয়ে আসে। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মা হযরত হাজিরা (আ.) অবস্থান করেছিলেন মক্কা নগরীর বায়তুল্লাহর পাশে। ইসমাঈল (আ.) সেখানেই বড় হয়েছেন। তারপর জুরহুম গোত্রের লোকজন মক্কাতে বসবাস শুরু করে। ফলে মক্কা নগরী পরিণত হয় একটি আবাদি জনপদে। দীর্ঘকাল অবস্থানের পর জুরহুম গোত্র ও অন্য গোত্রের মাঝে লড়াই দেখা দেয়। লড়াইতে জুরহুম গোত্র পরাজয় বরণ করে এবং মক্কা

নগরী থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। যখন তারা মক্কা নগরী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো, তখন প্রাণের নগরীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তারা যে যেটা পেরেছে, এখান থেকে সাথে করে নিয়ে যায়। কেউ নিয়েছে মাটি, কেউ নিয়েছে পাথর, কেউ-বা নিয়েছে বায়তুল্লাহর আশ-পাশ থেকে কোনো বস্তু। উদ্দেশ্য ছিলো, এ জিনিসগুলো দেখলে মক্কা নগরী ও পবিত্র কাবা তাদের হৃদয়পটে দেদীপ্যমান থাকবে এবং এগুলো থেকে বরকত লাভ করা যাবে। ভিন্ন দেশে বসবাস শুরু করার পর তাদের কাছে এসব তাবাররুক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যত্নের সঙ্গে এগুলো হেফাযত করতে থাকে যুগ যুগ ধরে। এভাবে যখন এক পর্যায়ে তাদের প্রবীণ লোকেরা চলে যায়, তখন নব বংশধরের কাছে এগুলো আরো বরকতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রবীণ লোকদের মৃত্যুর কারণে নব বংশধররা সঠিক নির্দেশনামুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ধীরে ধীরে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। এসব তাবাররুকের তাদের ভক্তি গদগদ করে ওঠে। এগুলোকেই তারা প্রতিমা বানিয়ে নেয় এবং পূজা শুরু করে দেয়। এভাবে প্রতিমাপূজার প্রাদুর্ভাব সীমালংঘনের পথ ধরেই তাদের মাঝে ব্যাপক রূপ নেয়।

তাবাররুকের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন প্রয়োজন

তাবাররুকের প্রতি ভক্তি যেন মূর্তিপূজায় রূপ না নেয়। তাবাররুকের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেয়াদবী কিংবা শিরকী– উভয় পথই পরিত্যাজ্য। মধ্যপন্থাই কেবল গ্রহণযোগ্য।

মাওলানা জামী (রহ.) বলেন, 'আমি মদীনার কুকুরকেও সম্মান করি। কেননা এ কুকুর তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শহরের অধিবাসী।' মাওলানা জামী (রহ.)-এর এ জাতীয় উক্তি হলো, মূলত ইশক ও মহব্বতের অভিব্যক্তি। প্রিয়তমের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কও যার আছে, তার প্রতিও বুযুর্গদের কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। এ মহব্বত মূলত 'বস্তু' কিংবা 'জন্তু'র প্রতি নয়; বরং এ হলো, প্রিয়তম রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ। এতে শিরকের লেশও নেই; বেআদবীরও প্রকাশ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এ রকম মধ্যপন্থায় থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বসে পান করা সুন্নাত

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما)

'আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন।'

এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহে তানযীহী ও আদব পরিপন্থী।

প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যাবে

আসলে যে কাজটি জায়েয হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন– সে কাজটির ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিলো, তিনি নিষিদ্ধ কাজটিই নিজে করতেন– মূলত এর মাধ্যমে তিনি জায়েয হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেন। তবে নিষেধ করলেন কেন? নিষেধ করেছেন এজন্য যে, মানুষ যেন বুঝতে পারে, কাজটি জায়েয হলেও পছন্দনীয় নয় এবং এতে গুনাহ না হলেও আদবের পরিপন্থী হয়। যেমন দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নবীজী (সা.) নিষেধ বাণী বলেছেন কিন্তু কাবাশা (রা.)-এর হাদীসে– যা একটু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে দেখা যায়, তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন। অনুরূপভাবে এক হাদীসে এসেছে, হযরত নাজাল (রা.) বলেছেন যে, একবার হযরত আলী (রা.) কুফার 'বাবুর রাহবা' নামক স্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। অতঃপর বলেছেন–

إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ فَعَلْتُ (صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما)

'তোমরা আজ আমাকে যেভাবে পান করতে দেখলে, আমি দেখেছি রাসূল (সা.) এভাবেও পান করেছেন।'

তাই এতদুভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোথাও যদি দাঁড়িয়ে পান করার প্রয়োজন হয়, তাহলে পান করা যাবে। তাছাড়া সাধারণ অবস্থায় বসে পান করা হলো আদব; আর দাঁড়িয়ে পান করা আদবের খেলাফ।

বসে পান করার ফযীলত

যেহেতু প্রয়োজন ছাড়া কিংবা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য ছাড়া রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে পান করেননি; সব সময়ই বসে পান করেছেন, সুতরাং পান করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হলো, বসে পান করা। সুন্নাতটির ওপর নিজে আমল করবে, ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনকে আমল করতে বলবে। এটি কোনো কঠিন বিষয় নয়। একটু খেয়াল করলেই হয়। বিনা মেনহতে অধিক সাওয়াব পাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ– বসে পান করা। তাই অভ্যাস করবে এবং ছেলে-মেয়েকেও অভ্যাস করাবে।

সুন্নাতের অভ্যাস কর

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেন, একবার আমি নামাযের উদ্দেশ্যে এক মসজিদে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর পানি পান করার প্রয়োজন হলো। মসজিদের মধ্যে পান করার জন্য একটি পানির ড্রাম রাখা ছিলো। ড্রাম থেকে পানি নিলাম এবং নিজ অভ্যাস মতো এক জায়গায় বসে পান করা শুরু করে দিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'আপনি বসার প্রতি এত গুরুত্ব দিলেন কেন? দাঁড়িয়ে পান করলেই তো পারতেন!' ভাবলাম, এ লোকের সাথে এত কথা কী বলবো, তাই তাকে বললাম, 'ভাই! আসলে এটা আমার অভ্যাস। আমি সব সময়ই বসে পান করি।' লোকটি উত্তর দিলো, 'আপনি তো দেখি বিস্ময়কর কথা বললেন। সুন্নাতের ওপর অভ্যাস হয়ে যাওয়া– এটা কী চাট্টিখানি কথা!'

আসলে মানুষের অভ্যাস তো অভ্যাসই। অভ্যাসটা যদি সুন্নাতের ওপর হয়, তাহলে কতই না ভালো হয়। এতে সাওয়াবের ভাণ্ডার পাওয়া যায়।

যমযমের পানি কিভাবে পান করবে?

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (صحيح البخارى، كتاب الأشربة)

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে যমযমের পানি পান করিয়েছি, তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।'

তাই উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যমযমের পানি বসে পান করার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। যমযমের পানি ও অযুর অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে অবশ্য মানুষের মাঝে এটাই প্রসিদ্ধ যে, এই দুই পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রত্যেক পানি বসে পান করা উত্তম– এমনকি এ দুই পানিও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীস সম্পর্কে এসব আলেম বলেন, রাসূল (সা.) এখানে দাঁড়িয়ে পান করেছেন। তার কারণ হলো, তখন মানুষের ভীড় ছিলো, যমযম কূপের আশেপাশে কাদা ছিলো। বসে পান করার মতো অবস্থা ছিলো না, তাই অপারগ হয়ে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

তবে হযরত মুফতী শফী (রহ.)-এর তাহকীক হলো, যমযমের পানি বসে পান করা উত্তম। অনুরূপ অযুর পানিও। অবশ্য ওজরের ক্ষেত্রে যেমনি সাধারণ পানি দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতি আছে, অনুরূপভাবে যমযমের পানিও বসে পান করার অনুমতি আছে। অনেক সময় দেখা যায়, যমযমের পানি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে দাঁড়িয়ে যায়– এতটুকু গুরুত্ব দেয়ারও প্রয়োজন নেই।

দাঁড়িয়ে খাওয়া

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ : قَتَادَةَ : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَالْاَكْلُ؟ قَالَ : ذَالِكَ اَشَرُّ وَاَخْبَثُ (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما)

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (রা.) বলেন, বর্ণনার সময় আমি আনাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছি, খাওয়ার ব্যাপারে বিধান কী? আনাস (রা.) উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে আহার করা এর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ।

এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিনা ওজরে দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহে তানযীহী এবং দাঁড়িয়ে আহার করা মাকরূহে তাহরীমী।

কেউ কেউ বলে থাকে, দাঁড়িয়ে আহার করা জায়েয। তারা দলিল হিসাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করে থাকে যে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের মানুষেরা হাটতে হাটতেও খেয়ে নিতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ও পান করে নিতেন।' হাদীসটি তারা খুব মনে রাখে এবং বলে, 'সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়ানো অবস্থায় খেয়েছেন, অথচ আমাদেরকে নিষেধ করা হয়– কেন?'

জেনে রাখুন, এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি এসেছে, যে ধরনের খানার ক্ষেত্রে দস্তরখান বিছিয়ে ঘটা করে বসার প্রয়োজন নেই, বরং একেবারে মামুলি খাবার যেমন, চকলেট, বুট, বাদাম, ছোট কোনো ফল ইত্যাদি সম্পর্কে। অন্যথায় সকালের খাবার, দুপুরের খাবার কিংবা রাতের খাবার এবং এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য খাবার দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না– নাজায়েয হবে। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে দেখা যায়। এটা কখনও অভিজাত কাজ নয়, সভ্য মানুষের শিষ্টাচার নয়। জন্তুদের কাজ হলো হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া– তাই এটা ভদ্র মানুষেরও কাজ নয়। আব্বাজান বলতেন, এটাতো পশুদের ঘাস খাওয়ার পদ্ধতি। একবার এখানে, আরেকবার ওখানে চরে চরে খাওয়া তো জীব-জন্তুর ভক্ষণ রীতি। সুস্থ রুচিবোধ এ কাজটি কখনও সমর্থন করে না। তাছাড়া এটা মেহমানদের জন্য লজ্জার বিষয়। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে এমন করবেন না। একটু ভাবুন এবং গুরুত্ব দিন।

অনেকে বলে, এটা হলো মিতব্যয়িতা। এতে ডেকোরেশন খরচ অনেকটা সেভ হয়, জায়গা কম লাগে। ভালো কথা এটা মিতব্যয়িতা। কিন্তু জনাব! সকল

ক্ষেত্রে এরূপ হিসাব করেন কি? আলোকসজ্জা, গেট ইত্যাদি করার সময় তো শরীয়তের কোনো তোয়াক্কা করেন না, পরিমিত ব্যয়ের ধার ধারেন না। রুসম-রেওয়াজের পেছনে তো টাকাকে মনে করেন গাছের পাতা। কেবল এ ক্ষেত্রেই উতলে ওঠে পরিমিত ব্যয়ের অনর্থক চিন্তা। মূলত এসব কিছুই না; বরং ফ্যাশনপূজাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহর ওয়াস্তে ফ্যাশনপূজারী না হয়ে সুন্নাতের অনুসারী হোন। প্রতিজ্ঞা করুন, যত টাকাই যাবে মেহমানদের জন্য বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করবোই। 'সকল অহেতুক চিন্তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। নবীজী (সা.)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।'

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"বর্তমানে আমাদের 'দাওয়াত' নিছক প্রথায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রুসমকেই উপলক্ষ্য বানিয়ে আমরা দাওয়াতের আয়োজন করি। ফলে দাওয়াত আজ আপদে রূপ নিয়েছে।

এসব কেন হচ্ছে? কারণ, আমরা বিভিন্ন প্রথা ও গুনাহর সামনে নেতিয়ে পড়েছি। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি বেঁকে বসতেন এবং সাফ সাফ জানিয়ে দিতেন, যে দাওয়াতে গুনাহর আয়োজন আছে, সে দাওয়াতে আমি নেই– তাহলে অন্যায়-অশ্লীলতা এ পরিমাণে ছড়াতো না।"

দাওয়াতের আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (ترمذى، كتاب الصوم، باب ما جاء فى اجابته الصائم الدعوة)

হামদ ও সালাতের পর!

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে দাওয়াত করা হলে কবুল করা উচিত। রোযাদার হলে নিমন্ত্রণকারীর জন্য দু'আ করবে। অর্থাৎ– তার ঘরে গিয়ে তার জন্য দু'আ করবে। রোযাদার না হলে একসঙ্গে খানা খাবে।

দাওয়াত গ্রহণ মুসলমানদের অধিকার

একজন মুসলমানের দাওয়াত কবুল করার প্রতি আলোচ্য হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দাওয়াত কবুল করা মুসলমানের হক হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ، رَدُّ السَّلَامِ، تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ،
إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بال الأمر باتباع الجنائز)

অর্থাৎ– এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। এক. সালামের উত্তর দেয়া। দুই. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুল্লিাহ' পড়লে তার জবাবে يرحمك الله বলা। তিন. কোনো মুসলমান মারা গেলে তার জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া। চার. অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া। পাঁচ. দাওয়াত দিলে কবুল করা।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াত কবুল করাকে একজন মুসলমানের হক হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

কেন দাওয়াত কবুল করবে?

আমার ভাই দাওয়াত দিয়েছে, আমাকে মহব্বত করে বিধায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সুতরাং তার মহব্বতের কদর করা চাই। দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত এবং সাওয়াবের কাজ। এ ধরনের নিয়ত করে দাওয়াত কবুল করবে। আয়োজন ভালো হলে কবুল করবে অন্যথায় নয়; এরূপ যেন না হয়। মুসলমানের অন্তর খুশি করার নিমিত্তে দাওয়াত কবুল করা চাই। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَلَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ (صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة)

অর্থাৎ– "বকরির পায়ার জন্যও যদি আমি নিমন্ত্রিত হই, কবুল করে নেবো।" বর্তমানে যদিও পায়া খাওয়ার নিমন্ত্রণকে উন্নত দাওয়াত মনে করা হয়; কিন্তু রাসূল (সা.)-এর যুগে এটি ছিলো নিতান্ত এক মামুলি বিষয়। অতএব নিমন্ত্রণকারী একজন গরীব মুসলমান হলেও এ নিয়তে কবুল করবে যে, সে আমার ভাই। তার অন্তরকে আন্দোলিত করা চাই। ধনী-গরীবে ভেদাভেদ করা কখনও উচিত নয়। বরং গরীব মানুষই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ডাল ও বিস্বাদ খাবারে নূরের অনুভূতি

আব্বাজান (রহ.)-এর নিকট একাধিকবার ঘটনাটি শুনেছি। দেওবন্দে একজন ঘাস বিক্রেতা ছিলেন। ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করতেন, এর মাধ্যমেই

জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক সপ্তাহে তিনি ছয় পয়সা কামাতেন। সংসারে তিনি একাই ছিলেন। তাই ওই ছয় পয়সাকে ভাগ করতেন এভাবে– দুই পয়সা দিয়ে নিজের জন্য খাবার কিনতেন। দুই পয়সা দান করে দিতেন। অবশিষ্ট দুই পয়সা নিজের কাছে জমা রাখতেন। এক মাস পর যখন কিছু পয়সা জমা হতো, দারুল উলূম দেওবন্দ-এর যেসব বুযুর্গ ছিলেন তাঁদের দাওয়াত করতেন। দাওয়াতে বিস্বাদ চাল রান্না করতেন এবং ডাল পাকাতেন। এ দিয়েই পরিবেশন চলতো। আব্বাজান বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দ-এর সমকালীন মুহতামিম মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) বলতেন, পুরো মাস আমরা এই লোকের দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ, এ লোকের বিস্বাদ চাল এবং পাতলা ডালের মধ্যে যে নূর অনুভব করতাম, সে নূর পোলাও-বিরানীর শানদার দাওয়াতেও অনুভব হতো না।

দাওয়াতের হাকীকত

রাসূলুল্লাহ (সা.) ধনী-গরীব সকলেরই দাওয়াত কবুল করতেন। এমনকি একজন সাধারণ মানুষের দাওয়াতে কয়েক মাইল পর্যন্ত সফর করেছেন। এজন্য ইখলাসের সঙ্গে দাওয়াত দিবে। ইখলাসের সঙ্গে দাওয়াত কবুল করবে। ইখলাসসমৃদ্ধ আমল নূর ও বরকতপূর্ণ হবে। সুন্নাত ও সাওয়াবের উসিলা হবে।

দাওয়াত না দুশমনি

বর্তমানে আমাদের দাওয়াত নিছক প্রথায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রুসমকেই উপলক্ষ্য করে আমরা দাওয়াত করে থাকি। ফলে দাওয়াত গ্রহণ করাও মুসিবত, না করা আরেক মুসিবত। তাই হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, হতে হবে দাওয়াত; দুশমনি নয়। দাওয়াত যেন আপদে পরিণত না হয়। যেমন, আমাদের মধ্যে অনেকে এরূপ করে থাকেন যে, অমুককে দাওয়াত দিতেই হবে। এ প্রবণতায় তিনি চালিত হন। সেই 'অমুকে'র হাতে সময় আছে কি নেই– এটা যেন এক গৌণ বিষয়। দাওয়াত কবুল করার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করা হয়। যেন দাওয়াতে আসতেই হবে, মুসিবতের ঝড় বয়ে গেলেও কবুল করতেই হবে। মূলত এটা দাওয়াত নয়; বরং শত্রুতা। যদি দাওয়াতের মাধ্যমে মহব্বত প্রকাশ করতে চাও, তাহলে তার আরামেরও খেয়াল রাখতে হবে। তার সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। অন্যথায় 'দাওয়াত' মুসিবতে পরিণত হবে।

সর্বোত্তম দাওয়াত

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, দাওয়াত তিন প্রকার। সর্বোত্তম দাওয়াত, মধ্যম দাওয়াত এবং নিম্নস্তরের দাওয়াত। চলমান

পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য সর্বোত্তম দাওয়াত হলো, যাকে দাওয়াত দেয়া হবে, সোজা তার কাছে চলে যাবে এবং নগদ কিছু হাদিয়া দিয়ে দিবে। নগদ হাদিয়া পেশ করার পর তাঁকে ইখতিয়ার দিবে যে, ইচ্ছা করলে তিনি হাদিয়াটা যেমনিভাবে খানার জন্য ব্যয় করতে পারেন, তেমনিভাবে অন্য প্রয়োজনেও ব্যয় করতে পারেন। এতে তাঁর ফায়দা বেশি হবে। চিন্তা ও বিড়ম্বনা থেকে তিনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আসতে চাইলে প্রশান্তমনে আসতে পারবেন। বিধায় এ দাওয়াতই হলো সর্বোত্তম দাওয়াত।

মধ্যস্তরের দাওয়াত

খানা পাকিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হলো মধ্যম স্তরের দাওয়াত। এটি প্রথম স্তরভুক্ত এজন্য নয় যে, যেহেতু এ দাওয়াতে শুধু খানার বিষয় বর্তমান। এছাড়া অন্য কোনো ইখতিয়ার বর্তমান নেই। তবে খানা ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তি যাওয়ার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তাই এটি মধ্যম স্তরের দাওয়াত।

নিম্নমানের দাওয়াত

ঘরে ডেকে খানা খাওয়ানো হলো নিম্নমানের দাওয়াত। বর্তমানে মানুষ খুবই ব্যস্ত। ব্যস্ত শহর এবং ব্যস্ত জীবন। এ ক্ষেত্রে দূরত্ব যদি অধিক হয়, তাহলে দাওয়াত খাওয়ার জন্য একজন মানুষকে দু' চার ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। কমপক্ষে পঞ্চাশ-একশ' টাকা খরচ করতে হয়। তাহলে আমন্ত্রিত ব্যক্তির জন্য এটা এক প্রকার বিড়ম্বনা নয় কি? স্বাচ্ছন্দবোধের পরিবর্তে তিনি কষ্ট উঠালেন। অথচ দাওয়াতের উদ্দেশ্য তো কষ্ট দেয়া নয়। বিধায় এটি সবচে' নিম্নমানের দাওয়াত।

দাওয়াতের একটি চমৎকার ঘটনা

হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.) আমাদের নিকট অতীতের একজন বুযুর্গ ছিলেন। 'আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। আমীন।' আব্বাজানের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। লাহোর থাকতেন। এক বার করাচিতে প্রোগ্রাম করলেন। সে সুবাদে দারুল উলূম কাওরাঙ্গিতে আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। আব্বাজান খুবই খুশি হলেন। সকাল দশটার দিকেই তিনি দারুল উলূম পৌছে গিয়েছিলেন। আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন, আজকে আপনার বিশ্রাম কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, আগ্রা কলোনিতে এক ভদ্রলোকের বাসায়। আব্বাজান বললেন, সেখান থেকে কখন ফিরবেন? উত্তর দিলেন, আগামীকাল 'ইনশাআল্লাহ' লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবো।

যাহোক, সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা পর্ব শেষ হবার পর যখন তিনি ফিরতে চাইলেন, তখন আব্বাজান বললেন, ভাই মৌলভী ইদরীস সাহেব! আপনি অনেক দিন পর আমার এখানে এসেছেন। মন চাচ্ছে আপনাকে একটু দাওয়াত করি। কিন্তু ভাবলাম, আজকে আপনার বিশ্রাম আগ্রা তাজ কলোনীতে, আর আমি থাকি কাওরঙ্গিতে। এখন যদি বলি, অমুক সময়ে আমার এখানে এসে খানা খাবেন, তাহলে আপনি মহা বিপাকে পড়ে যাবেন। কারণ, আগামীকাল আবার আপনাকে চলে যেতে হবে। হয়ত অনেক কাজ আছে। তাই মন চাচ্ছে না, আপনাকে দ্বিতীয়বার এখানে টেনে এনে কষ্ট দিব। সুতরাং দাওয়াতের পরিবর্তে আমার থেকে এই একশ' রুপি হাদিয়া গ্রহণ করুন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.) ওই একশ' রুপির নোটটি নিজের মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন, আপনি তো আমাকে বিরাট নেয়ামত দান করেছেন। দাওয়াতের ফযীলতও লাভ করলেন; অথচ অতিথির কোনো কষ্ট ভোগ করতে হলো না। এরপর অনুমতি নিয়ে বিদায় নিলেন।

আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা

এটাকেই বলে সাদাসিধে জীবন এবং মেহমানের আরামের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান। হযরত মুফতী সাহেবের স্থলে অন্য কেউ হলে বলতো, 'আরে.... আপনি লাহোর থেকে করাচি এসেছেন। আর আমার বাসায় দাওয়াত খাবেন না। এটা হতে পারে না। যত কষ্টই হোক আমার এখানে চারটা ডাল-ভাত হলেও খেয়ে যাবেন।' আর ইদরীস সাহেব (রহ.)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে বলতো, 'আমি কি তোমার দাওয়াতের কাঙ্গাল? পয়সা দিচ্ছ কেন, আমি কি ফকির?' মনে রাখবেন, মহব্বতের দাবি হলো, প্রিয়জনকে কষ্ট না দেয়া এবং তার আরামের প্রতি খেয়াল রাখা। বড় ভাই মরহুম যকী কাইফী চমৎকার কবিতা বলতেন। তার নিম্নোক্ত কবিতাটি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার–

میرے محبوب میری ایسے وفا سے توبہ
جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

'প্রিয়তম আমার! এমন ওফাদারী থেকে তাওবা করছি, যা আপনার মনোঃকষ্টের 'কারণ' হয়।'

কবিতাটি শোনার পর আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি তো সকল বিদআতের মূলে আঘাত করলেন। কারণ, মানুষ আজ অযৌক্তিক ওফাদারী দেখায়। একটুও ভাবে না, তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত ওফাদারীতে প্রিয়তম কষ্ট পায়।

দাওয়াত করাও একটি বিদ্যা

দাওয়াত যেন মুসিবত না হয়, এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মহব্বত প্রকাশ করা। অতএব মহব্বতের অনুকূল পথ ও পদ্ধতি মতে চলতে হবে। রুসম ও সামাজিক প্রথার সঙ্গে দাওয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় প্রথাগত প্রবণতা বর্জন করতে হবে। দাওয়াত হতে হবে স্বতস্ফূর্ত ও শর্তমুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরীকামুক্ত দাওয়াত কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে যাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তার জন্য সুন্নাত হলো দাওয়াত কবুল করা। এর মাধ্যমে একজন মুসলমানের মহব্বতের মূল্যায়ন হয়। সুতরাং কাজটি সুন্নাত মনে করেই করতে হবে। দাওয়াতে না গেলে নাক কাটা যাবে, মানুষ কী ভাববে– এ ধরনের ভাবনা মোটেও উচিত নয়। এরূপ ভাবনার উদয় হওয়া মানে 'সুন্নাত' থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

দাওয়াত গ্রহণের জন্য শর্ত

এক্ষেত্রেও কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। যে দাওয়াতে গেলে গুনাহয় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত নয়। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। বিয়ের কার্ডে লেখা থাকে– 'সুন্নাত ওলীমা'। ভালো কথা, ওলীমা তো অবশ্যই সুন্নাত। কিন্তু কোন ধরনের ওলীমা সুন্নাত? মূলত সুন্নাত তরীকার ওলীমাই সুন্নাত। যে ওলীমায় নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা হয়, পর্দা লংঘন হয়, সেই ওলীমা কখনই সুন্নাত নয়।

আত্মসমর্পণ আর কত দিন?

এসব কিছু কেন হচ্ছে? কারণ, আমরা বিভিন্ন প্রথা ও গুনাহর সামনে নেতিয়ে পড়েছি। ফলে অন্যায়, অপরাধ, অবৈধতা ও অশ্লীলতা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি বেঁকে বসতেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে সাফ সাফ বলে দিতেন যে, দাওয়াতের নামে যদি অন্যায় ও অশ্লীলতা হয়, তাহলে এ ধরনের দাওয়াতে আমি নেই। এ জাতীয় কথা বলার মত লোক থাকলে এসব সামাজিক প্রথা ও অন্যায় এতটুকু অবশ্যই ছড়াতো না। কিন্তু বর্তমানে তো মানুষ উল্টো পথে চলছে। যদি বলা হয়, যে দাওয়াতে শালীনতা ও পর্দা নেই, সে দাওয়াতে যেও না। উত্তর দিবে, না গেলে সমাজে আমার নাক কাটা যাবে। আমি বলি, গুনাহমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যদি তোমার নাক কাটা যায়, তাহলে যেতে দাও। এ কাটাকে তুমি সাধুবাদ জানাও। কারণ, এই 'কর্তন' আল্লাহর জন্য

হয়েছে বিধায় এটি পবিত্র। অতএব বলে দাও, আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হলে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে। পর্দা বিধান নিরাপদ থাকবে– এ নিশ্চয়তা দিতে হবে। অন্যথায় আমরা যাবো না। এরপরেও যদি তারা তোমার কথা না মানে, তাহলে যে ব্যক্তি তোমার কথার গুরুত্ব দেয়নি, তুমি তার দাওয়াতের গুরুত্ব দিবে কেন?

এ ধরনের কিছু সৎ সাহসী লোক তৈরি হওয়া উচিত। কিন্তু তৈরি তো হচ্ছে না। বরং যে মানুষটি দ্বীনের উপর চলতে যথেষ্ট আগ্রহী, সেও চক্ষু লজ্জার কারণে বলতে পারে না। সে ভয় করে যে, আমি যদি বেঁকে বসি, আমাকে সেকেলে ও পশ্চাদমুখী (Bake world) মনে করবে। এভাবে আর কত দিন চলবে অবক্ষয়ের এ স্রোত? কত দিন তুমি এসব অন্যায় কাজের মৃদু অনুকূলে থাকবে? তোমাদের নীরব ভূমিকার কারণে অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আজ যুবতীরা নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার অভিশাপ গোটা সমাজকে পিষে ফেলেছে। এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না। তাই পদক্ষেপ নাও। প্রতিজ্ঞা কর, গুনাহর সয়লাব যেখানে, আমরা নেই সেখানে।

অনেক সময় মনে করা হয়, অনুষ্ঠানাদিতে পর্দানশীন থাকে দু' একজন। তাই আলাদা আয়োজন এক অতিরিক্ত ঝামেলা। মনে রাখবেন, ঝামেলা মনে করলে ঝামেলা। অন্যথায় এটা খুব একটা সমস্যার কিছু নয়। প্রয়োজন শুধু সৎ সাহসের এবং সৎ চিন্তার।

দাওয়াত কবুল করার শরয়ী বিধান

শরীয়তের বিধান হলো, দাওয়াতে গেলে যদি গুনাহয় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেই দাওয়াতে যাওয়া জায়েয নেই। আশঙ্কা না থাকলে সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার অবকাশ আছে। যদি মনে করা হয়, দাওয়াতের সুবাদে কিছু অশ্লীলতা চলবেই, তবে আমি নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবো, তাহলেও অংশগ্রহণের অবকাশ আছে। কিন্তু যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় অথবা যাদের প্রতি সমাজ তাকিয়ে থাকে, তাদের জন্য এ জাতীয় দাওয়াতে অংশগ্রহণ মোটেও জায়েয হবে না। এ হলো, দাওয়াত কবুল করার মূলনীতি। এ নীতি মতেই চলতে হবে।

দাওয়াতের জন্য নফল রোযা ভঙ্গ করা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যাঁকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তিনি যদি রোযাদার হন এবং রোযার কারণে খাবার খেতে না পারেন, তাহলে

মেযবানের জন্য দু'আ করবেন। এর আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি নফল রোযা অবস্থায় নিমন্ত্রিত হয়, তাহলে নিমন্ত্রণ কবুল করার লক্ষে তথা এক মুসলমানের অন্তর খুশি করার লক্ষে নফল রোযা ভাঙ্গতে চাইলে তার অনুমতি আছে। পরবর্তীতে এর কাযা করে নিবে। আর রোযা ভাঙ্গতে না চাইলে অন্তত মেযবানের জন্য দু'আ করে দিবে।

যে মেহমানকে দাওয়াত দেয়া হয়নি তার বিধান

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صُنِعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ. فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَاْذَنَ وَاِنْ شِئْتَ رَجَعَ، قَالَ : بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صحيح البخارى، كتاب الأطعمة)

হযরত আবু মাসউদ আল-বদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দাওয়াত দিয়েছিলো। তাঁর সঙ্গে আরো চারজন ছিলো। ওই যামানায় কোনো লৌকিকতা ছিলো না হেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক সময় নিজের সঙ্গে আরো দু'-একজন নিয়ে নিতেন। এখানে লোকটি দাওয়াত দিয়েছিলো রাসূল (সা.) সহ মোট পাঁচজনের। রাসূল (সা.) যখন দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, পথিমধ্যে আরেকজন যোগ হয়ে গেলো। আজকাল যেমনিভাবে কোনো বুযুর্গকে দাওয়াত দেয়া হলে সঙ্গে আরো দু'-একজন আসেন। যখন তিনি মেযবানের বাড়িতে পৌছলেন, মেযবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে। তুমি চাইলে তাকে মেহমান হওয়ার অনুমতি দিতে পার। অন্যথায় সে ফেরত চলে যাবে। মেযবান বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলাম।

চোর আর ডাকাত

এ হাদীসের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে শিক্ষাটি রয়েছে, তাহলো, কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে যদি তোমার সঙ্গে এমন ব্যক্তিও যায়, যার দাওয়াত নেই, তাহলে প্রথমে মেযবানের অনুমতি নিয়ে নিবে, তারপর দাওয়াত খাবে। কেননা, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে চলে আসে, সে যেন চোর হয়ে আসলো আর ডাকাত বনে চলে গেলো।

মেযবানের হক

মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত শিক্ষার মাধ্যমে একটি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যে মূলনীতি আমাদের নিকট অবহেলিত। আমাদের ধারণা হলো, আতিথ্যের সকল মেযবানের উপর মেহমানের পাওনা। মেহমানের আতিথেয়তা করা এবং যথাযথ কদর করা মেযবানের কর্তব্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এ হাদীসের মাধ্যমে এ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে মেহমানের অধিকার আছে, অনুরূপভাবে মেযবানেরও অধিকার রয়েছে। মেহমান মেযবানকে অযথা কষ্ট দিতে পারবে না। যেমন মেহমান নিজের সঙ্গে এমন লোক নিতে পারবে না, যার দাওয়াত নেই। হাঁ, মেহমানের যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, লোকটিকে নিয়ে গেলে মেযবান অসন্তুষ্ট হবেন না, বরং সন্তুষ্টই হবেন, তাহলে ভিন্ন কথা। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে সাথে নিতে পারবে।

আগ থেকে জানিয়ে রাখবে

মেযবানের আরেকটি হক হলো, মেহমান হতে চাইলে মেযবানকে আগেই জানিয়ে দিবে। কমপক্ষে এমন সময় হতে হবে, যেন খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে অসুবিধা না হয়। ঠিক খানার মুহূর্তে উপস্থিত হলে মেযবান তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাবেন। সুতরাং অসময়ে মেহমান হওয়া উচিত নয়। এটা মেহমানের উপর মেযবানের হক।

মেহমান অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মেযবানকে অবহিত করা ব্যতীত কোনো মেহমানের জন্য জায়েয নেই যে, নফল রোযা রাখবে। কেননা, অবহিত না করলে মেযবান সমস্যায় পড়ে যাবে। মেহমানের জন্য বাজার খরচ, রান্না-বান্না ও যাবতীয় খরচ যে হয়েছে সবই বিফলে যাবে। ফলে মেযবান দুঃখ পাবে। তাই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

খাওয়ার সময় মেহমান উপস্থিত থাকবে

মনে করুন, মেযবানের বাসায় খানার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় আছে। অথচ মেহমান তখন কোথাও চলে গেলো। এতে মেযবান কষ্ট পায়। মেহমানের খোঁজে মেযবান উদ্বিগ্ন হয়, নির্দিষ্ট সিডিউলে ব্যাঘাত ঘটে, না খেয়ে মেহমানের জন্য বসে থাকতে হয়। এতসব বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হলো, মেহমান যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে। কোনো কারণে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগেই জানিয়ে দিবে।

মেযবানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ

শুধু নামায, রোযা, যিকির ও তাসবীহর নাম দ্বীন নয়। দ্বীন অনেক বিস্তৃত। এসব বিষয়ও দ্বীনের অংশ। অথচ আমরা মনে করি, এগুলো দ্বীন বহির্ভূত। বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তিও ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচারের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। যার কারণে তারাও অনায়াসে গুনাহতে লিপ্ত। মনে রাখবেন, আদবের তোয়াক্কা না করলে মেযবান কষ্ট পাবেন। আর এক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

আব্বাজান বলতেন, কোনো মুসলমানকে কথায় বা কাজে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ। যেমনিভাবে মদপান করা, চুরি করা, যিনা করা কবীরা গুনাহ। সুতরাং আচরণের মাধ্যমে যদি মেযবানকে কষ্ট দেয়া হয়, তাহলে এটাও তো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হলো। সুতরাং এটাও কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"বর্তমান যুগ ফ্যাশনের যুগ। মানুষের চিন্তা-চেতনা বদলে গেছে। রুচির বিকৃতি ঘটেছে। পছন্দ কিংবা অপছন্দ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ফ্যাশনের পেছনেই মানুষ দৌড়াচ্ছে। গতকালের উদ্ভুট্ট ফ্যাশন আজ পরিত্যক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে। এক সময় বড় ও ঢিলেঢালা পোশাক ছিলো ফ্যাশন। আর বর্তমানে চলছে কাঁটছাঁট ও সংক্ষিপ্ত পোশাকের ফ্যাশন। অতীতে যা ছিলো নন্দিত, বর্তমানে তা হয়ে গেলো নিন্দিত। বুঝা গেলো, ফ্যাশন অস্থির। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধান হলো, স্থির। অতএব ফ্যাশন নয়; ইসলামই হবে সবকিছুর মাপকাঠি। এমনকি পোশাকেরও।"

পোশাক : ইসলাম কী বলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ (الاعراف : ٢٦)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শুরুর কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে তার দিঙনির্দেশনা। পোশাকও মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কুরআন ও সুন্নাহয় এ ব্যাপারেও সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

আধুনিক যুগের অপপ্রচার

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আজ ধুমায়িত করা হচ্ছে। পোশাকের ব্যাপারেও চলছে নানামুখী প্রোপাগাণ্ডা। বলা হচ্ছে, পোশাক ব্যক্তি, পরিবেশ ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; এ ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে কোনো পোশাক পরিধান মানুষের নিজস্ব অধিকার। এ ক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে আনা উচিত নয়। এটা সম্পূর্ণ সংকীর্ণতার পরিচয়। এসব মূলত মোল্লা-মৌলভীর কাজ! ধর্মকে নিজস্ব মতানুসারে চালানোই তাদের লক্ষ্য। যেন তারা ধর্মের ঠিকাদারী নিয়েছে।

নিজেদের পক্ষ থেকে কত কত 'শর্ত' জুড়ে দিয়েছে। অন্যথায় ধর্ম তো সহজ বিষয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এত নিয়ম-কানুন দেননি। মোল্লা-মৌলভীদের সংকীর্ণতার কারণে আজ মানুষ ধর্মকে 'কঠিন' মনে করছে। মোল্লারা নিজেরাও বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদেরকেও বঞ্চিত করছে।

পোশাক প্রতিক্রিয়াশীল

জেনে রাখুন, এসব অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে এগুলোকে সত্য ভেবে বসবেন না। এগুলো স্রেফ অপপ্রচার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বকীয়তা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র। অন্যথায় পোশাক কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কেউ চাইলেই নিজের ইচ্ছে মতো পোশাক পরতে পারে না। পোশাকের প্রভাব মানুষের আত্মা, চরিত্র, ধর্ম ও কর্মে পড়ে। মনোবিজ্ঞানীরাও আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, পোশাক নিছক কোনো কাপড় নয়, বরং পোশাকের একটা প্রভাব আছে। মানুষের বাস্তবজীবনে ও জীবনের চিন্তাধারায় এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

হযরত উমর (রা.)-এর মনে জুব্বার প্রতিক্রিয়া

বর্ণিত আছে, একবার উমর (রা.) মূল্যবান একটি জুব্বা পরে মদীনার মসজিদে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে গেলেন। খুতবা শেষে বাড়িতে ফেরার সময় জুব্বাটি খুলে ফেললেন। বললেন, ভবিষ্যতে আমি আর এ জুব্বা পরবো না। এ তো জুব্বা নয়; বরং অহংকারের উৎস। এটি পরে আমি নিজেকে অহংকারী হিসাবে আবিষ্কার করেছি। সুতরাং ভবিষ্যতে এটি পরা যাবে না।

একটি আড়ম্বর জুব্বা উমর (রা.)-এর হৃদয়ে এভাবে রেখাপাত করলো। অথচ সত্তাগতভাবে জুব্বাটি হারাম ছিলো না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মেযাযকে পবিত্র করেছিলেন। স্বচ্ছ আয়নার মতো সবকিছু ধরা পড়ে যেতো তাঁদের হৃদয়ের আয়নায়। সফেদ কাপড়ের দাগের মতো সহজেই ধরে ফেলতেন তাঁদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম দাগও। যেমনটি ধরে ফেলেছেন হযরত উমর (রা.)। পোশাকের প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন। জীবন ও চরিত্রে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করেছেন।

অথচ আমাদের অন্তর আজ দাগে ভরে গেছে। ময়লাযুক্ত কাপড়ের মতো ভেতরটা কালো হয়ে গেছে। তাই নতুন কোনো গুনাহর দাগ আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। গুনাহর দাপাদাপির সঙ্গে আমরা পেরে উঠি না।

যাক, ইসলামে পোশাকের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনাও রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

আরেকটি অপপ্রচার

এ অপপ্রচারটিও বেশ হাস্যকর। বলা হচ্ছে, জনাব! ধর্মের সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে; শরীরের সঙ্গে নয়। বাহ্যিক পোশাক-আশাক নিয়ে ধর্মের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমাদের লেবাস-পোশাক এমন হলে কী হবে, অন্তর তো ঠিক আছে। নিয়ত পরিষ্কার আছে। আর যার অন্তর সাফ, তার বাহ্যিক দিক ঠিক না থাকলে এমন কী-ই-বা আসে যায়? ইসলাম মানুষের অন্তর দেখে। নিয়ত শুদ্ধ হলেই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায়।

ভেতর ও বাহির উভয়টাই ঠিক থাকতে হয়

মনে রাখবেন, এসব হাস্যকর অপপ্রচার শুনে সে দিকে ঝুঁকে পড়বেন না। কেননা, ইসলামের বিধি-বিধান ভেতর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে। অন্তর যেমন সাফ হতে হয়, বাহ্যিক অবয়ব তেমনি পরিশুদ্ধ হতে হয়। নিয়ত যেমনিভাবে বিশুদ্ধ হতে হয়, তেমনিভাবে শরীর-পোশাকও রুচিপূর্ণ হতে হয়। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ পরিত্যাগ কর।' (সূরা আনআম : ১২০)

আসলে যার অন্তর স্বচ্ছ থাকে, তার বাহ্যিক চাল-চলনও পবিত্র থাকে। ভেতর ঠিক না হলে বাহির খারাপ হবে অবশ্যই।

চমৎকার উপমা

এ প্রসঙ্গে এক বুযুর্গ চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন। ফল নষ্ট হলে চামড়াতেও দাগ পড়ে। ফলের ভেতর পচে গেলে, বাইরে পচে যায়। তেমনিভাবে কারো অন্তরে অবক্ষয় শুরু হলে, বাহ্যিক অবস্থাতেও তার প্রভাব পড়বে। অন্তর খারাপ হলে উপরের অবস্থাও খারাপ হবে এবং অবশ্যই হবে।

জাগতিক কাজে বাহ্যিক দিকও বিবেচ্য হয়

বাড়ি বানালে তার উপর প্লাস্টার করতে হয়। রঙ করতে হয়। শুধু ছাদ ঢালাই আর চার দেয়াল তৈরি করলেই বাড়ি হয়ে যায় না। হাঁ, এর দ্বারা বাড়ির ভেতরে থাকার উপযোগী হয়, তবে বাড়ির আসল সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় না।

অনুরূপভাবে একটি গাড়ির কথাই ধরুন। শুধু ভেতর তথা ইঞ্জিন থাকলেই গাড়ি হয়ে যায় না। বরং উপর তথা 'বডি'র প্রয়োজনও সকলেই স্বীকার করে। এজন্য কোনো ব্যক্তি গাড়ির ইঞ্জিনের মালিক হওয়ার অর্থ গাড়ির মালিক হওয়া নয়। বরং এর জন্য বডিও লাগে।

বুঝা গেলো, পার্থিব সকল ক্ষেত্রে শুধু ভেতর ঠিক হলেই চলে না; উপরও ঠিক হওয়া লাগে। অথচ যত বাহানা কেবল দ্বীনের ক্ষেত্রে। দ্বীনকে আজ আমরা 'বেচারা' বানিয়ে রেখেছি। দ্বীন আমাদের নিকট আজ অবহেলিত বিষয়। দ্বীনের কোনো বিষয় আসলেই 'ভেতর ও উপর' এর দর্শন আমাদের মাঝে উতলে উঠে।

শয়তানের ধোঁকা

মূলত এ ধরনের 'দর্শন' শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছু নয়। কারণ, জাহির ও বাতিন, ভেতর ও উপর, অন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা– একই সঙ্গে ঠিক থাকতে হবে। পোশাক-আশাক, পানাহার ও সামাজিক শিষ্টাচারের সম্পর্ক যদিও মানুষের বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে, তবে এগুলোরও একটা প্রভাব অবশ্যই আছে। যে প্রভাবটা পড়ে মানুষের অন্তরের মাঝে। বিধায় পোশাককে যারা সাধারণ বিষয় মনে করে– তারা ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদি তাদের ধারণাই সঠিক হতো, তাহলে রাসূল (সা.) পোশাকের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দিতেন না। যেসব ক্ষেত্রে মানুষ ভুলের শিকার হয়, সেসব ক্ষেত্রেই তো তাঁর দিঙনির্দেশনা প্রয়োজন। তাই পোশাক সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশনা ও নীতিমালা জানা অবশ্যই জরুরী।

পোশাক সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

ইসলাম পোশাকের ব্যাপারে দিয়েছে যথোপযুক্ত নীতিমালা। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট পোশাক কিংবা ডিজাইন নির্ধারিত করে একথা বলেনি যে, ইসলামী পোশাক এটাই এবং এর বাইরে অন্য যে কোনো পোশাক ইসলাম পরিপন্থী। সুতরাং এটাই পরতে হবে। বরং ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পোশাকের মূল্যায়ন করেছে, যেহেতু ইসলাম হলো,প্রকৃতির ধর্ম। তাই দেশ, জাতি, রুচি, অবস্থা ও মৌসুমের কারণে পোশাকের ভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা ইসলাম অস্বীকার করেনি। ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করে যে কোনো ধরনের পোশাক পরিধানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মূলনীতি রক্ষা করে সব ধরনের পোশাক পরা যাবে।

পোশাক সংক্রান্ত চারটি মূলনীতি

কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে পোশাক সম্পর্কে চারটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতটি হলো–

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারীর পোশাক; এটি সর্বোত্তম।' (সূরা আরাফ : ২৬)

প্রথম মূলনীতি

আলোচ্য আয়াতে পোশাকের প্রথম মূল লক্ষ্য চিহ্নিতকরণকল্পে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যা দ্বারা তোমাদের গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার। এখানে سوآة শব্দের অর্থ হলো, ওই সকল বস্তু বা বিষয় যার আলোচনা করা কিংবা খোলা রাখা মানুষ স্বভাবতই লজ্জাজনক মনে করে। উদ্দেশ্য হলো, সতর আবৃত করা। সুতরাং পোশাকের সর্বপ্রথম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, সতর ঢেকে রাখা, পুরুষ ও নারীর কিছু অঙ্গকে আল্লাহ তাআলা 'সতর' হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। যে অঙ্গগুলো আবৃত রাখা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পুরুষের সতর ভিন্ন এবং নারীর সতর ভিন্ন। পুরুষের সতর হলো, নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর জন্য মুখমণ্ডল ও পায়ের গোড়ালি ছাড়া সম্পূর্ণ শরীরটাই সতর। সতর ঢাকা ফরজ। যে পোশাক সতর আবৃত রাখতে ব্যর্থ– তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

যে পোশাক সতর ঢাকতে পারে না

তিন ধরনের পোশাক প্রথম মূলনীতি তথা সতর আবৃত করতে ব্যর্থ–

এক. এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক– যা পরলে সতর সম্পূর্ণ আবৃত্ত হয় না।

দুই. এমন পাতলা-পিনপিনে পোশাক– যা পরিধান করলে সতর আবৃত হয় বটে; তবে পাতলা হওয়ার কারণে শরীর স্পষ্ট দেখা যায়।

তিন. এমন আঁটসাঁট পোশাক– যা পরিধান করা সত্ত্বেও শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গসমূহ দেখা যায়।

এ তিন ধরনের পোশাক পরিপূর্ণভাবে সতর আবৃত করতে ব্যর্থ বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে।

আধুনিক যুগের নগ্ন পোশাক

বর্তমান যুগের ফ্যাশন হলো, নগ্ন পোশাক। ফ্যাশনের নিয়ন্ত্রণহীন গতি পোশাকের মূলনীতিকে রক্তাক্ত করে তুলছে। দেহের কোন অঙ্গ উন্মুক্ত আর

কোন অঙ্গ আবৃত- এ নিয়ে কারো যেন মাথা ব্যথা নেই। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ জাতীয় পোশাক পোশাকই নয়। যে নারী এ জাতীয় পোশাক পরে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (صحيح مسلم، كتاب اللباس)

অর্থাৎ, 'তারা পোশাক পরেও নগ্না।'

যেহেতু তাদের এ জাতীয় পোশাক পোশাকের মূল উদ্দেশ্যকেই আহত করেছে, তাই যদিও তারা পোশাক পরেছে, মূলত তারা উলঙ্গ। আধুনিক যুগের নারীদের মাঝে এসব নগ্নতা আজ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের অঙ্গশোভার রঙনাচন আজ যুব সমাজকে অনৈতিকতার দুর্গন্ধ নর্দমায় নিক্ষেপ করছে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে নারীরা আজ নেচে-গেয়ে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলো বর্জন করুন। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলুন। পণ্যপ্রবণ জীবন নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করুন। প্রিয় নবীজী (সা.)-এর নির্দেশনা মতো জীবনকে পরিচালনা করুন।

নারীরা যেসব অঙ্গ আবৃত রাখবে

ডা. আবদুল হাই (রহ.) সম্ভবত এমন কোনো জুমআ ছিলো না যে, কথাটি বলতেন না। তিনি বলতেন, যেসব ফেতনা বর্তমান যুগে ব্যাপক, সেগুলো যে কোনো উপায়ে মিটিয়ে দাও। আজ নারীরা বের হয় নগ্নাবস্থায়। মাথায় কাপড় নেই, বাহুযুগল উন্মুক্ত, বক্ষ উন্মোচিত, পেট অনাবৃত। অথচ সতরের বিধান হলো, পুরুষের সতর পুরুষের সামনেও প্রকাশ করা জায়েয নেই এবং মহিলার সতর মহিলার সামনে খোলাও বৈধ নয়। যেমন কোনো নারী যদি এমন পোশাক পরে যে, যাতে বক্ষদেশ উন্মুক্ত থাকে, পেট অনাবৃত থাকে, বাহুযুগল খোলা থাকে, তাহলে ওই মহিলার জায়েয নেই অন্য মহিলার সামনে যাওয়ার। পুরুষদের সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। কেননা, এসব অঙ্গ মহিলাদের সতরভুক্ত।

গুনাহসমূহের অশুভ ফল

অথচ বর্তমানের কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান অশ্লীলতা থেকে মুক্ত নয়। সর্বত্র বইছে নগ্নতার জোয়ার। নারীরা পুরুষদের সামনে ঢং করে বেড়াচ্ছে। পেট-পিঠ উন্মুক্ত করে, অশালীন অঙ্গভঙ্গি নিয়ে, প্রসাধনী মেখে নির্দ্বিধায় পর পুরুষের সামনে আসা-যাওয়া করছে। এর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র হাদীসের

স্পষ্ট বিরোধিতা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, মূলত এসব ফেতনার কারণ আজ আমরা নানামুখী আযাব-গযবে ভুগছি। নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। আজকের এ অশান্তি, অনিশ্চয়তা, মানসিক অস্থিরতা মূলত আমাদের কর্মেরই অশুভ ফল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।' (সূরা শূরা : ৩০)

কিয়ামতের কাছাকাছি যুগে নারীদের অবস্থা

মনে হচ্ছে যেন রাসূল (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি আজকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো। সুনিপুণভাবে বর্তমান যুগের নারীদের চিত্র এঁকেছেন। এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন- কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন কিছু নারী দেখা যাবে, যাদের চুল হবে ক্ষীণকায় উটের পিঠের হাড়ের মতো। চুলের ফ্যাশন উটের পিঠের হাড়ের মতো উঁচু হওয়ার কথা কল্পনাও করা যেতো না। অথচ আধুনিক যুগের হেয়ার স্টাইল দেখুন, ঠিক যেন তেমন চুলই নারীরা রাখছে, যেমনটি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। নবীজীর হাদীসের প্রতিটি অক্ষর যেন আজকের নারীদের বেলায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়)

তিনি বর্তমান যুগের নারীদের ফ্যাশন কী হবে, এ সম্পর্কে আরো বলেছেন-

مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ

অর্থাৎ- এসব নারীরা চলবে মনোলোভা ভঙ্গিতে, আঁটসাঁট ও সংক্ষিপ্ত পোশাকের মাধ্যমে পর-পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তাদের প্রতি আকর্ষণ করবে। সাজসজ্জা ও উন্নত পারফিউমের সুগন্ধি দ্বারা পর পুরুষের চরিত্রকে উচ্ছৃঙ্খলময় করে তুলবে। তখতের উপর চড়বে এবং মসজিদের ফটক দিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

হাদীস বিশারদগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগ হাদীসটিকে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে। নারীরা আজ গাড়িতে করে চড়ে বেড়াচ্ছে। মসজিদের সামনে দিয়েও বেপরোয়াভাব নিয়ে দেহের চমক দেখায়। আল্লাহর ওয়াস্তে বিশ্বাস করুন, আজকের অশান্তি, অনিরাপত্তা ও হাহাকার স্রেফ এসব কারণেই হচ্ছে। রাসূল (সা.)-এর আদর্শ বর্জন করার পরিণতিতেই আমরা অশান্তির মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে

গুনাহ করারও দু'টি পদ্ধতি আছে। প্রথমত. গোপনে, নির্জনে গুনাহ করা; অন্যের সম্মুখে গুনাহ না করা। এ ধরনের গুনাহর জন্য অনেক সময় গুনাহগার ব্যক্তি লজ্জিত হয় এবং তাওবার তাওফীক হয়। দ্বিতীয়ত. প্রকাশ্যে গুনাহ করা, দিবালোকে গুনাহ করে সে গুনাহ নিয়ে গর্ব করা। এ ধরনের গুনাহ খুবই জঘন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

كُلُّ أُمَّتِىْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ (صحيح البخارى، كتاب الأدب)

আমার উম্মতের সকল গুনাহগার তাওবার মাধ্যমে অথবা আল্লাহর বিশেষ করুণায় মাফ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করেছে এবং গুনাহর উপর লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে বড়াই করে বেড়িয়েছে, সে মাফ পাবে না।

সোসাইটি ছেড়ে দাও

অনেক ক্ষেত্রে আমরা সামাজিক অজুহাত দেখিয়ে গুনাহ ছাড়তে রাজি হই না। বলি, সোসাইটিতে আমার নাক কাটা যাবে, মানুষ তিরস্কার করবে ইত্যাদি। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছি কি যে, সোসাইটি কত দিন আমাকে সঙ্গ দিতে পারবে? এ সোসাইটির অজুহাত কত দিন দেখাতে পারবো? কবরেও কি এ 'সোসাইটি' আমার সঙ্গে যাবে? মনে রাখবেন, সোসাইটি কবরে কোনো কাজে আসবে না। সেখানে ঈমান ও আমল ছাড়া কোনো কথা চলবে না। সোসাইটির কোনো সদস্য সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহর আযাব থেকে সে রক্ষা করতে পারবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

'আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।'

(সূরা বাকারা : ১০৭)

উপদেশমূলক ঘটনা

কুরআন মাজীদের সূরা সাফফাতে এক ব্যক্তির ঘটনার বিবরণ এসেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে দয়া করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জান্নাতের সকল নেয়ামত তাঁকে দান করবেন। এমন সময় তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়বে, যে বন্ধু পার্থিব জগতে তাকে মন্দের প্রতি ডাকতো। জানা নেই, আজ তার কী অবস্থা হলো। সোসাইটির কথা বলে সে খারাপ কাজের প্রশ্রয় দিতো। না-জানি, তার এসব বড়-বড় কথার কী পরিণতি হলো। এই ভেবে সে জাহান্নামের প্রতি তাকাবে। আল-কুরআনের ভাষায়–

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ، وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ (سورة صفت : ٥٥ - ٥٧)

'তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করেছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।' (সূরা সাফফাত ৫৫–৫৬)

আমরা সেকেলেই বটে!

বলতে চাচ্ছিলাম সোসাইটির কথা। সোসাইটি আজ তোমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট মনে হয়। সোসাইটির কথা শুনলে তোমাদের মন খুশিতে নেচে উঠে। তবে যদি তোমাদের 'ঈমান' বলে কিছু থাকে, যদি আল্লাহর সম্মুখে মৃত্যুর পর উপস্থিত হওয়ার ভয় থাকে, জান্নাত-জাহান্নামে যদি বিশ্বাসী হয়ে থাক, তাহলে সোসাইটির আবেদন ছেড়ে দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিধান মতে চলো। সোসাইটির তিরস্কার মূলত কিছুই নয়। সোসাইটি তোমাকে সেকেলে বলবে, পশ্চাদগামিতার অপবাদ দিবে, "Bake world" বলে নাক সিটকাবে– এসব তুমি হাসিমুখে বরণ করে নাও। চলমান স্রোতের বিরুদ্ধে নিজস্ব পথ রচনা করে একটু বেঁকে বস, সাহস করে বলে দাও, 'আমরা এ রকমই– পারলে আমাদের সঙ্গে চলো, অন্যথায় আমাদের পথ ছেড়ে দাঁড়াও।' তাহলে দেখতে পাবে, সোসাইটির নিকেল ভেঙ্গে গেছে, তোমার নিজস্ব পথ রচনা হয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত অন্তত এতটুকু সাহস দেখাতে পারবে না, ততদিন সোসাইটির কালো বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এ সোসাইটি-চেতনা একদিন তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

তিরস্কার মুমিনের জন্য মুবারক

আম্বিয়ায়ে কেরাম সোসাইটির তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এসব কিছু সহ্য করেছেন। যারাই দ্বীনের পথে চলতে চায়, তার দিকে এ জাতীয় তীর ছুটে আসবেই।

এজন্য হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا "مَجْنُوْنٌ" (مسند احمد ٦٨/٣)

'সমাজ তোমাকে পাগল সাব্যস্ত করা পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করতে থাক।'

এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, কালের স্রোত চলেছে এক দিকে, অথচ তুমি যাচ্ছো উল্টো পথে। স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তুমি বরং স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার কসরত করছো। যুগের পরিভাষায় ধার্মিকতা ও আমানতদারি আজ শুধু পাগলের প্রলাপ। আর তুমি এ প্রলাপই বার বার আওড়াচ্ছ। জীবনে তুমি সুদ-ঘুষের কারবারে যুক্ত হওনি, অথচ যুগ তোমাকে সে দিকেই ডাকছে। অশ্লীল পোশাক হলো যুগের ফ্যাশন, অথচ তুমি এ ফ্যাশনকে পরিত্যাগ করেছ, তাহলে যুগের কাছে, যুগের মানুষের কাছে তুমি পাগল বৈ কি! কিন্তু মনে রাখবে, যুগের এই তিরস্কার তোমার গলার মালা। এর মাধ্যমে তুমি প্রিয়নবী (সা.)-এর সুসংবাদের যোগ্য হয়ে উঠবে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই; বরং তুমি আলোচ্য হাদীস মতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে অবগাহন করেছো। এটা তোমার জন্য সুসংবাদ। তুমি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাই দু' রাকাত শোকরানা নামায আদায় করে নাও।

দ্বিতীয় মূলনীতি

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "رِيشًا" অর্থাৎ 'আমি পোশাক তৈরি করেছি তোমাদের সাজসজ্জার জন্য।' মূলত পোশাকের মাধ্যমেই একজনের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাই পোশাক হওয়া উচিত দৃষ্টিনন্দন, যেন প্রকৃতপক্ষেই তা দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পারে। রং-ঢংহীন, দৃষ্টিকটু এবং ঘৃণার উদ্রেক করে– এমন পোশাক এ মূলনীতির পরিপন্থী।

মনোরঞ্জনের জন্য উন্নত পোশাক পরিধান করা

অনেক সময় মনে সংশয় জাগে, কেমন পোশাক পরবো। মূল্যবান পোশাক হলে সংশয় জাগে, এটা অপচয় হবে না তো? আর সাধারণ পোশাকেরও বা মাপকাঠি কী?

কোনটিকে বলা হবে সাধারণ পোশাক?

আল্লাহ তাআলা হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর মাকাম বুলন্দ করুন, দ্বীনের প্রতিটি বিষয় তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, সমকালে এত বিস্ময়কর কাজ আর কেউ করেনি। যেমন পোশাক সম্পর্কে তিনি বলেন, সতর ঢাকার গুণ পোশাকের মাঝে থাকতেই হবে, পাশাপাশি একটু আরামদায়কও হতে হবে। যেমন পাতলা পোশাক আরামের উদ্দেশ্যে পরিধান করা যাবে।

অনুরূপভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেও পোশাক পরা যাবে। যেমন দশ টাকার কাপড়ের তুলনায় যদি পনের টাকার কাপড় তোমার ভালো লাগে, তাহলে তা পরতে পারবে। সামর্থ থাকলে এটা অপচয় হবে না। একটু আরামের জন্য, একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের কাপড় পরিধানের অনুমতি তোমার জন্য রয়েছে।

ধনী পরবে ভালো পোশাক

বরং যার সামর্থ আছে, টাকা-পয়সা আছে, তার জন্য নিম্নমানের পোশাক পছন্দযোগ্য নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি একেবারে নিম্নমানের পোশাক পরে রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসেছিলো। লোকটির অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন–

اَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : مِنْ اَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ : قَدْ اٰتَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، قَالَ : فَاِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ (ابو داؤد، كِتَابُ اللِّبَاسِ، رقم الحديث ٤٠٦٣)

তোমার নিকট সম্পদ আছে কি? বললো, হাঁ, আছে। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার নিকট কী ধরণের সম্পদ আছে? বললো, উট, ঘোড়া, ছাগল, গোলাম-বাঁদী– সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে এর কিছু আলামত তোমার পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া উচিত। কেননা, তোমার ময়লামাখা পোশাক প্রকারান্তরে আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল্যবান পোশাক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক সম্পর্কে যে প্রসিদ্ধি আছে– কালো কম্বলের মতো। মূলত কথাটি প্রসিদ্ধ হয়েছে আমাদের কবিদের মাধ্যমে। এটা অবশ্য ঠিক যে, তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তবে এটাও বাস্তব যে, তিনি মূল্যবান পোশাকও পরেছেন। একবার এমন জুব্বাও পরেছেন, যার দাম ছিলো দু' হাজার দীনার। এর কারণ হলো, তাঁর প্রতিটি কাজই ছিলো শরীয়তের অংশবিশেষ। তাই তিনি আমাদের মত দুর্বলদের কথাও বিবেচনা করেছেন। আরাম ও শোভা বর্ধনের লক্ষ্যে উন্নত পোশাকও পরেছেন। সুতরাং আমাদের জন্যও এটা জায়েয হবে।

প্রদর্শনী জায়েয নয়

তবে মনোরঞ্জন কিংবা আরাম উদ্দেশ্যে না হয়ে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে সে পোশাক পরিধান নাজায়েয হবে। নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ, অপরের উপর বড়ত্ব প্রদর্শন কিংবা প্রভাব বিস্তারের ফন্দি থাকলে– সে পোশাক হারাম।

এখানে শায়খের প্রয়োজন

কথা হলো, এ সুক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করবে কে? বিলাসিতা ও অহঙ্কারপূর্ণ পোশাক কিংবা সৌন্দর্য ও আরাম লাভের নিয়তে পোশাক– এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে খুব সুক্ষ্ম ফারাক। এখন কে বলবে– পোশাকটি কোন নিয়তে পরিহিত হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন একজন কামিল শায়খের– যিনি নির্ণয় করে দিবেন এ পার্থক্য। শায়খের নিকট নিজের অবস্থা জানালে, পোশাক পরিধানের পর নিজের অবস্থা কেমন হয় সে কথা শায়খকে অবহিত করলে, তিনিই বলে দিবেন, এ পোশাক তোমার বেলায় হারাম হলো না-কি জায়েয হলো। অনন্তর হযরত থানবী (রহ.)-এর উল্লিখিত কথাটি স্মরণ রাখবে– তাহলে বুঝতে সহজ হবে, কেমন পোশাক তুমি পরিধান করলে।

অপচয় ও অহঙ্কার থেকে বেঁচে থাকবে

প্রিয় নবী (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি এ প্রসঙ্গে একটি মূলনীতি। তিনি বলেছেন–

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَئَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمُخِيْلَةٌ

(صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ اللِّبَاسِ)

'ইচ্ছে মতো পরবে, ইচ্ছে মতো খাবে, তবে দু'টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে– অপচয় এবং অহঙ্কার।'

অর্থাৎ– যে কোনো হালাল খাদ্য এবং যে কোনো রুচিসম্মত পোশাক পরতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখবে, যেন অপচয় না হয় এবং অহঙ্কার প্রকাশ না পায়।

ফ্যাশনের পিছনে চলবে না

আধুনিক যুগ ফ্যাশনের যুগ। মানুষের চিন্তা-চেতনাও বদলে গেছে। রুচির বিকৃতি ঘটেছে। পছন্দ-অপছন্দ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ফ্যাশনের পেছনেই মানুষ দৌড়াচ্ছে। গত কালের ফ্যাশন আজ এসে পরিত্যক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে। এক সময় বড় ও ঢিলেঢালা পোশাক ছিলো ফ্যাশন। বর্তমানে চলছে সংক্ষিপ্ত পোশাকের ফ্যাশন। ফ্যাশনের নির্দিষ্ট কোনো ভাষা নেই। অতীতে যা ছিলো নন্দিত, বর্তমানে তা হয়ে গেলো নিন্দিত। বোঝা গেলো, ফ্যাশন অস্থির। পক্ষান্তরে শরীয়ত হলো, স্থির। অতএব ফ্যাশন নয়; শরীয়তই হবে সবকিছুর মাপকাঠি। এমনকি পোশাকেরও।

নারী এবং ফ্যাশনপূজা

নারীরা এক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর। তাদের ধারণা, পোশাক নিজের জন্য নয়; বরং অন্যের জন্য। পোশাক পরে অপরের সামনে গেলে সে পোশাক সম্পর্কে দু' একটা স্তুতি যেন তাদের শুনতেই হবে। যেন দর্শক বলতে হবে, 'পোশাকটি ভালো হয়েছে, বেশ তো ভালো পোশাকই পরেছ, তোমাকে দারুণ মানিয়েছে ইত্যাদি।' এজন্য দেখা যায়, নারীরাই বেশি ফ্যাশনপূজারী হয়। বাসা-বাড়িতে ময়লা-পুরাতন কাপড় পরিধান করে, আর বাইরে যাওয়ার নাম উঠলেই ফ্যাশনের কথা মাথায় কিলবিল করে উঠে। এক অনুষ্ঠানে এক ধরনের স্যুট পরলে– অন্য অনুষ্ঠানের বেলায় তা পাল্টাতেই হয়। নিজেকে জাহির করার প্রতিযোগিতা তাদের মাঝে প্রচণ্ড। প্রদর্শনীর তাড়নায় তারা তাড়িত থাকে। তাদের এ ফ্যাশন প্রিয়তার কুপ্রভাব কত গভীর– তা আমরা ভালো করেই জানি। 'স্যুট-সেট' পাল্টানোর এ মানসিকতার পরিবর্তন না করতে পারলে নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতির অপেক্ষা করুন। মনে রাখবেন, এ ধরনের মানসিকতা হারাম। তবে হাঁ, বিলাসিতা ও প্রদর্শনীর প্রবণতা না থাকলে; শুধু আরাম ও আত্মতৃপ্তির নিয়ত থাকলে যে কোনো শালীন পোশাক নারীরাও পরতে পারবে।

ইমাম মালিক (রহ.) এবং নতুন জোড়া

এমন বুযুর্গও আমাদের ছিলেন, যারা শানদার পোশাক পরতেন। যেমন ইমাম মালিক (রহ.)-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। বড় মাপের একজন ইমাম ছিলেন। মদীনা শরীফে থাকতেন বিধায় 'ইমামু দারুল হিজরত' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রয়েছে, তিনি প্রতিদিন এক জোড়া কাপড় পরতেন। অর্থাৎ বছরে তিনশ' ষাট জোড়া কাপড় তিনি পরতেন। কারো প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রতিদিন নতুন কাপড় পাল্টানো অপচয় নয় কি? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, কী করবো, আসল কথা হলো, এক বন্ধু প্রতি বছর আমাকে তিনশত ষাট জোড়া পোশাক হাদিয়া দেন। বছরের শুরুতেই তিনি সব পোশাক নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলে দেন, প্রতিদিনের জন্য এক সেট

কাপড়। পুরা বছরের জন্য সেই তিনশ' ষাট সেট কাপড়– আপনাকে হাদিয়া দিলাম। তাই প্রতিদিন আমাকে পোশাক পাল্টাতে হয়। বন্ধুর মন রক্ষার্থে এবং হাদিয়ার উদ্দেশ্য পূরণার্থে প্রতিদিন এক জোড়া করে কাপড় আমাকে পরতে হয়। অন্যথায় আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো আসক্তি নেই। বিলাসিতা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং বন্ধুর মন রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য।

হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা

একটি বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা মনে পড়ে গেলো। ঘটনাটি শুনেছি আব্বাজানের মুখে। শিক্ষণীয় ঘটনাই বটে! ঘটনাটি হলো, হযরত থানবী (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলো দু'জন। একজন বড়, অপরজন ছোট। উভয়ের সঙ্গে হযরতের দারুণ মহব্বত ছিলো। তবে বড় জনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো একটু গভীর। হযরতের আরামের ফিকির তিনি সব সময়ই করতেন। এক ঈদের ঘটনা। তিনি ভাবলেন, হযরতের জন্য উন্নত কাপড়ের একটা শেরওয়ানী প্রয়োজন। সে যুগে 'আঁখ কা নেশা' নামক জাঁকালো এক ধরনের কাপড় ছিলো। তিনি ওই কাপড়টি ক্রয় করলেন এবং হযরতের অনুমতি ছাড়াই শেরওয়ানী বানানো শুরু করে দিলেন। শেরওয়ানীটি তৈরি হওয়ার পর যখন তাঁর সামনে পেশ করবেন, তখন হযরত খুব খুশি হবেন। ঈদের আগে গোটা রমযান এ শেরওয়ানীর পেছনে মেহনত করলেন। সে যুগে তো মেশিন ছিলো না, তাই মাসব্যাপী হাতেই সেলাই করলেন। তারপর সেটা তৈরি হওয়ার পর ঈদের রাতে হযরতের সামনে পেশ করলেন। বললেন, আপনার জন্য নিজ হাতে শেরওয়ানীটি বানিয়েছি। আমার মন চায়, আপনি এটা পরে ঈদগাহে যাবেন এবং নামায পড়াবেন।

দেখুন, হযরতের রুচিবোধের সঙ্গে এ আড়ম্বরপূর্ণ শেরওয়ানীর কী সম্পর্ক। কিন্তু হযরত বলেন, যদি শেরওয়ানীটি না পরি, তাহলে বেচারির মনে দুঃখ আসবে। তাই হযরত তাঁর মন রক্ষা করার জন্য বললেন, তুমি তো দেখি 'মাশাআল্লাহ' দারুণ শেরওয়ানী বানিয়েছ।

অবশেষে হযরত শেরওয়ানীটি পরেছেন। এটি পরিধান করে ঈদগাহে গিয়েছেন, নামাযের ইমামতি করেছেন।

নামায শেষে এক ব্যক্তি হযরতের নিকট এসে বললো, হযরত! শেরওয়ানীটি আপনাকে একটুও মানাচ্ছে না। হযরত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ভাই! তোমার কথাই ঠিক। এ বলে শেরওয়ানীটা তিনি খুলে ফেললেন এবং ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে হাদিয়া দিলাম, এখন থেকে তুমিই এটি পরবে।

অপরের মনোরঞ্জন

ঘটনাটি হযরত নিজে আব্বাজানকে শুনিয়েছিলেন। তারপর বললেন, শেরওয়ানীটি গায়ে দিয়ে যখন ঈদগাহে যাচ্ছিলাম, জানো না, তখন আমার মনের অবস্থা কেমন ছিলো। কারণ, জীবনে কখনও অহংকারপূর্ণ পোশাক পরিনি। কিন্তু মনে মনে সেদিন শুধু একটাই নিয়ত করেছিলাম যে, আল্লাহর যে বান্দী গোটা এক মাস মেহনত করে শেরওয়ানীটা তৈরি করেছে, তার অন্তর যেন খুশি থাকে। শুধু তার মনোরঞ্জনের নিয়তে এতটুকু মনোপীড়া সহ্য করেছি এবং অপরের নিন্দাবাদও বরণ করেছি।

সুতরাং বোঝা গেলো, হাদিয়া প্রদানকারীর মন খুশি করার নিয়তে উত্তম পোশাক পরা যাবে। কিন্তু সেখানে অহংকার থাকলে, ফ্যাশনাবল সাজার নিয়ত থাকলে, মানুষ বড় মনে করবে– এ ধরনের কোনো চিন্তা থাকলে, তাহলে সে পোশাক হবে হারাম।

তৃতীয় মূলনীতি

পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি হলো, পোশাকের মাধ্যমে বিজাতির সাদৃশ্য গ্রহণ কিংবা অনুকরণ উদ্দেশ্য হতে পারবে না। অর্থাৎ– যে ধরনের পোশাক বিজাতীয় পোশাক হিসেবে পরিচিত– সে ধরনের পোশাক পরিধান করা যাবে না। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাশাব্বুহ' বলা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابو داؤد، كِتَابُ اللِّبَاسِ ٤٠٣١)

'যে বিজাতীয় সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন পরিগণিত হবে।'

'তাশাব্বুহ' কিভাবে হয়?

'তাশাব্বুহ' সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে, তাশাব্বুহ তথা অন্য জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ কিভাবে হয় এবং তা কখন হারাম হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যদি এমন কোনো বিষয়ে অন্য জাতির অনুসরণ করা হয়– যা এমনিতেই শরীয়তপন্থী ও দূষণীয়, তাহলে এ ধরনের 'তাশাব্বুহ' নিঃসন্দেহে হারাম। পক্ষান্তরে যে বিষয়টি আসলে দূষণীয় ও শরীয়ত পরিপন্থী নয়; বরং অনুমোদনযোগ্য, তাহলে এ প্রকারের কাজও যদি অন্য জাতির অনুসরণের উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন এই বৈধ কাজটাও হারামে পরিণত হবে।

গলায় পৈতা ঝুলানো

যেমন হিন্দু জাতি গলায় পৈতা ঝুলায়। পৈতা দেখতে অনেকটা হারের মতোই। কোনো মুসলমান যদি হিন্দু জাতির অনুকরণে গলায় পৈতা ঝুলায়, তাহলে 'তাশাব্বুহভুক্ত' হয়ে হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে।

কপালে তিলক লাগানো

তেমনিভাবে হিন্দু নারীরা কপালে লাল তিলক লাগায়। মনে করুন, যদি হিন্দু নারীদের মাঝে বিষয়টির প্রচলন না থাকতো, আর কোনো মুসলিম নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি লাগাতো, তাহলে কাজটি বৈধ হতো। কিন্তু একজন মুসলিম নারী যদি হিন্দু নারীদের অনুকরণে কপালে তিলক লাগায়, তাহলে এটি হারাম হবে।

প্যান্ট পরিধান করা

অনুরূপভাবে যদি কোনো মুসলমান ইংরেজদের সাদৃশ্যতার লক্ষ্যে প্যান্ট পরিধান করে, তাহলে তাও নাজায়েয হবে। তাছাড়া প্যান্ট পরিধান পোশাকের প্রথম মূলনীতি তথা সতর আবৃত করতে ব্যর্থ। তা এভাবে যে, যেহেতু প্যান্ট সাধারণত খুব আঁটসাঁট হয়ে থাকে বিধায় দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো স্পষ্ট প্রতিভাত হয়– যা সতর আবৃতকরণের পরিপন্থী। আর প্যান্ট সাধারণত টাখনুর নিচেও ঝুলে থাকে। সুতরাং এটি হারাম হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তবে কেউ যদি উক্ত তিনটি বিষয় থেকে সতর্ক থাকে প্যান্ট পরিধান করে অর্থাৎ বিজাতীয় অনুকরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং সতর ঢাকার উদ্দেশ্যে; আঁটসাঁট নয় বরং ঢিলেঢালাভাবে এবং টাখনুর নিচে নয় বরং টাখনুর উপরে প্যান্ট পরিধান করে, তাহলে তা হারাম হবে না ঠিক– তবে মাকরূহ থেকেও মুক্ত হবে না। মাকরূহ হবে কেন– এ বিষয়টিও একটু গভীরভাবে ভাবতে হবে।

তাশাব্বুহ এবং মুশাবাহাত

এক্ষেত্রে 'তাশাব্বুহ' এবং 'মুশাবাত'– দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। 'তাশাব্বুহ'র অর্থ হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের অনুকরণ করা এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি বা জাতির মতো হওয়ার চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে 'মুশাবাহাত' হলো, অন্যের মতো হওয়ার ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও অন্যের মতো হয়ে যাওয়া। কোনো কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য জাতির অনুরূপ হয়ে গেলে কাজটি যদিও হারাম হয় না, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত মুশাবাহাত থেকেও উম্মতকে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, অপরাপর জাতি থেকে স্বতন্ত্র থাকার চেষ্টা অবশ্যই করবে। মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এমন যেন না

হয় যে, প্রথম দর্শনে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না– এ ব্যক্তি মুসলিম নাকি অমুসলিম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিজাতীয় অনুসরণ হলে সত্যিই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। সালাম দেয়া হবে কি হবে না– এ ধরনের দোদুল্যমানতায় ভুগতে হয়। বৈধ অনুসরণের মাধ্যমে এ ধরনের বেশ ধারণ করা একজন ঈমানদারের ক্ষেত্রে কখনও শোভা পায় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশাবাহাত থেকেও দূরে থাকতেন

'মুশাবাহাত' থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন মহররম মাসের দশ তারিখকে বলা হয় আশুরার দিন। এ দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে অনেক ফযীলত এসেছে। রাসূল (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেছেন, তখনও প্রথম দিকে রোযাটি ফরয ছিলো। রমযানের রোযাও তখনও ফরয সাব্যস্ত হয়নি। রমযানের রোযা ফরয সাব্যস্ত হওয়ার পর আশুরার রোযা আর ফরয থাকেনি। তবে নফল হিসাবে রয়ে গেছে। মদীনায় আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতে পারলেন, ইহুদীরাও এই দিনে রোযা রাখে। সুতরাং বলাবাহুল্য, তখন মুসলমানরা এ দিনে যদি রোযা রাখতো, তাহলে এটা ইহুদীদের অনুসরণ হতো না; বরং রাসূল (সা.)-এরই অনুসরণ হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আগামী বছর আমি জীবিত থাকলে আশুরার রোযার সঙ্গে আরেকটি রোযা রাখবো। সেটি নয় তারিখ কিংবা এগার তারিখে রাখবো। যেন ইহুদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়। তাদের সাদৃশ্যতা বর্জনই হলো আশুরার সঙ্গে আরেকটি রোযা রাখার মূল কারণ। দেখুন, রোযা– যা একটি ইবাদতও বটে, সেক্ষেত্রে যখন 'মুশাবাহাত' অনুচিত হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে তো অবশ্যই হবে। এইজন্যই 'তাশাব্বুহ' হারাম। আর 'মুশাবাহাত' মাকরূহ।

মুশরিকদের প্রতিকূলে চলো

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ اللِّبَاسِ، رقم الحديث ٥٨٩)

'তোমরা পৌত্তলিকদের পথ-পন্থা, রীতি-নীতি ও চাল-চলনের অনুকূলে নয়; প্রতিকূলে চলো।'

অপর হাদীসে তিনি বলেছেন–

فَرْقٌ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ (اَبُوْ دَاوُد، كِتَابُ اللِّبَاسِ، باب فى العمائم، رقم الحديث ٤٠٧٨)

'আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করা।' মুশরিকরা পাগড়ির নিচে টুপি পরে না; আমরা পরি।

দেখুন, পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করা সত্ত্বাগতভাবে দূষণীয় নয়। কিন্তু রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। এতটুকু মুশাবাহাতও তিনি অপছন্দ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এর গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুসলিম জাতি একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতি

ভাবনার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতির মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের নাম হিযবুল্লাহ তথা আল্লাহর দল। গোটা দুনিয়ার মর্যাদা আর আমাদের মর্যাদা এক নয়। কুরআন মাজীদে সকল জাতিকে মৌলিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে–

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

'আল্লাহ তোমাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন– মুমিন এবং কাফির।' (সূরা তাগাবুন : ২)

সুতরাং মুমিনরা যেন কাফিরদের মাঝে হারিয়ে না যায়। তাদের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। পোশাকে-আশাকে, ওঠা-বসায়– মোটকথা সব বিষয়ে তাদের স্বতন্ত্রবোধ রক্ষা করা জরুরী। সর্বত্র পরিলক্ষিত হবে ইসলামী অনুশাসনের ছাপ। মুসলমানরা যদি অন্য জাতির চাকচিক্য দেখে অনুসরণ করা শুরু করে, তাহলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়ে যাবে।

বর্তমানে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে 'মুসলিম-অমুসলিম চেনা বড় দায় হয়ে যায়। সকলের পোশাক-ফ্যাশন আজ একীভূত হয়ে গিয়েছে। কার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে– এটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকে সালাম দেয়া হবে– এক্ষেত্রে শিকার হতে হয় বিব্রতকর পরিস্থিতির। সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এসব সমস্যার সমাধান চমৎকারভাবে দিয়েছেন। বলেছেন, তাশাব্বুহ থেকে বেঁচে থাকবে– এটি হারাম। আর মুশাবাহাত থেকে দূরে থাকবে– কেননা এটি মাকরূহ।

আত্মমর্যাদাবোধ কি নেই?

কত লজ্জাকর কথা! মুসলমানরা আজ এমন এক জাতির পোশাকের প্রতি আসক্ত, যে জাতির জিঘাংসা তাদের প্রতি সর্বত্র প্রসারিত; যে জাতি তাদেরকে করে রেখেছে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সকল তীর যে

জাতি বিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর; অথচ সে জাতিই আজ তাদের কাছে অনুকরণীয়। মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ কি নেই? এটা কত বড় লজ্জার কথা।

ইংরেজদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদেরকে অনেকে বলে, আমরা ইংরেজদের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করি বিধায় আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। অথচ যে জাতির পোশাক তোমরা পরিধান করেছ, সে জাতি যখন ভারতবর্ষ দখল করে, তখন আমাদের মুসলিম মোঘল রাজা-বাদশাহর নির্দিষ্ট পোশাক অর্থাৎ পাগড়ি-সেলোয়ার, পাঞ্জাবি– তাদের লোকদেরকে পরায়, বরং পরতে বাধ্য করে। বলো, কে সংকীর্ণমনা? আমরা নাকি তারা? তোমরা মুসলমান হয়ে আজ তাদের লেবাস আনন্দের সঙ্গে বরণ করেছ, অথচ তারা তোমাদের সুলতানদের পোশাক তাদের নিম্ন শ্রেণীদেরকে পরতে বাধ্য করেছে। এটা আত্মমর্যাদাবোধ নয়; বরং লজ্জার বিষয়।

সব পরিবর্তন করলেও

জেনে রেখো, তোমরা যদি সবকিছু পরিবর্তন করে নাও। তাদের সবকিছু অনুসরণ করা শুরু কর, পোশাকে-আশাকেও যদি তাদের সাজে সজ্জিত হও– তবুও তোমরা ইংরেজদের দৃষ্টিতে 'সাহেব' হতে পারবে না। কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদী এবং খ্রিস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।' (সূরা বাকারা : ১২০)

সুতরাং মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদের পোশাক দ্বারা আবৃত হলেও তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। তাদের সন্তুষ্টি পেতে হলে তোমাকে ইসলাম ছাড়তে হবে। তাদের ধর্মবিশ্বাসে তোমাকে বিশ্বাসী হতে হবে। বর্তমানের প্রেক্ষাপট এ আয়াতের সত্যতার জ্বলন্ত সাক্ষী।

পাশ্চাত্যের জীন এবং ড. ইকবালের সমীক্ষা

পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর সমীক্ষা চালিয়ে ড. ইকবাল বলেছিলেন–

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نے ز رقص دختران بے حجاب

نے ز سحر ساحران لالہ روس نے ز عریان ساق نے از قطع موش

অর্থাৎ- পাশ্চাত্যের যে শক্তি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা তাদের গান-বাদ্য, পানশালা, চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা, পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও ফ্যাশন পূজার কারণে নয়; তাহলে তাদের এ উন্নতির পেছনে রহস্য কী? তিনি বলেন-

قوت افرنگ از علم وفن است از ہمیں آتش چراغش روشن است

অর্থাৎ- 'তাদের এই উন্নতি ও শক্তি তাদের অধ্যবসায়, গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসল।'

অবশেষে তিনি বলেছেন-

حکمت از قطع وبرید جامہ نیست مانع علم وہنر عمامہ نیست

'আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পোশাকের প্রয়োজন হয় না। পাগড়ি-জুব্বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় হতে পারে না।'

অর্থাৎ যে জিনিস তাদের থেকে গ্রহণ করা উচিত ছিলো, মুসলমানরা সেটা গ্রহণ করলো না। উপরন্তু তাদের অনৈতিক জীবনাচার অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের পোশাক খুলে ফেলেছে, ফলে লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। যে জাতি নিজের ইজ্জত বোঝে না, সে জাতিকে কখনও অন্য জাতি স্যালুট করে না। সুতরাং তোমাদের সম্মান, প্রতিপত্তির মাঝে বিপত্তি দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। এজন্য তাদের জীবনের অনুসরণ নয়; বরং তাদের শক্তির উৎস খুঁজে নাও এবং গ্রহণ করলে সেটাই গ্রহণ কর।

চতুর্থ মূলনীতি

পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের চতুর্থ মূলনীতি হলো, হৃদয়ে অহংকার ও বড়াই উদ্রেককারী পোশাক পরিধান করা যাবে না। এ জাতীয় পোশাক ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। অহংকার যেমনিভাবে জাঁকালো পোশাকের মাধ্যমে আসতে পারে, তেমনিভাবে চটের পোশাকের মাধ্যমেও আসতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি চটের পোশাক পরলো। ভাবলো, এতে মানুষ আমাকে সূফী, মুত্তাকী, বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা আখ্যা দিবে। তারপর তার অন্তরে ধীরে ধীরে এমন ভাব চলে আসলো, আমি বুযুর্গ; অন্যরা নষ্ট। আমি আল্লাহওয়ালা; অন্যরা দুনিয়াওয়ালা। এভাবে তার অন্তরে অহংকার জায়গা করে নিলো। তখন এ চটের পোশাকও তার জন্য হারাম হয়ে গেলো।

টাখনু ঢেকে রাখা জায়েয নেই

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا (صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب من جرثو به من الخيلاء، رقم الحديث ٥٧٩١)

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি তাকাবেন না, যে অহংকারবশে তার তহবন্দ বা পায়জামা ঝুলিয়ে চলে।'

অন্য হাদীসে এসেছে, টাখনুর নিচে যে অংশ পায়জামা-লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে।

সুতরাং টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে তার দু'টি শাস্তি আলোচ্য হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো। এক. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। দুই. টাখনুর নিচের অংশ জাহান্নামে যাবে। অতএব এটি কবীরা গুনাহ; বেঁচে থাকা জরুরী। হাদীস দুটির আমল করা খুব কঠিন নয়। একটু সতর্ক থাকলেই হয়।

এটা অহংকারের আলামত

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ পৃথিবীতে যে যুগে আগমন করেছেন, তাকে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়াত। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান ছিলো আইয়ামে জাহিলিয়াতের ফ্যাশন। কাপড় মাটির সঙ্গে হেঁচড়িয়ে চলা ছিলো তাদের কাছে গর্বের বিষয়। কওমী মাদরাসায় 'হামাসা' নামক এক কিতাব পড়ানো হয়। সেখানে কবি নিজ অহংকার প্রকাশার্থে বলেছেন-

اِذَا مَا اصْطَبَحْتُ اَرْبَعًا خَطَّ مِئْزَرِى

'চারটি প্রভাতী পানপাত্র সাবাড় করে যখন আমি বের হই, তখন আমার পায়জামা মাটিতে চরণ সৃষ্টি করে চলতে থাকে।'

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পর জাহিলিয়াতের মূলে আঘাত করা হলো। জাহিলিয়াতের অন্যান্য বিষয়ের মতো এ ফ্যাশনকে মিটিয়ে দেয়া হলো। তিনি স্বভাবটিকে গোঁয়ার্তুমি স্বভাব হিসাবে আখ্যা দিলেন।

বর্তমানে ইসলাম বিরোধী নানা অপপ্রচার জোরেশোরেই চলছে। অনেকে বলে, রাসূল (সা.) তো আরবদের অনেক রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি আরবীয় পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। পোশাকের ব্যাপারে তিনি শুদ্ধি অভিযান চালাননি। সুতরাং বর্তমানে যদি যুগের প্রচলিত পোশাক পরিধান করা হয়, এতে অসুবিধা কী?

ভালোভাবে বুঝে নিন, নবীজী (সা.) উক্ত নীতিমালায় এর স্পষ্ট নিষেধ এসেছে। অহংকারপূর্ণ পোশাক পরিধানের কোনো সুযোগ তাঁর আনীত ধর্মে নেই। কী হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যা হবার তা হবে। টাখনুর নিচের অংশ জাহান্নামে যাবে। এর মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর গযবের উপযোগী করে নেয়া হবে।

ইংরেজদের কথায় হাঁটুও উন্মুক্ত করেছ

আমাদের এক অন্যতম বুযুর্গের নাম হলো, হযরত মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী (রহ.)। তিনি তাঁর এক বয়ানে বলেছিলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বললেন, টাখনু উন্মুক্ত রাখবে। টাখনু ঢেকে রাখা নাজায়েয– তখন আমরা অবিবেচকের মতো টাখনু ঢেকে রাখলাম। কিন্তু ইংরেজরা যখন বললো, হাঁটু বের করে দাও, হাফ প্যান্ট পরিধান কর তখন আমরা হাঁটুও বের করে দিলাম এবং হাফপ্যান্ট পরা শুরু করে দিলাম। এটা কত বড় ধৃষ্টতা!

হযরত উসমান (রা.)-এর ঘটনা

ঘটনাটি এর পূর্বেও আপনারা শুনেছেন। হযরত উসমান (রা.) সন্ধি চুক্তির লক্ষ্যে মক্কার কাফির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। ইতিহাসের ভাষায় এ সন্ধির নাম হুদায়বিয়ার সন্ধি। তাঁর চাচাত ভাইও তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি উসমান (রা.)কে বললেন, আপনার পরিধেয় পোশাক গোড়ালীর উপরে। আর মক্কার মানুষ এ ধরনের লেবাসধারীদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাই পায়জামাটি একটু নামিয়ে নিন, তাহলে অবজ্ঞার চোখে দেখার অবকাশ তাদের থাকবে না। উসমান (রা.) উত্তর দিলেন–

لَا هٰكَذَا اِزَارَةُ صَاحِبِنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমার কথা শুনবো না। কাজটি আমি করবো না। কারণ, আমি দেখেছি, আমার প্রিয়তম এভাবেই পায়জামা পরিধান করেন। মক্কার নেতারা আমাকে যাই ভাবুক, এতে আমি মোটেও বিচলিত নই। আমি আমার প্রিয়তম রাসূল (সা.)এর সুন্নাত অনুসরণ করবই।

অন্তর অহংকারশূন্য হলে তখন অনুমতি আছে কি?

অনেকে আরেকটা কথা বলে থাকেন যে, অন্তর অহংকারমুক্ত থাকলে গোড়ালী আবৃত করে লুঙ্গি-পায়জামা পরিধান করা যাবে। কেননা, রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন অহংকার তৈরি হওয়ার আশংকা করে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছিলেন, লুঙ্গি-পায়জামা যেন টাখনুর নিচে ঝুলে না থাকে। কিন্তু আমার পায়জামাটা বারবার টাখনুর নিচে চলে যায়। উপরে উঠিয়ে রাখা আমার জন্য কষ্টকর হয়। এখন আমি কী করবো? রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, তোমার এরূপ হওয়াটা তো অহংকারের কারণে নয়। বরং তুমি অপারগ। সুতরাং তুমি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়, হাদীস নং ৪০৮৫)

এ হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করে অনেকে বলে থাকেন, আমরাও অহংকারের বশবর্তী হয়ে কাজটি করি না। সুতরাং আমাদের জন্য বিষয়টি জায়িয হওয়া উচিত।

কিন্তু কথা হলো, তোমার মাঝে অহংকার আছে কি নেই– এটা নির্ণয় করবে কে? দেখো, রাসূল (সা.)-এর চেয়েও পবিত্র কে হতে পারে? কে দাবি করতে পারবে আমি তাঁর চেয়েও অধিক অহংকারমুক্ত। তিনি তো জীবনে কখনও টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখেননি। হ্যাঁ, আবু বকর (রা.)কে যে অনুমতি দিয়েছেন তা তাঁর ওজরের কারণে। তোমারও কি এ ধরনের কোনো ওজর বাস্তবেই আছে? কোনো অহংকারী একথা স্বীকার করে না যে, আমি অহংকারী। তাই ইসলাম কারো স্বীকারোক্তির আলোকে এ বিধান প্রণয়ন করেনি। ইসলামের নির্দেশ হলো, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখবে না। সর্বাবস্থায় টাখনু উন্মুক্ত রাখবে। ইসলামের এ বিধান সত্ত্বেও, রাসূল (সা.)-এর এ নির্দেশের পরেও যদি তোমার টাখনু কাপড়াবৃত থাকে, তাহলে প্রতীয়মান হবে, তুমি একজন দাম্ভিক-অহংকারী। প্রিয় নবী (সা.)-এর নির্দেশের তোয়াক্কা তোমার মাঝে নেই।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের ফতওয়া

যদিও কোনো কোনো ফকীহ লিখেছেন, অন্তর অহংকারশূন্য থাকলে টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহে তানযীহী আর অহংকার থাকলে মাকরূহে তাহরীমী। তবে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের ফতওয়া হলো, অহংকারশূন্য

কিংবা অহংকারপূর্ণ– যে কোনো অবস্থাতেই টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো মাকরূহে তাহরীমী। কেননা, কোন ক্ষেত্রে আছে আর কোন ক্ষেত্রে নেই– এটা নির্ণয় করা সহজ নয়। বিধায় সর্বাবস্থায় এটি মাকরূহে তাহরীমী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাদা রঙের পোশাক প্রিয় নবী (সা.)-এর পছন্দের পোশাক

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ (ابو داؤد، كتاب الطب، باب فى الامر مالكحل، رقم الحديث ٣٨٧٨)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাদা রঙের পোশাক পরিধান কর। কেননা, পুরুষদের জন্য সবচে উত্তম কাপড় হলো, সাদা রঙের কাপড়। আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড় পরাও।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের জন্য সাদা রঙের কাপড় পছন্দ করতেন। যদিও অন্য রঙের পোশাক পরিধান করা হারাম নয়। সুতরাং পুরুষরা সুন্নাতের নিয়তে সাদা রঙের পোশাক পরতে পারেন– এতে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

রাসূল (সা.) লাল ডোরাকাটা কাপড় পরেছেন

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوْعًا، وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ اللِّبَاسِ، باب الثوب الاحمر، رقم الحديث ٥٨٤٨)

'বারা ইবন আযিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মধ্যম গড়নের ছিলেন। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি যে, জীবনে এর চেয়ে সুন্দর কোনো জিনিস দেখিনি।'

অপর হাদীসে এসেছে, হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি একবার জোৎস্না রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম। তিনি তখন লাল রেখাবিশিষ্ট চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। আমি কখনও চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলাম, আবার কখনও তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে

উপনীত হলাম যে, রাসূল (সা.) চাঁদের তুলনায় অধিক বেশি সুন্দর। (তিরমিযী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ২৮১২)

সম্পূর্ণ লাল পোশাক পুরুষদের জন্য জায়েয নেই

আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে উল্লিখিত লাল কাপড় দ্বারা সম্পূর্ণ লাল উদ্দেশ্য নয়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে ইয়ামান থেকে কিছু চাদর আসতো, যেগুলো সাধারণত লাল রেখাবিশিষ্ট থাকতো। উন্নত চাদর হিসেবে মানুষ এগুলো ব্যবহার করতো, রাসূল (সা.)ও এই চাদর ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, এ ধরনের পোশাক তোমরাও পরতে পারবে, তবে সম্পূর্ণ লাল পোশাক পুরুষদের জন্য পরিধান করা নাজায়েয। অনুরূপভাবে যে পোশাক কিংবা কাপড় নারীদের জন্য নির্ধারিত– সে পোশাকও পুরুষরা পরিধান করতে পারবে না। কেননা, এতে তাশাব্বুহ তথা পুরুষ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ রয়েছে বিধায় নাজায়েয।

রাসূল (সা.) সবুজ পোশাক পরেছেন

عَنْ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ

'হযরত রিফাআ আততাইমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।'

প্রতীয়মান হলো, রাসূল (সা.) সবুজ রঙের পোশাকও পরেছেন। মাঝে মাঝে অন্য রঙের পোশাকও পরেছেন। তবে সাদা রঙ তাঁর পছন্দের রঙ, বিধায় সাদা কপড়ের ওপর অন্য রঙের কাপড় প্রাধান্য দেয়া ঠিক হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাগড়ির রঙ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (ابو داؤد، كتاب اللباس، رقم الحديث ٤٩٧٦)

'হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিলো।'

অনুরূপভাবে রাসূল (সা.) সাদা পাগড়িও পরেছেন, সবুজ পাগড়ি পরেছেন। বোঝা গেলো, বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরা যাবে।

রাসূল (সা.)-এর জামার আস্তিন

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ (ابو داود، كتاب اللباس)

'হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.)-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত ছিলো।'

অতএব জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত হওয়া পুরুষদের জন্য সুন্নাত। এর চেয়ে ছোট হলে সুন্নাত আদায় হবে না। আর নারীদের ক্ষেত্রে কব্জির আস্তিন হওয়া হারাম। যেহেতু নারীদের ক্ষেত্রে পুরোটাই সতর। বর্তমানে নারীদের ফ্যাশন হলো জামা অর্ধ হাতাবিশিষ্ট হওয়া। বরং অনেক সময় দেখা যায়, পুরো বাহুটাই অনাবৃত থাকে। অথচ রাসূল (সা.) তাঁর শ্যালিকা হযরত আসমা (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আসমা! নারীরা সাবালিকা হওয়ার পর শুধু মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া পুরোটাই আবৃত রাখবে।' সুতরাং অর্ধ হাতা হওয়ার অর্থ হলো, সতর উন্মোচিত থাকা। বর্তমানে মহিলারা এভাবেই গুনাহতে লিপ্ত হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে এবং পুরুষরাও তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। 'আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।'

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ